বিভীষণ সত্যদর্শী

ডঃ প্রভাত কুমার ঘোষ

জে. এস. প্রকাশনী
৩এ, মহেন্দ্র শ্রীমানী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩

পরিবেশক :

জ্যোতি প্রকাশনী

এ ১৮, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

সুবর্ণ রেখা

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান :

(১) জ্যোতি প্রকাশনী

(২) সুবর্ণ রেখা

(৩) কথা ও কাহিনী ও বইপাড়ার অন্যান্য দোকান।

প্রচ্ছদ : শ্রী তাপস পাল

প্রকাশক :

মীরা ঘোষ

জে. এস প্রকাশনী

৩এ, মহেন্দ্র শ্রীমানী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক :

শ্রী শিশির কুমার সরকার

শ্যামা প্রেস

২০বি, ভুবন সরকার লেন

কলিকাতা-৭০০ ০০৭

উৎসর্গ

মাতৃদেবী শ্রীমতী উমারাণী ঘোষের
করকমলে—

প্রস্তাবনা

বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে বিশাল ও বন্যপ্রাণী অধ্যুষিত অরণ্যভূমি ক্রমশঃ আর্য্য ঋষিদের উপনিবেশ হতে চলেছে। উদাত্ত কণ্ঠের সামগানে মুখরিত হয়ে উঠছে সমগ্র দণ্ডকারণ্য। বহুদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেই কলকণ্ঠের সঙ্গীত।

মুনি ঋষিরা বেদমন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত কোরে দেবতাদের উদ্দেশে হবি নিবেদন করছেন। যজ্ঞান্তে সোমরস পান করে হৃদয়ের আনন্দকে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করছেন।

তারপরে, বয়োজ্যেষ্ঠেরা এক অপূর্ব অনুভূতির প্রাবল্যে এবং পরিণতিতে পরম ব্রহ্মের চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হন। তাঁরা আত্মোপলব্ধির মধ্যে চরম জ্ঞানের কাছাকাছি পেঁছবার সাধনায় নিযুক্ত হয়েছেন।

আর্য্যাবর্তে অনেকদূর পর্যন্ত আর্যক্ষত্রিয় নৃপতিদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়েছে। কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, কোশল, কাশী, বৎস্য প্রভৃতি মধ্যদেশীয় রাজ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণদের ও পুরোহিততন্ত্রের প্রভাবের অধীন ক্ষত্রিয় নৃপতিরা রাজ্যশাসন ও প্রজা পালন করছেন। চাতুর্বর্ণ্য ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ পরিচালিত বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করতে যাচ্ছে।

রাজ্যের অধিপতিরা ব্রাহ্মণদের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, বৈশ্যদের বৈষয়িক কাজে উৎসাহ প্রদান করছেন, শূদ্রদের কৃষিকাজ, উচ্চবর্ণের সেবা প্রভৃতি কর্তব্য পালনের উপর কঠোর দৃষ্টিপাত করছেন।

নগরে ও গ্রামে আর্যসমাজে বর্ণাশ্রম ধর্ম আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, চাতুর্বর্ণ্য এসেছে অনেক পরে। তপস্যাপরায়ণ ও বৈরাগ্যধর্ম পালনকারী ব্রাহ্মণেরা বনাঞ্চলে আশ্রম নির্মাণ কোরে আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণার মহৎ চর্চায় মনোনিবেশ কোরে রাজার অনুগ্রহভাজন হয়েছেন। এই বনবাসী ব্রাহ্মণেরা অনেকে গৃহী হয়েও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী—যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও তপস্যায় রত।

সিন্ধু সরস্বতীর উর্বর মৃত্তিকার দ্বারা পুষ্ট আর্য অভিযানকারীরা ভারতের উত্তর ও পশ্চিমে যত দ্রুতভাবে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিলো, পূর্বে এবং দক্ষিণে তা পারে নি। প্রাচ্যদেশে বিদেহ রাজ্য পর্য্যন্ত পেঁছে, আর্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছিল। 'মধ্য' দেশীয় তথা কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, কাশী, কোশল, বৎস্য প্রভৃতি রাজ্য অধিকার কোরে আর্য্য বিজয়ীরা শস্য ও সম্পদে সমৃদ্ধ প্রাচ্যদেশের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি প্রসারিত করেছিল। কিন্তু গাঙ্গেয় উপত্যকার পূর্ব-দক্ষিণ ভাগে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছিল তারা।

প্রাক-আর্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচ্য ভারতে দীর্ঘদিন ধরে আর্যদের সংগ্রাম করতে হচ্ছিল। এই প্রাক্তন অধিবাসীরা কিছুতেই আক্রমণকারীদের বৈদিক ধর্মের যাগ-যজ্ঞ-প্রবণতা এবং ব্রাহ্মণদের অনুষ্ঠানের আধিক্য ও কঠোরতা স্বীকার করতে চায় নি।

আর্য্যাবর্তের দৈহিক ও অস্ত্রের সংঘর্ষ আর্য্য যোদ্ধাদের উত্তর ও পশ্চিম ভাগে প্রাক-আর্য্যদের পরাজিত করতে সহায়তা করলেও, প্রাচ্যদেশে প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির অনেক কিছুই স্বীকার করে নিয়েই তবে আর্য্যদের অগ্রসর হতে হয়েছিল। সেই কারণেই আর্য্যদের হৃদয়ে 'ধর্ম' বিজয়ের পরিকল্পনাও স্থান পেয়েছিল। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিজয়ে আর্য্যদের প্রধান হাতিয়ার ছিল ভাষা।

কিন্তু অন-আর্য্য আদিম অধিবাসীদের অদৃষ্টে কি ঘটেছে? আর্য্য যোদ্ধারা উৎকৃষ্টতর অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদের হয় বিনাশ করেছে, নয় বশ করেছে। যেখানে এই দুইয়ের কোনটাই হচ্ছে না, সেখানে এই আদিবাসীরা ক্রমশঃ দূরে এবং দক্ষিণে সরে যাচ্ছে। এইভাবে তারা আর্য্যদের সংস্পর্শ বর্জন করছে এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করছে।

বহিরাগত আর্য্যদের দ্বারা দৈত্য, দানব, রাক্ষস, অসুর নামে অভিহিত এই প্রাচীন ও স্থানীয় অধিবাসীরা পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে এবং দুঃখ, দৈন্য, লজ্জা ও ভয় সম্বল কোরে, সুদূর পর্বতকন্দরে, জঙ্গলের গভীরে, নদীর কিনারে আশ্রয় নিয়েছিল। অথবা, দাসরূপে শূদ্রত্বের হীনত্ব স্বীকার কোরে নিয়ে আর্য্য সমাজের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল।

দাস দস্যু রূপে পরিগণিত এই অন-আর্য্য গোষ্ঠী স্বাভাবিক ভাবেই আর্যদের রাজনৈতিক বিস্তারের প্রবল বিরোধিতা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসাফল্যের হতাশায় তীব্র বিদ্বেষের হলাহলে তাদের অন্তঃকরণ জর্জরিত হয়েছিল। তারা কায়মনোবাক্যে আর্য্যদের যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণে বাধা সৃষ্টি করছিল।

আর্য্যাবর্তের উত্তর ও পশ্চিম দিকে নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করার পরে, আর্য্যদের অভিযান পূর্বদিক থেকে এখন প্রধানতঃ দক্ষিণাভিমুখী।

—...—

প্রথম পরিচ্ছেদ

পঞ্চবটী বন দণ্ডকারণ্যের গোদাবরী নদীর উপকূলে। অদূরে জনস্থান অঞ্চল লংকাদ্বীপের রাক্ষসরাজ রাবণের অধীনে। রাক্ষস খর চৌদ্দ হাজার রাক্ষস অনুচর নিয়ে এইখানে রাবণের প্রতিনিধিত্ব করেন। খরের সেনাপতি শক্তিশালী দূষণ। এই খর সম্পর্কে রাবণের ভ্রাতা।

রাবণের পতিহীনা ভগ্নী শূর্পনখা ভ্রাতা খরের তত্ত্বাবধানে এখানে নেত্রীর মতো বাস করেন। রাক্ষসী শূর্পনখা রূপসী এবং রাক্ষসসুলভ মায়ায় পারদর্শী।

অকালে পতিবিয়োগের জন্য শূর্পনখার কামনা চরিতার্থ হয় নি। তিনি নিজেকে বঞ্চিত বলে মনে করেন। শূর্পনখা সত্যই আজ প্রেমভিক্ষু। শূর্পনখা উদাসীন হৃদয়ে জনস্থানের অরণ্যের মধ্যে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ভ্রমণ করেন।

এই রাক্ষসেরা এক অদ্ভুত জীব। আর্য্য দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এদের রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। রাক্ষসদের নিবাস লংকাদ্বীপের অধিপতি রাবণের দেহে ব্রহ্মরক্ত বর্তমান। তাঁর অন্তঃকরণ বেদের জ্ঞানে আলোকিত। কিন্তু রাবণ দুশ্চরিত্র, নারীহরণে তাঁর কোনদিনই অনিচ্ছা নেই।

রাবণ, অনুজ কুম্ভকর্ণের মতো শুধুই ভোজনবিলাসী নন, কনিষ্ঠ বিভীষণের মতো সাত্ত্বিক প্রকৃতিরও নন, কিন্তু কোন ভ্রাতাই শৌর্যে এবং বীর্য্যে হীন নন। রাবণ দেবতা ও দৈত্য বিজয়ী, তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মার ও শিবের বরপ্রাপ্ত। রাবণ ক্ষমতালিপ্সু, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অহংকারী, তোষামোদপ্রিয়। যুদ্ধে তিনি অপরাজেয় এই মনোভাব রাবণকে পরনারীর প্রতি অন্যায় আসক্তির অপরাধবোধ থেকে মুক্ত রেখেছে।

ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ উগ্রস্বভাব, আরামপ্রিয়, ভোজনরসিক, স্বজনপ্রেমী এবং রাবণের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। কনিষ্ঠ বিভীষণ যেন এই দুই ভ্রাতার স্বভাবের এবং চরিত্রের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত।

রজোগুণবিশিষ্ট রাবণ এবং তমোগুণবিশিষ্ট কুম্ভকর্ণ বলদর্পী, প্রতিহিংসা-পরায়ণ, অহমিকাপূর্ণ এবং রাক্ষস চরিত্রের সম্পূর্ণ অনুগামী। অথচ তাঁরা শিক্ষিত ও মার্জিত। বিভীষণের চরিত্রে পূর্ণভাবে সত্ত্বগুণের সমাবেশ। তাঁর রাক্ষস দেহের অন্তরালে দয়া, মায়া, ভক্তি, শুদ্ধি তাঁর অন্তঃকরণকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করেছে। তাই বিভীষণ রাবণের অনুগত হলেও রাবণের প্রিয় নন।

রাবণের একমাত্র ভগ্নী শূর্পনখা নিজের দুর্ভাগ্যের চিন্তায় মগ্ন। খর তাঁকে বলেন,—'শূর্পনখা, তোমার অভাব কিসের? কিন্তু সব সময়েই আমার মনে হয় যে তুমি যেন ভীষণ অসুখী, যেন তোমার কোন আকাঙ্ক্ষাই মেটে নি!'

'মেটেনিই তো'। বেশ ঝাঁজের সঙ্গেই শূর্পনখা বলে চলেন। 'তোমাদের আর কি। দিব্যি মদ, মাংস, ব্যঞ্জন খাচ্ছ, নরমাংসও বাদ দাও না। আর নানা রকম নাচ গান ফূর্তি করছো। যে যেমন পারছো নারীসুখ ভোগ করছো। বেশ আছো সবাই!'

মুখে হাসি ফুটিয়ে ভগ্নীকে খুশী করার উদ্দেশ্যে খর বললেন, 'কেন শূর্পনখা,

তুমিই বা কোন কষ্টে আছ বল দেখি? খাওয়া, থাকা, আমোদ করা, কিছুতেই তো তুমি পিছিয়ে নেই। তবে, তোমার এত রাগের বা দুঃখের কারণ কি?'

—'কারণটা বোঝবার মতো সূক্ষ্ম বুদ্ধি তোমার নেই। তুমি কথাটা রাক্ষসদের মতোই বললে। নিজেরা দিব্য আরামে আছো। মুনি ঋষিদের যজ্ঞ পণ্ড করছো। আর যখন যা চাইছ, রক্ষরাজ রাবণ তাইই তোমাদের দিচ্ছেন। তোমরা আর আমার প্রাণের দুঃখটা অনুভব কোরবে কি করে?'

—'কেন ভগ্নী, তোমার দুঃখটা কোথায়? আমরা কি তোমাকে দেখছি না? আমরা রাক্ষসেরা আর্য্য ব্রাহ্মণদের নিরুপদ্রবে থাকতে দেবো না। তাই তাদের উপর উৎপাত করি। আরও করি এই জন্য যে এরা বড় সাংঘাতিক জীব। কিছুদিন পাশাপাশি নিজেদের মতো থাকতে পেলেই, এরা এমন মোহজাল বিস্তার করবে যে তোমাকে তোমার নিজত্ব ভুলিয়ে দেবে। রাক্ষসরাজ এদের গতি ও প্রকৃতি ভালোভাবেই জানেন। তাই আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন, যাতে এরা এখানে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। আচ্ছা শূর্পনখা, তুমি খুলেই বলো না তোমার মনের ব্যথাটা কোথায়? দেখি কিছু করতে পারি কিনা।'

—'দেখো ভাই খর, তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। কারণ, তুমি আমার প্রায় সমবয়সী এবং ছোটবেলা থেকেই খেলার সাথী। তুমি আমার ভাই ও বন্ধু। কিন্তু তা হলেও, তোমাকে দিয়ে তো আমার সব সমস্যা মেটে না। তোমার রাক্ষস অনুচরেরা, তারা নিজেরা সময়ে সময়ে যে অনাচারই করুক, তারা আমাকে কর্ত্রীর সম্মান দেয়। ভোগবিলাসেরও কোন অভাব নেই তোমাদের এই জনস্থানে। কালকেয় দৈত্য বংশে আমার বিয়ে হয়েছিল। আমার স্বামীর স্বজনেরাও শিক্ষায়, দীক্ষায়, শিল্পে, বাণিজ্যে, কোন অংশেই রাক্ষসদের চেয়ে কম নয়। তারা শক্তিশালী এবং ঐশ্বর্যবান নিবাতকবচ দৈত্যদের নিকট আত্মীয়। রাবণ নিজের শক্তির গর্বে নিবাত-কবচদের ধ্বংস করার সময়ে অতর্কিতে আমার স্বামী বিদ্যুৎজিহ্বকে হত্যা করেছে-এ সবই তো তোমার জানা আছে। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই অনেক সান্ত্বনা, অনেক প্রতিশ্রুতি আমি পেয়েছি। কিন্তু অনেক আরাম ও বিলাসিতা উপভোগ করেও যেন অনেক কিছুই পাই নি, মনে হয়েছে। জীবনটা বেশ শূন্য বলে বোধ হয়েছে। এখানে রাক্ষসদের মধ্যে তোমার সেনাপতি দূষণ ছাড়া তো আর কাউকেই তেমন মনের মতো লাগে না।'

শূর্পনখার স্বীকারোক্তিতে খর মনে মনে বেশ আনন্দ অনুভব করেন। সমবয়স্কা ভগ্নীর হৃদয়ের ক্ষতস্থানের পরিচয় খর যে আগে পান নি, তা নয়, কিন্তু তিনি নিরুপায়। রাক্ষসাধিপতি রাবণ অত্যন্ত কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলার অনুরাগী। সম্পর্কে তাঁর ভ্রাতা হলেও, রাবণ তাঁদের অবিসংবাদিত নেতা এবং পরিচালক। নিজের ভগ্নী সম্বন্ধে রাক্ষসাধিপতির অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি। সুতরাং শূর্পনখার কামনা ও বাসনার উগ্র এবং আদিম দিকগুলি যাতে লোকাপবাদের সৃষ্টি না করে, রাবণের নির্দেশে খরের সেই দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি। এখানে খরের কোন স্বাধীনতা নেই, ভগ্নীর দুঃখের সমব্যথী হলেও, না।

'দূষণকে তা হলে তোমার মনে লাগে!' খর মুখটি হাসিতে উজ্জ্বল করে বলে উঠলেন।

শূর্পনখা খরের কথার মধ্যে একটা বিদ্রূপ না হলেও মজার আমেজ পেয়ে নিজেকে

বাঁচাবার জন্য বললেন—'দূষণের কথা এমনিই বলছিলাম। মানে, এই একটি বেশ বীরও মার্জিতরুচির ব্যক্তি এই রাক্ষসদের মধ্যে আছে, যার সম্বন্ধে মনে একটু শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব উদয় হয়। আর সব তো নাকথাঁদা, মুখচ্যাপ্টা, চোখবড়ো বদখৎ মায়কুটে মায়াবী নিশাচর রাক্ষস। সত্য বলছি খর, আমার মোটেই আর এখানে ভালো লাগছে না।'

—'কেন ভগ্নী শূর্পনখা, দূষণ ছাড়াও তো ত্রিশিরা আছে। সেও মস্ত বড় বীর। দেখতে একেবারে রূপবান মানুষের মতো। তোমার তাকে মনে ধরে না?'

—'তোমার ঠাট্টা রেখে দাও, খর। ত্রিশিরার সঙ্গে আমার অনুরাগের সম্পর্ক হয়েছে খবর পেলে, আমার তিন ভাইই হাঁ হাঁ করে ছুটে আসবে। যেন আমার কি না কি হয়েছে! যাই বলো, তোমরা পুরুষেরা বড় স্বার্থপর। কি করে যে তোমাকে বোঝাই!'

—'আর বেশী বোঝাতে হবে না, তোমাকে। দেখি, কি করতে পারি। সত্যিই তো, তোমার দুঃখ বেদনা তো বসে বসে দেখতে পারি না। আমাকে কি এতই নিষ্ঠুর মনে কর?'

—'আহা, তুমি কি আর দাদা রাবণের মতো নিষ্ঠুর। তাই কি বলেছি আমি? দাদা এতো বিদ্বান, গুণবান, বিত্তবান, কিন্তু শত্রুর প্রতি বেশ নিষ্ঠুর। আর নারীর প্রতি, মানে যাকে তোমরা পরস্ত্রী বলো, দাদার মোহ বড়ই তীব্র। কিন্তু সেই দাদাই নিজের ভগ্নীর দুঃখের খবর রাখে না।'

—'রাখে গো রাখে। তিনি বিশাল লঙ্কাদ্বীপের অধিপতি, যাঁর বীর হিসেবে জগৎজোড়া খ্যাতি। তাঁর ধন, রত্ন, মণি, মাণিক্য, সম্পদ তুলনাহীন। তাঁর অগণিত প্রজা-দেব, দানব, যক্ষ, মানব; অসংখ্য রাক্ষস সৈন্য। তাঁর শক্তি ও সামর্থের সীমা-পরিসীমা নেই। তিনি সকালে পূজা আহ্নিক না করে জলস্পর্শ করেন না। তিনি বেদ পাঠ না করে দিনের কোন কাজই আরম্ভ করেন না। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব-বিদ্যাবিশারদ। আর তিনি নিজের ভগ্নীর দুঃখের খবর রাখবেন না!'

—'আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না। যাই হোক, কি বলবে, বল, আমি এখন যাই। তোমার কথা শুনলেই তো আমার মনের দুঃখ ঘুচে যাবে না।'

শূর্পনখা হঠাৎ ক্রোধাভিভূতা হয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন। খর তাঁর ডান হাতটি ধরে বললেন—'আরে, রাগ করছ কেন? ভাল খবর আছে। অযোধ্যার বিখ্যাত রাজা দশরথের পুত্র রাম ও পুত্রবধূ সীতা এই জনস্থানের কাছে গোদাবরীর তীরে পঞ্চবটী বনে আশ্রম তৈরী কোরে নির্বাসিত জীবন যাপন করছে। রামের সঙ্গে আছে তার ভাই লক্ষ্মণ। দুই ভাইয়েরই সুন্দর বীরের আকৃতি; আর সীতার রূপ অকল্পনীয়। তা, তুমিও তো অশেষ রূপবতী, তার উপর রাবণের ভগ্নী। তোমার গুণেরও ঘাটতি নেই। তুমি লক্ষ্মণকে চাও, তো বল। সঙ্গে তার বউ নেই, হয়ত তোমাকে মনে লেগে যেতে পারে। আর তুমি ত মানুষই ভালোবাস।'

শূর্পনখা নিতান্ত নির্বোধ নন। তবু মনে লোভ জাগে। বঞ্চিতা শূর্পনখা রাবণের ভগ্নী হলেও নারী। নারীর হৃদয়ের কামনা তাঁর পরিতৃপ্তি লাভ করে নি। শূর্পনখা রাক্ষসজাতীয়া, কিন্তু আর্যদের প্রতি সম্পূর্ণভাবে বিদ্বেষপরায়ণা নন। ধর্ম রাক্ষসদের স্বতন্ত্র,কিন্তু ইন্দ্রিয়, রিপু সবই সমান। আর্য মানুষের মতো রাক্ষসদের হৃদয়েও সূক্ষ্ম ও কোমল বৃত্তি এবং উপাদানের অস্তিত্ব বর্তমান। কিন্তু বাহ্যিক

প্রকাশ ও আচরণে আছে অমিল, যা আর্য, অনার্য, রাক্ষস কেউই নিজে নিজে উপলব্ধি করতে পারে না।

শূর্পনখা খরের কথায় প্রথমে একটু গম্ভীর হলেন, তারপরেই কি যেন চিন্তা করে হঠাৎ তাঁর মুখ একটা খুশীর আমেজে ঝলমলিয়ে উঠলো। কিন্তু সেটা খুবই অল্পক্ষণের জন্য। তৎক্ষণাৎ একটা বিষাদের ছায়া এসে তাঁর সংশয়-কুণ্ঠিত মুখমণ্ডলকে গ্রাস করলো।

খর শূর্পনখার এই আকস্মিক ভাব-পরিবর্তন লক্ষ্য করে আর কিছু বললেন না। শূর্পনখা ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

* * * *

শূর্পনখা পঞ্চবটীতে এসে সীতার অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য দেখে ঈর্ষায় জ্বলে উঠলেন। রামের কাছে গিয়ে সদর্পে বললেন, শূর্পনখা, 'ওহে অযোধ্যার নির্বাসিত রাজকুমার, তোমার স্ত্রী সীতা অতি কুৎসিত রমণী। আমি লঙ্কার রাজা রাবণের ভগ্নী শূর্পনখা। তুমি সীতাকে ছেড়ে দিয়ে, আমাকে তোমার স্ত্রী বলে গ্রহণ করো। আমরা দুজনে এই দণ্ডকারণ্যে রাক্ষসদের সাহচর্যে বেশ আরামেই বাস করবো।'

শূর্পনখার মধ্যে লোভ ও কামাগ্নির প্রজ্বলন দেখে রাম ক্রুদ্ধ না হয়ে বেশ কৌতুক অনুভব করলেন। রামের অলোকসামান্য রূপের মাধুর্য, রাক্ষসরাজ রাবণের ভগ্নী শূর্পনখার মনে এক পরিবর্তন এসেছে। রামের মুখে প্রচ্ছন্ন হাসির ভাব লক্ষ্য কোরে শূর্পনখা উৎসাহিত হয়েছেন।

মুখে এক করুণ বিষাদের ভাব ফুটিয়ে শূর্পনখা বললেন, 'রাম, আমি অনেকদিন মনে মনে তোমাকে কামনা করেছি। তুমি কি আমার প্রার্থনা পূরণ করবে না?'

শূর্পনখার কাতরতায় সেইখানে উপস্থিত রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, সকলেই ক্ষণিকের জন্য বিস্মিত হন। শূর্পনখা লজ্জায় রামের প্রতি দৃষ্টিপাত না কোরে সীতার প্রতি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। শূর্পনখার প্রতি রামের ক্রোধ অথবা বিদ্বেষভাব কিছুই প্রকাশিত হয় না। পরিবর্তে, রামের মুখে এক সরল হাসি। সীতা অপলক নয়নে শূর্পনখার মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

লক্ষ্মণ এই সমস্ত দৃশ্যটি আদৌ উপভোগ করছিলেন না। তিনি এই রাক্ষস-তনয়ার প্রতি কঠোর হতেই চেয়েছিলেন।

লক্ষ্মণের মনের ভাব উপলব্ধি কোরে রাম ইঙ্গিতে তাঁকে স্থির হতে বললেন। তারপরে ওষ্ঠে এক অপূর্ব হাসির ভাব উদ্রেক করে মিষ্ট স্বরে বললেন—'হে বিশালাক্ষী, তুমি অপাত্রে প্রেম নিবেদন করছ কেন? আমি বিবাহিত, এবং আমার প্রিয়তমা পত্নী আমার পাশেই রয়েছেন। তুমি তো সপত্নীদের সঙ্গে থাকতে পারবে না। আমার এই প্রিয়দর্শন ভ্রাতা লক্ষ্মণ এখনও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি। তুমি বরং তাকেই পতিরূপে পাবার জন্য চেষ্টা কর।'

রাম এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শূর্পনখা বিক্ষুব্ধ বোধ করলেন। ক্ষণকাল নীরবে অতিবাহিত করলেন শূর্পনখা, তারপরে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কোরে, লক্ষ্মণের প্রতি মনোযোগ দিলেন।

লক্ষ্মণ তখন অদূরে একটি বৃক্ষশাখার উপরে ডান হাতটি প্রলম্বিত করে জ্যেষ্ঠের কথা শুনছিলেন। মন তাঁর ইতিমধ্যে শূর্পনখার নির্লজ্জতার বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠেছে। নেহাত রামের আদেশেই তিনি এখনও ধৈর্য ধারণ করে আছেন।

ইতিমধ্যে শূর্পনখা ধীর পদে লক্ষ্মণের দিকে অগ্রসর হয়ে কিছু বলতে উদ্যত হলেন, কিন্তু লক্ষ্মণের রুদ্র মূর্তি দেখে একটু ভয়ে পিছিয়ে এলেন। একবার রামের প্রতি অসহায় ভাবে তাকালেন।

সাহসে বুক বেঁধে শূর্পনখা এক পা এক পা করে পুনরায় লক্ষ্মণের দিকে অগ্রসর হলেন। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে রামের প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন! লক্ষ্মণের মুখ থেকে জ্যেষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধায় এবং সম্মানে শূর্পনখার বিরুদ্ধে কোন কর্কশ বাক্য নির্গত হলো না।

শূর্পনখা হঠাৎ উত্তেজিতের মতো বলে উঠলেন—'লক্ষ্মণ, তুমি রামের চেয়ে বেশী রূপবান। তুমিই আমার যোগ্য। এস, আমরা বিবাহের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হই। দণ্ডকারণ্যে আমরা স্বাধীন জীবন উপভোগ করব, রাক্ষসেরা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। বল রাজকুমার, তুমি এই প্রস্তাবে রাজী কিনা?'

শূর্পনখার অনুনয়ের ভঙ্গীতে লক্ষ্মণের রুষ্ট গাম্ভীর্যে ছেদ পড়ে। মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে লক্ষ্মণ তাঁর স্বকীয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে বললেন—'রূপসী, আমি তো অগ্রজ রামের দাসানুদাস। তবে তুমি, আমার মতো হীন লোকের স্ত্রী হবে কেন? তুমি বরং রামকে তাঁর কুরূপা অকালবৃদ্ধা প্রথমা পত্নীকে বর্জন করতে বাধ্য কোরে, রামের কনিষ্ঠা পত্নী হও।'

শূর্পনখা লক্ষ্মণের পরিহাসের তাৎপর্য উপলব্ধি করেন নি। এখন রামের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে বললেন, 'রাম, তুমি তোমার ঐ কদর্য্য ভার্যাটিকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন করছ না কেন? দেখ, যদি আমাকে এখনও অনাদর করতে থাকো, তবে আমি এখনই সীতাকে ধরে ভক্ষণ করবো।'

এই কথা বলেই শূর্পনখা সীতাকে সবলে আকর্ষণ করতে উদ্যত হলেন। রাম তাঁকে বাধা দিয়ে লক্ষ্মণকে বললেন, 'লক্ষ্মণ, এই নিষ্ঠুর এবং নীচ প্রকৃতির অনার্য রমণীর সঙ্গে পরিহাস করা উচিত নয়। এখনই এই কামোন্মত্ত নারীকে সমুচিত শিক্ষা দাও।'

বলাই বাহুল্য, লক্ষ্মণ প্রথম থেকেই এই সুযোগটিই খুঁজছিলেন। অধিক বিলম্ব না কোরে লক্ষ্মণ খড়্গের আঘাতে রাবণের ভগ্নীর নাকটি এবং কান দুটি কেটে দিলেন। ক্ষতস্থান থেকে অবিরত ধারায় রক্তস্রাব হতে লাগলো। ক্রুদ্ধ গর্জনে বনভূমিকে সচকিত করে শূর্পনখা সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

* * * *

শূর্পনখা জনস্থানে উপস্থিত হয়ে ভ্রাতা খরের কাছে রাম ও লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। প্রিয় ভগ্নীর এই শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য কোরে খর ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বললেন—'শূর্পনখা, শীঘ্র বলো কোন দুঃসাহসী পাপিষ্ঠ তোমাকে এইভাবে কুরূপা করে দিয়ে নিজের মৃত্যুর পথ সুগম করেছে?'

শূর্পনখা ক্ষোভে, দুঃখে এবং যন্ত্রনায় জর্জরিত হয়ে খরের পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'পঞ্চবটীতে রাম লক্ষ্মণ আমার এই দশা করেছে। রামের আদেশে লক্ষ্মণই আমার দেহে এই রকম নিষ্ঠুর আঘাত করেছে। খর, তুমি এর প্রতিশোধ নেবে না? হীন মানুষের এত সাহস যে রাবণের ভগ্নীর দেহে এমন নির্মমভাবে আঘাত করে!'

শূর্পনখার ক্ষতবিক্ষত মুখমণ্ডলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে খর ক্ষোভের সঙ্গে

বললেন—'শূর্পনখা, তুমি যেমন রাবণ কুম্ভকর্ণের ভগ্নী, তেমনই বিভীষণেরও ভগ্নী। আমি যতদূর জানি, বিভীষণ কিন্তু আর্যদের সঙ্গে কোন সংঘাত পছন্দ করেন না। বিভীষণ সাধারণ রাক্ষসচরিত্রের বিশেষ ব্যতিক্রম। কিন্তু কুম্ভকর্ণ অন্য প্রকৃতির। রাবণ যত অন্যায়ই করুন, কুম্ভকর্ণ তাঁকে ভাই বলে সমর্থন কোরে যাবেন। তিনি খুবই ভ্রাতৃবৎসল। বিভীষণ হয়তো রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হতে চাইবেন না। কিন্তু শৌর্য্য ও বীর্যের প্রতিমূর্তি রাবণই আমাদের রাজা। তিনি যা বলবেন, তাইই হবে। কথায় বলে, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।'

শূর্পনখা কাতর কণ্ঠে বললেন—'খর, তোমার এত কথার দরকার কি? আমি মরছি নাক কান কাটার যন্ত্রনায়, আর তুমি এখন ভ্রাতাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে বসলে! আমার মনে হয়, এমনকি বিভীষণও তাঁর ভগ্নীর এই নির্যাতনকে উপেক্ষা করতে পারবেন না। যাই হোক, তুমি নিজেই আগে এই নিঃস্ব রাজপুত্রদের উপর প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করো। যতক্ষণ না এই পথের ভিক্ষুকদের সমুচিত শাস্তি দিয়ে তুমি সীতাকে আমার দাসীতে পরিণত করতে পারছো, ততক্ষণ আমার মনে একটুও শান্তি নেই।'

খর প্রিয় ভগ্নীকে সান্ত্বনা দিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'ভগ্নী, তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হয়ো না। তোমার ক্ষতস্থানগুলিতে প্রলেপ দাও, যন্ত্রনার অবসান ঘটবে। আমি দেখছি, কেমনভাবে এই দুই অর্বাচীন মনুষ্যনন্দনকে তাদের কৃতকর্মের জন্য সাজা দিতে পারি। আমাদের রাজ্যে এসে, আমাদের উপর রক্তচক্ষু হতে দেবো না, কাউকে। অচিরেই বাছাধনেরা বুঝবেন যে কার সঙ্গে লড়াই করতে নেমেছেন। অযোধ্যারাজ যে ক্রমশঃ এই দণ্ডকারণ্যটিকে আর্যদের উপনিবেশে পরিণত করবে, তা আমরা কখনই হতে দেবো না।'

শূর্পনখা ক্ষতের জ্বালায় উত্তেজিত বোধ করে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—'ভাই খর, আমার প্রতি অত্যাচারের প্রতিফল যে কি সেটা তুমি রাম ও লক্ষ্মণকে বুঝিয়ে দাও। তারা যেন প্রাণ নিয়ে না দেশে ফিরতে পারে। আমি সীতার বৈধব্য দেখলে বিশেষ খুশী হবো। আমি রাম লক্ষ্মণের দেহের তাজা রক্ত পান করবো।'

খর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিতে প্রজ্বলিত হয়ে সেই স্থান ত্যাগ করতে করতে ক্রুদ্ধভাবে বললেন, 'তাই হবে, ধৈর্য ধর।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দণ্ডকারণ্যে যখন এই পরিস্থিতি তখন রাক্ষসরাষ্ট্রের মুখ্য কেন্দ্র ও সুদৃঢ়তম দুর্গ লংকাপুরীতে রাক্ষসরাজ রাবণের হৃদয়ে এক অভাবণীয় রূপান্তর ঘটেছে। যে বিরাট পুরুষ তাঁর দুই ক্ষমতাশালী বাহুর উপর নির্ভর করে ইন্দ্রাদি দেবতাদের পরাজিত করেছেন, বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরকে লংকা থেকে বিতাড়িত করেছেন, পুষ্পক রথে আকাশ মার্গে বিচরণ করে বহু দেব দানব, অসুর, নাগ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব জাতীয় সুন্দরী রমণীকে হরণ করে করায়ত্ত করেছেন, সেই পুরুষ কেন বিষাদে মগ্ন, কেন অকারণ বৈরাগ্যে তাঁর মন আচ্ছন্ন!

কুম্ভকর্ণ দীর্ঘ নিদ্রায় মগ্ন। বিভীষণ যথারীতি রাজকার্যে সহায়তা করেন জ্যেষ্ঠকে। এই অপরিসীম শক্তিসম্পন্ন, ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভূপতিকে লংকায় সকলেই সম্ভ্রমের চোখে দেখেন।

তাঁর কঠোর শাসন এবং কঠিন আদেশ অমান্য করার ধৃষ্টতা কারোরই নেই। রক্ষপতি তাঁর মতের বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করতে পারেন না। এই বিষয়ে তার ঔদার্যের অভাব সকলকেই সচকিত করে।

কিন্তু তবুও বিভীষণ এবং দুর্ধর্ষ, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, এবং নিকুম্ভ প্রমুখ প্রধান মন্ত্রীরা লক্ষ্য করেছেন রাজার মধ্যে এক অস্থিরতা যা তাঁদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে। রাজ্যে তো এখন কোন রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয় নি! প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ অথবা বিদ্রোহের সূচনা হয় নি! রাজপুত্রদের মধ্যে অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিহ্নও পরিলক্ষিত হয় নি! ভ্রাতাদের মধ্যে কোন মনোমালিন্যও উপস্থিত হয় নি!

সকলেই চিন্তা করেন যে তথাপি রাক্ষসাধিপতি রাবণকে কেন এত অশান্ত, এত চঞ্চল মনে হয়! অথচ, রাজার কর্তব্যেও তো কোন শিথিলতা বা ত্রুটি নেই!

প্রবীণ মন্ত্রীরা, সেনাপতিরা এমনকি বিভীষণ পর্যন্ত রাজাকে তাঁর অবোধ্য মানসিক দ্বন্দ্বের বিষয়ে প্রশ্ন করতে সাহসী হন না। তাঁদের হৃদয়ের কৌতুহল তাদের হৃদয়েই পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

বিভীষণের সরলা ও ভক্তিমতী পত্নী, পবিত্রতা ও প্রেমের প্রতিমূর্তি সরমা, সকল সময়েই পতির সেবা ও যত্নের মধ্যে নিজেকে মগ্ন রাখেন। গন্ধর্বরাজ শৈলুষের কন্যা সরমা অত্যন্ত কোমলপ্রাণা। কিশোর পুত্র তরণীসেন সরমা ও বিভীষণের নয়নের মণি।

সরমা সকলের অলক্ষ্যে দেবতাদের স্মরণ করেন। স্বামী, পুত্র, রাক্ষসাধিপতি এবং রাক্ষসদের কল্যাণ কামনা করেন। সরমার হৃদয় যেন সদাই শংকিত, এই বুঝি কোন বিপদ ঘটে লংকাপুরীতে।

রাক্ষসরাজ্যে প্রজাপীড়ন ও অত্যাচার নেই। কিন্তু রাজার পরনারীতৃষ্ণা তো আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। সরমা রাক্ষসরাজের প্রতি মনে মনে বিক্ষুব্ধ। কারণ, সরমার দেবোপম স্বামী রাক্ষস হয়েও কখনও নারীত্বের মর্যাদায় আঘাত করেন না। তিনি কত স্থির, কত ধীর!

সরমার অন্তঃকরণ মধ্যে মধ্যে নানাবিধ ভাবনার জালে আচ্ছন্ন হয়। তাঁর স্থিতপ্রজ্ঞ পতিদেবতার মনে শিবের প্রতি ভক্তির অভাব না থাকলেও, তিনি অন্তরে বিষ্ণুর অনুগামী। সেই পতিদেবতাই সরমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন যে নারায়ণরূপী বিষ্ণুই জগতের স্রষ্টা ও পালয়িতা। যে ব্রহ্মাকে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ দীর্ঘ তপস্যা ও পুজার দ্বারা প্রীত করেছেন, সেই ব্রহ্মাকে তো ত্রিলোকাধিপতি হরিনারায়ণ বিষ্ণু সৃজন করেছেন।

বিষ্ণু রাক্ষসদের ইষ্ট নন, কিন্তু দেব, দানব, যক্ষ ও গন্ধর্ববিজয়ী অমিত শক্তির আধার রাবণ কেন অন্তরে বিষ্ণুর অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন! রাবণের মনের এই অদৃশ্য গতি বিভীষণ ও তাঁর প্রিয়তমা ভার্যার নিকট সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত নয়। সরমার হৃদয়ে সেই বিস্ময়মিশ্রিত সংশয় প্রবল হয়ে ওঠে।

* * * *

সূর্যের প্রথম রশ্মি প্রভাতের কুয়াশা ভেদ করে ত্রিকূট পর্বতের শিখরে লংকার

স্বর্ণমণ্ডিত প্রাসাদশীর্ষে প্রতিফলিত হয়েছে। দিনের আলোর এই সামান্যতম বিকাশে লঙ্কানগরীর অগণিত ও মণিমানিক্যখচিত সৌধের চূড়াগুলি যেন রাত্রের অন্ধকার থেকে এক উজ্জ্বল উপত্যকার মধ্যে একে একে উদ্ভাসিত হচ্ছে। বিশ্বকর্মানির্মিত শতযোজনব্যাপী দীর্ঘ এবং ত্রিশযোজনব্যাপী প্রশস্ত লঙ্কানগরী সুবর্ণ প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

এই প্রাচীরের চারিদিকে দৃঢ় কবাটবন্ধ সুবর্ণময় তোরণদ্বার। তোরণদ্বারগুলির বহির্দেশে দীর্ঘ ও গভীর কুম্ভীরসঙ্কুল পরিখা। চারটি প্রধান দ্বারে পরিখা অতিক্রম করার জন্য সুপ্রশস্ত সেতুপথ অবস্থিত। এই তোরণদ্বারগুলি এবং সেতুপথ যান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা সুরক্ষিত এবং শত্রুর পক্ষে অনতিক্রম্য।

তোরণদ্বারগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সুবিশাল ও সুবিস্তৃত রাজপথ। নানা বর্ণের ফুল ও পত্র সমন্বিত বৃক্ষের দ্বারা রক্ষিত রাজপথগুলি সুবিভক্ত। পথে যেমন জনসমাগম, তেমনই পথের কিনারায় সুসজ্জিত বিপণিগুলিতে পণ্য এবং ঐশ্বর্যের সমারোহ।

রাজপথগুলির দুপাশে সুরম্য অট্টালিকাসমূহ। স্থানে স্থানে হংসসঞ্চারিত, স্বচ্ছ-জলপূর্ণ নয়নলোভন দীর্ঘিকা। এই দীর্ঘিকাগুলির প্রস্তরময় সুদৃশ্য সোপানশ্রেণী যেন পাতালের রহস্যময় গহ্বর থেকে মর্ত্যের সৌন্দর্যময় রাজপথে এসে মিলিত হয়েছে।

অদূরে পর্বতশিখরে অবস্থিত প্রাসাদের চূড়ায় রক্ষপুরীর রক্তবর্ণ বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন—যেন স্বর্গ, মর্ত্য পাতালের স্রষ্টার দুর্দান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রাবণের আকাশচুম্বী উচ্চাভিলাষের গণ্ডী পাতাল থেকে মর্ত্যে, মর্ত্য থেকে স্বর্গের দিকে দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে!

প্রাতঃকালে বিভীষণজায়া সরমা দৈনিক পূজা সম্পন্ন কোরে আবাসগৃহে ফিরে এসে দেখলেন যে তাঁর পতিদেবতা শয্যা ত্যাগ করেছেন। তিনি ইতিমধ্যে মুখ প্রক্ষালনের পরে বেশবাস পরিবর্তন কোরে দৈনন্দিন পূজার জন্য প্রাসাদের উদ্যান-সংলগ্ন মন্দিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। বিভীষণের গম্ভীর আননে এক নির্ভীক প্রশান্তি, যা দেখে সরমা সর্বদাই অত্যন্ত তৃপ্ত হন।

স্বামীর গমনের পথ রোধ করে এবং এক মধুর হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে সরমা বললেন, 'প্রভু, আপনার পূজার বিলম্ব ঘটাতে চাই না। কিন্তু তবু আপনাকে এই অসময়েও একটি প্রশ্ন না করে পারছি না। উত্তরটা এখনই দিলে সকলের পক্ষে মঙ্গলকর হয়।'

বিভীষণ একটু গম্ভীর প্রকৃতির, যদিও তাঁর হৃদয়ে প্রেম ও প্রীতির অভাব নেই। সরমা জানেন যে বিভীষণ চিন্তাশীল এবং অল্পেই উদ্বিগ্ন হন। কিন্তু উপায় নেই, সরমার একটি জটিল প্রশ্নের জবাব বিভীষণকে এখনই প্রদান করতে বাধ্য করতে হবে।

প্রশ্নের উত্তরটি যে সরমার নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, বিভীষণ প্রশ্নকর্ত্রীর এই অসময়ে প্রশ্ন উত্থাপনের ধারা থেকেই তা অনুমান করলেন। তিনিও ঈষৎ হাসির সঙ্গে কণ্ঠের মধ্যে আন্তরিকতার সুর মিশিয়ে বললেন, 'সরমা, তোমার কি জিজ্ঞাস্য আছে, নির্ভয়েই বলো। কিন্তু, রাত্রে তোমার সুনিদ্রা হয়েছে তো?'

স্বামীর কণ্ঠে পরিহাসের সুরে সরমা মনে মনে পুলকিত বোধ করেন। তিনিও মুখে কৌতুকের হাসি উদ্রেক করে বললেন, 'প্রাণনাথ, আপনি সর্বদাই আমার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে সচেতন। আমার মতো স্বামীসৌভাগ্য আর কার হয়েছে? আচ্ছা প্রভু, আপনি কি সম্প্রতি রাজার মুখে নতুন কিছু কথা শুনেছেন?'

—'কেন, বলতো সরমা, তুমি হঠাৎ একথা বললে কেন ?'

স্বামীর কণ্ঠে বিস্ময়ের রেশ সরমাকে ঈষৎ অপ্রস্তুত করেছে।

—'না, না, এই বলছি যে কয়েকদিন যাবৎ আপনি কি রক্ষরাজের পরামর্শ সভায় উপস্থিত থাকেন নি। অথবা তার সঙ্গে কোন নিভৃত আলাপ করেন নি ?'

সরমার কথায় বিভীষণের বিস্ময় দ্বিগুণভাবে বর্ধিত হয়। ইতিমধ্যে মন্দিরের পথে প্রাসাদের পরিচারকেরা তাঁদের লক্ষ্য কোরে নিজেদের কাজে চলে যায়।

বিভীষণ সরমার প্রতি প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঈষৎ অধৈর্যের সঙ্গে বলেন— 'সরমা, এখন অনেকেই এই পথে যাওয়া আসা করবে। সুতরাং সময় নষ্ট না করে যদি সত্যই কিছু জানবার থাকে তো শীঘ্র ব্যক্ত কর। নচেৎ আমাকে মন্দিরে যেতে দাও। জনস্থান থেকে দূত এসেছে। রাজা আমাকে জরুরী তলব দিয়েছেন।'

—'প্রভু, রাক্ষসরাজ প্রধানা মহিষী মন্দোদরীকে বলেছেন যে শীঘ্রই তাঁর জীবনের এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষণ উপস্থিত হবে এবং তিনি হয়তো এমন একটা কাজ করতে বাধ্য হবেন যেটা আপাতঃদৃষ্টিতে হঠকারিতা মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা নয়।'

রাক্ষসরাজ কনিষ্ঠের নিকট মনের কোন গোপন ইচ্ছার কথাই প্রকাশ করেন নি। তাই সরমার উক্তিটি বিভীষণের কাছে বিশেষ রহস্যপূর্ণ বলেই প্রতিভাত হয়। কিন্তু পথের মধ্যে জ্যেষ্ঠের মনোগত অভিপ্রায়ের বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা বিভীষণের আদৌ অভিপ্রেত এবং সুখপ্রদ মনে হয় না।

বিভীষণ মুখে বিস্ময়ের ভাব প্রস্ফুটিত করে বললেন, 'সরমা, তোমার প্রশ্নের মধ্যে অনেক জটিল রহস্য লুকিয়ে আছে! পরে তোমার সঙ্গে একান্তে আমি আলোচনা করবো। তুমি বরং রাণী মন্দোদরীকে আমার নাম কোরে রাজার মনের ইচ্ছার কথা জানতে অনুরোধ কর।'

অপাপবিদ্ধা পবিত্রহৃদয়া সরমার নিকট স্বামীর বাক্যই বেদবাক্য। তিনি আনতমুখে বিভীষণের প্রস্তাবে নির্বাক সম্মতি জানিয়ে লঘু ছন্দে প্রাসাদের অভিমুখে চলে গেলেন।

রাজভ্রাতা বিভীষণ চিন্তান্বিত চিত্তে মন্দিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এই সুন্দর প্রভাতে সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গের অবিশ্রান্ত ধ্বনি এবং বাতাসের শাসনহীন হিল্লোল তাঁর মনকে প্রফুল্ল করতে সক্ষম হলো না।

বিভীষণ তাঁর জ্যেষ্ঠের প্রকৃতি, দার্শনিক চিন্তা, এবং আধ্যাত্মিক গভীরতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবহিত। পত্নীর উক্তির মধ্যে লংকাধিপতির মনের গহনে যাবার পথে যে অল্প আলোক-সম্পাত হয়েছে, তার মধ্যে কোন অনাগত বিপর্যয়ের সংকেত নেই তো!

* * * *

লংকেশ্বর রাবণ অন্যমনস্কভাবে আপন কক্ষ-সংলগ্ন অলিন্দে পদচারণা করছিলেন। প্রত্যূষে যথারীতি কুলদেবতার মন্দিরে স্বর্ণমণ্ডিত শিবলিঙ্গকে পূজো করেছেন। ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছেন মহেশ্বরের এবং মহাশক্তির, এবং শেষে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করে বেদমন্ত্র পাঠ করেছেন।

প্রাতঃকালে তো অন্য দিন অন্তর নির্মল থাকে! সমুদ্রের অনিলপ্রবাহ ও নবীন ভাস্করের রশ্মি স্বর্ণময় গবাক্ষের পথে প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেহ ও মনকে সতেজ করে।

কিন্তু আজ রক্ষরাজ ইষ্টদেবতার ধ্যানেও মনোনিবেশ করতে পারেন নি। অভ্যাসবশতঃ নিমীলিত নয়নে ধৈর্য ধারণ করে বসে থেকে ইষ্টের দেহী মূর্তি কল্পনায় সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু মন সংযোজিত হয় নি। ইষ্টের ধ্যানের শেষে হৃদয়ের মধ্যে যে অনাবিল আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়, তাও আজ স্তিমিত।

রাবণ লক্ষ্য করলেন যে কনিষ্ঠ বিভীষণ গজদন্তনির্মিত এবং সুবর্ণখচিত সোপান-শ্রেণী আরোহণ করছেন। অঙ্গে তাঁর শ্বেত পট্টবস্ত্র। শ্যামবর্ণ সৌম্যাকৃতি বিভীষণ যেন সাত্ত্বিকতার প্রতীক। রাক্ষসকুলে জন্মালেও বিভীষণ আসক্তিহীন, ক্রোধশূন্য।

বিভীষণ স্পষ্টবাদী, সত্যনিষ্ঠ, তাই তো তাকে নিয়ে এক সমস্যা রাবণের। কিন্তু সে জ্যেষ্ঠকে পিতার মতোই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। কুম্ভকর্ণও করে, কিন্তু বিভীষণকে আরও অমায়িক আরও ধার্মিক বলে মনে হয়।

ধীরে ধীরে বিভীষণ রাবণের পাশে এসে দাঁড়ালেন। রাবণের অঙ্গে কাষায় পট্টবস্ত্র, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা এবং ললাটে ত্রিপুণ্ডক। লঙ্কেশ্বরের মুখের প্রতি বিনম্রভাবে তাকিয়েই বিভীষণের জ্যেষ্ঠের প্রতি তাঁর দৈনন্দিন সম্মানজ্ঞাপক কর্তব্যের কথা মনে পড়লো।

বিভীষণ নত হয়ে রাবণকে প্রণাম করলেন। রাবণও কনিষ্ঠকে প্রীতিপূর্ণ নয়নে লক্ষ্য করে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন। বিভীষণ দেখলেন যে রাবণের দুচক্ষু তাঁর সর্বাঙ্গ অনুসরণ করে তাঁর মুখমণ্ডলে এসে নিবদ্ধ হল।

রাবণ স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ত্যাগ করে উদাস দৃষ্টিতে অনন্তনীল আকাশের দিকে চেয়ে অস্বাভাবিক নিম্ন কণ্ঠে বললেন—'চলো ভাই, আমরা প্রকোষ্ঠে গিয়ে বসি। রাণী মন্দোদরী এখন উদ্যান-মন্দিরে পূজায় গেছেন। এসো আমরা কিছুক্ষণ নিভৃতে আলাপ করি।'

বিভীষণ নীরবে রাবণের পশ্চাতে গৃহদ্বারে উপনীত হলেন। রাবণ ইঙ্গিতে পরিচারকদের এই গোপন আলাপের কথা বুঝিয়ে, সম্মুখে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন।

লঙ্কাধিপতির অন্তঃপুর অজস্র হর্মমালা-সমন্বিত এবং রাজপ্রাসাদের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। রত্নবিভূষিত এবং বহুবিধ দুর্লভ ও দুর্মূল্য বস্তুতে সজ্জিত বিশাল প্রকোষ্ঠগুলি স্ফটিক ও বৈদুর্যমণি শোভিত, রজত ও সুবর্ণমণ্ডিত সারিবদ্ধ বিরাটাকার স্তম্ভের উপর বিন্যস্ত।

কক্ষগুলির প্রান্তে অট্টালিকার নিম্নদেশ থেকে উত্থিত সুগন্ধি কুসুমযুক্ত তরুরাজী যেন এক অরণ্যের ভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। কক্ষের ভিতরে এবং বাহিরে পিঞ্জরে অথবা বৃক্ষশাখে অসংখ্য বিচিত্রবর্ণের নানাজাতীয় পক্ষী। তাদের নিরবচ্ছিন্ন কূজনে এবং কৃত্রিম আলো আঁধারীতে কক্ষগুলিতে যেন এক মায়াময় জগতের অস্তিত্ব। অন্তঃপুরের বাহিরের ও অভ্যন্তরের নয়নাভিরাম দৃশ্য যেন অমরাবতীর সৌন্দর্য ও আড়ম্বরকে অতিক্রম করেছে।

রাবণ হঠাৎ বিভীষণের হাত দুটি ধরে শান্ত পদে কক্ষের মধ্যে গজদন্তনির্মিত পালঙ্কে এসে উপবেশন করলেন। এই পালঙ্কটিও যথারীতি সুবর্ণ ও রত্নমণ্ডিত। জ্যেষ্ঠের এই অনিয়মিত অন্তরঙ্গতা বিভীষণের হৃদয়ে কৌতুকের উদ্রেক করলো।

বিভীষণ রাবণের দক্ষিণ পাশে এসে দাঁড়ালেন। রাবণের ডান হাত পুনরায় তাঁর বাম বাহু স্পর্শ করলে, বিভীষণ উপবিষ্ট হলেন।

প্রথমেই রাক্ষসরাজ নিঃশব্দভাবে বললেন, 'বিভীষণ, শুনেছি জনস্থান থেকে আমাদের দূত অকম্পন কি বিপর্যয়ের খবর নিয়ে এসেছে। এর বেশী কিছুই এখনও জানি না। অকম্পনকে ডাকবার আগেই তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলে নিই।'

বিপর্যয়ের কথায় বিভীষণ উদ্বিগ্ন বোধ করলেন। বিভীষণের মুখের চিন্তিত ভাব উপেক্ষা করে বিনা ভূমিকাতেই রাবণ বললেন, 'বিভীষণ, আমরা রাক্ষসেরা কি মানুষের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট? আচ্ছা বলতে পারো, মানুষের এমন কিছু কি আছে, যা আমাদের নেই?'

এই দুটি প্রশ্নেরই উত্তর অত্যন্ত কঠিন। কারণ প্রশ্ন দুটিই বেশ জটিল। বিভীষণ প্রভাতকালেই এই সব দার্শনিক অনুসন্ধানের সম্মুখীন হবেন, কল্পনাও করেন নি। বেদজ্ঞ, সুশিক্ষিত এবং মার্জিতরুচি বিভীষণ হয়ত দুটি প্রশ্নেরই নিজের মতো যথাযথ উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু তাতে রাক্ষসরাজের ক্রোধের উদ্রেক হবে না তো!

বিভীষণের এই উভয়সংকট অবস্থা বিচক্ষণ ও মেধাবী রাবণ সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছেন। মুখে আশ্বাসের ভাব প্রকাশ কোরে ভ্রাতাকে উৎসাহিত করতে সহৃদয়তার সঙ্গে বললেন—'বিভীষণ, ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি শান্ত ও সমাহিতচিত্ত। তোমার মধ্যে তামসিক এমন কি রাজসিক ভাবেরও অস্তিত্ব নেই বললেও চলে। আমি জানি, রাক্ষসদের অনেক আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, আহার বিহার তুমি পছন্দ কর না। তাই তুমি মনে করছো যে তোমার সত্যভাষণে আমি বিরক্ত হবো। না, না, তা হবো না, তুমি নির্ভয়ে বলো। আমি জানি, তুমি ধর্মনিষ্ঠ।'

বিভীষণ রাবণের ভ্রাতৃসুলভ সুসংযত ও সুমিষ্ট আচরণে অভিভূত হলেন। কিছু বলার জন্য প্রস্তুত হলেন মনে মনে।

কিন্তু, সময় লাভ করার উদ্দেশ্যে নতমুখে বললেন, 'মহারাজ, আপনি মহাপণ্ডিত, মহাজ্ঞানী, মহাযোগী। আপনি আপনার প্রশ্ন দুটির উত্তর আমার মতো অভাজনকে জিজ্ঞাসা করছেন?'

বিভীষণকে বাধা দিয়ে প্রায় আর্তনাদ কোরে রাবণ বললেন—"বিভীষণ, তুমি আমার অভাজন! এ কথা কি করে মনে করলে ভাই? আমি দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব-সকলকে পরাজিত করেছি। কঠিন তপস্যার ফলে ব্রহ্মার বরে আমি অজেয়, অবধ্য-প্রায় অমর। কিন্তু বিভীষণ, তুমি তো অমরত্বই লাভ করেছো। তুমিই তো রাক্ষসদের ভরসা। আমার অমরত্বের বর্মে একটি ছোট হলেও বিশেষ ছিদ্র আছে—আমি একমাত্র মানুষের হাতে বধ্য। ভাই কে এমন মানুষ আছে যে এই বহু যুদ্ধে বিজয়ী, শৌর্যবীর্যসম্পন্ন, কোটি কোটি রাক্ষস সৈন্যের দ্বারা সুরক্ষিত লংকাধিপতিকে দুস্তর সাগর অতিক্রম করে, নিধন কোরে যাবে! আমি বর্তমান রাক্ষস জন্মের জন্য একটুও দুঃখিত নই। কিন্তু বিভীষণ আমার মুক্তির উপায় কি? এবার বলো, তুমি কি বলবে, আমার আগের দুটি প্রশ্নের কি জবাব দেবে?'

বিভীষণ অবাক বিস্ময়ে জ্যেষ্ঠের জ্ঞানদীপ্ত নীলাঞ্জনবর্ণ বিশাল মুখমণ্ডলের অসহায় ও সাহায্যভিক্ষু ভাবটি লক্ষ্য করলেন। অনুকম্পায়, সমবেদনায় বিভীষণের হৃদয় বিগলিত হল। এই তবে লংকেশ্বরের মনের গোপন অভিলাষ!

বিভীষণ কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে নির্বাক থাকলেন। রাক্ষসরাজ নত নেত্রে চিন্তায় মগ্ন।

জ্যেষ্ঠের উচ্ছ্বসিত ভাবটি দমিত হয়েছে উপলব্ধি কোরে বিভীষণ মৃদুস্বরে

বললেন—"ভ্রাতঃ, আপনার মনের কোণে যে বিষাদ আশ্রয় করেছে, তার কিছু পরিচয় আজ আমি পেলাম। এখনও আপনার মুক্তির চিন্তার সময় আসে নি। রাক্ষসেরা আপনার বলিষ্ঠ এবং হিতকামী রাজ্যশাসন-ব্যবস্থার মধ্যে থেকে আরও অগ্রগতির আশা করে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প কলা, স্থাপত্য—কিছুতেই রাক্ষসেরা কারোর চেয়ে পিছিয়ে নেই। কিন্তু সাধারণভাবে রাক্ষসদের ধর্ম ও নীতি মানুষের ধর্ম ও নীতি থেকে নিকৃষ্ট, এই আমার ধারণা।"

এই পর্যন্ত বলে বিভীষণ স্তব্ধ হলেন। রাবণ উপলব্ধি করলেন যে বিভীষণ রাবণের মনের প্রতিক্রিয়াটি জানতে আগ্রহী। রাবণ নিজেও বিভীষণের বক্তব্যটি শুনবার জন্য উৎসুক।

রাবণ মনের উত্তেজনা গোপন রেখে, বিভীষণকে অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন, 'বিভীষণ, তুমি আমার প্রশ্ন দুটির উত্তর এখনও দাও নি। কিন্তু, আমি গভীর আগ্রহের সঙ্গে তোমার অভিমত জানতে চাইছি। তুমি নিঃসংকোচে বলে যাও।'

রাক্ষসরাজের নিকট পুনরায় আশ্বাস লাভ করায় বিভীষণ উৎসাহিত বোধ করলেন। রাক্ষসদের চরিত্র সংস্কারের যে দুরন্ত কল্পনা, বিভীষণের হৃদয়ে, বিভীষণ সেই কল্পনার পরিপূর্ণতার জন্য রাবণের হৃদয়কেই প্রথমে স্পর্শ করতে সচেষ্ট হলেন।

বিভীষণ শান্ত হৃদয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, 'মহারাজ, রাক্ষসেরা ভোগের উপাসক। ইন্দ্রিয়সুখেই তাদের চরম ও পরম আত্মতৃপ্তি। কিন্তু যে আর্যদের আমরা ঘৃণা করি, যাদের উপর আমরা বিদ্বিষ্ট, যাদের যাগ যজ্ঞ নষ্ট করার জন্য আপনার কঠিন আদেশ আপনি আর্য্যাবর্তের ও দাক্ষিণাত্যের সব রাক্ষসগোষ্ঠীকে অত্যন্ত নির্মমভাবে পালন করতে বলেছেন, সেইসব মানুষেরা ইহকাল ও পরকাল, দুইয়েরই চিন্তা করে। এই তো তাদের মূল জীবনদর্শনের কথা। তারা মানুষ, পশু, পক্ষী আদি সকল প্রাণীকেই ভালোবাসতে চেষ্টা করে, এবং শেষে সর্বস্ব ত্যাগ কোরে ঈশ্বরের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করে। তারা এই পাশবদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির উপায়ও চিন্তা করে। আমরা রাক্ষসেরাও বর্ণাশ্রম ধর্ম কিছুটা মানি। কিন্তু আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম, তপস্যার প্রভাবের কথা শেখালেও, ত্যাগের মর্মবাণী প্রচার করে না। সাত্ত্বিক প্রবৃত্তিগুলিই রাক্ষসদের চরিত্রে প্রায় বিরল। আমাদের ন্যায় ও অন্যায়ের বোধ পক্ষপাতশূন্য নয়। আমরা নিজেদের নিয়েই মত্ত।'

রাবণ তাঁর স্পষ্টবাদী ভ্রাতার নির্ভীক উক্তিতে অন্তরে বিচলিত বোধ করলেও, বাহিরের প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখলেন। বিভীষণের হাত ধরে রাবণ আন্তরিকভাবে বললেন, 'বিভীষণ, আমাদের দেহে ব্রহ্মরক্ত আছে, আমরাও আর্য্য, আমরাও সভ্য ও শিষ্ট। কিন্তু তুমি যে চরিত্রগত পার্থক্যের দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করেছো, তার মধ্যে কোন ভুল নেই। আমি জানি, আত্মম্ভরিতা, নিষ্ঠুরতা এবং ঘোর তামসিকতা আমাদের রাক্ষসদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবে।'

রাবণের এই মর্মান্তিক স্বীকৃতিতে বিভীষণ বিস্মিত না হয়ে পারেন না। এই মহান ব্যক্তি সর্বজ্ঞ, কিন্তু তথাপি রাক্ষসসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলি পর্বততুল্য বাধার মতো তাঁর আত্মোপলব্ধির পথটিকে রোধ করে রয়েছে।

রাবণ অনুজের বিমূঢ় ভাবটি উপেক্ষা কোরে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমি জানি, দেবতা, রাক্ষস, দৈত্য, দানব জন্মসূত্রে অভিন্ন হলেও, রাক্ষস ও মানুষে অনেক প্রভেদ। বেদের স্রষ্টা মানুষই। মানুষই তপস্যার দ্বারা মানুষের মুক্তির উপায় চিন্তা করে।

কিন্তু রাক্ষসকুলে সেই সত্য উপলব্ধি করার প্রবণতা কোথায় ? এইখানেই বোধহয় রাজা হিসেবে আমার অসাফল্য, এইখানেই বোধহয় আমার পরাজয়। বিভীষণ, তুমি যা বলেছো, সবই সত্য। কিন্তু ভাই, আমি রাক্ষসদের একচ্ছত্র অধিপতি। আমার শক্তি, ঐশ্বর্য ও আধিপত্যের উৎস এই রাক্ষসকুল। আমরা মুনি বিশ্রবার পুত্র হলেও, আমাদের মাতা রাক্ষসকন্যা। লংকার আদি রাক্ষস নৃপতি মাল্যবানের সুযোগ্য ভ্রাতা সুমালী আমাদের মাতামহ। মাতা কৈকসী, আমাদের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট করার জন্য আমাদের তিন ভ্রাতাকে তপস্যা করতে অনুজ্ঞা করায়, আমরা তিন ভাইই কঠোর এবং দীর্ঘ তপস্যায় রত হয়েছিলাম। দেব ব্রহ্মার নিকট আমরা বর লাভ করেছিলাম। তারপরে কুবেরকে বিতাড়িত কোরে, লংকায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি। সব রাক্ষসদের এক ছত্রতলে সন্নিবিষ্ট করেছি। আমি রাক্ষসদের রাজকীয় প্রতিনিধি। দেব মহেশ্বর আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমি রাক্ষসদের গৌরব বর্ধন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জানি না, হয়তো এর জন্য কোন উচ্চ মূল্য আমাদের দিতে হতে পারে !'

রাবণের রাক্ষসমহিমার স্বপক্ষে গর্বিত উক্তিতে একটুও বিস্মিত হলেন না বিভীষণ। তিনি রাবণকে ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু রাবণের আকাশস্পর্শী দম্ভের অন্তরালে যে করুণ আর্তির ব্যঞ্জনা রয়ে গেছে, সেই তো ব্রহ্মনিষ্ঠ, আধ্যাত্মিক-জ্ঞানসম্পন্ন রাবণের হৃদয়ের পরম প্রাপ্তির আকিঞ্চন !

রাবণের উক্তির শেষ অংশ বার বার বিভীষণের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হলো। আবেগের আতিশয্যে রাক্ষসরাজ নিস্তব্ধ, চক্ষুদুটি অশ্রুভারাক্রান্ত, দেহ ঈষৎ উত্তেজিত।

এই সময়ে গৃহদ্বারের প্রহরী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কোরে প্রণত হয়ে জানালো যে রাজভগ্নী শূর্পনখা লংকাপুরীতে উপস্থিত হয়ে প্রধানা মহিষী মন্দোদরীর কক্ষে বিলাপ করছেন।

'জনস্থান থেকে শূর্পনখা নিজে লংকায় ছুটে এসেছে !' গভীর বিস্ময় রাবণের কণ্ঠে। অল্পক্ষণ পরে রাবণ পুনরায় উত্তেজিতভাবে বললেন, 'তাহলে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ অঘটন ঘটেছে। বিভীষণ, তুমি ক্ষণকাল এখানেই অপেক্ষা করো। কুম্ভকর্ণ তো তার সুখনিদ্রায় অভিভূত। শূর্পনখা এখানে এলে, আমরা দুজনেই ভগ্নীর কাছ থেকে তার কাহিনী শুনবো।'

রাবণ প্রহরীকে ইঙ্গিত করতেই সে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো।

শূর্পনখা দণ্ডকারণ্যের জনস্থান থেকে বায়ুযোগে আগেই লংকায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এখন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ লংকাপতি রাবণের নিকটে এসে বিভীষণের সম্মুখেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করলেন।

শূর্পনখার পশ্চাতে রাজ্ঞী মন্দোদরীও এসেছেন, সর্পিনীর মত হিংস্র ক্রোধে অন্ধ ননদিনীকে শান্ত করতে।

শূর্পনখার উদ্ধত আচরণে বিভীষণ স্তম্ভিত হয়ে মন্দোদরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। ভয়ে এবং সংশয়ে বিবর্ণা মন্দোদরীর সুগৌর মুখশ্রী যেন ম্লান হয়েছে। মন্দোদরী বিস্মিত নয়নে পতির দীর্ঘ দেহ এবং শেষে দুটি উজ্জ্বল নয়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

রাবণ তাঁকে ইঙ্গিতে আশ্বস্ত করলেন। রাবণ প্রিয় ভগ্নী শূর্পনখাকে ভালোভাবেই জানেন। শূর্পনখার চরিত্র, গতি ও প্রকৃতি রাবণের নখদর্পণে।

মদগর্বে স্ফীত রাবণ কালকেয় দৈত্যদের পরাজিত করার পৈশাচিক কামনায় ভগ্নীপতি বিদ্যুৎজিহ্বকে হঠকারিতার মধ্যে বধ কোরে, ভগ্নীর নিকট অপরাধী হয়েছিলেন। সেই অপরাধবোধের ফলেই শূর্পনখা জনস্থানের শাসনকর্ত্রী এবং রাবণের শাসনহীন স্নেহের পাত্রী।

রাবণ তাঁর নিজের অপদার্থতার বিরুদ্ধে ভগ্নীর অভিযোগের কথা শুনে আদৌ বিব্রত বোধ করলেন না। কিন্তু শূর্পনখার বিকৃত মুখমণ্ডলের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে রাবণ চিৎকার কোরে বললেন, 'ভগ্নী, তোমার এই দশা কি ভাবে হলো ?'

নিজের উত্তেজনায় লজ্জিত হয়ে ভগ্নীর মাথায় হাত রেখে সস্নেহে রাবণ বললেন, 'শূর্পনখা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি আমাকে সব খুলে বলো।'

রাবণের এই শান্ত প্রতিক্রিয়ায় বিভীষণ এবং মন্দোদরী উভয়েই অতিশয় বিস্মিত হন।

শূর্পনখা যে কর্কশভাষী তা কারোর অজানা নয়। কিন্তু রাবণের কথায় শূর্পনখা অধিকতর উত্তেজিত হয়ে রুক্ষ স্বরে বললেন,—'তুমি স্বেচ্ছাচারী, কামোন্মত্ত। তুমি লঙ্কায় নিরঙ্কুশ নিরাপত্তার মধ্যে সুখে কালাতিপাত করছো। তুমি বুঝতে পারছো না যে রাক্ষসদের অত্যন্ত দুঃসময় ঘনিয়ে এসেছে। তুমি রাক্ষস, তোমার সূক্ষ্ম বুদ্ধির অভাব। আমি বুঝি না যে তুমি লঙ্কারাজ্য শাসন করছো কিভাবে। সমুদ্রের উত্তরে রাক্ষসদের যে রাজ্য, সেখানে আমি তোমার প্রতিনিধিত্ব করি। তুমি সেখানকার সংবাদ কিছুই রাখো না। তোমার গুপ্তচর নেই, তোমার মন্ত্রীরাও বেশ নির্বিবাদে এবং আলস্যে কাল কাটাচ্ছে। রাক্ষসদের ইতিমধ্যে যে কত বড়ো ক্ষতি হয়ে গেছে, তা তুমি ঐশ্বর্য ও সম্ভোগের মধ্যে বাস কোরে কিছুই জানতে পারো নি !'

শূর্পনখার তিরস্কারে রাবণ সচকিত হন। রাক্ষসদের কি নূতন সর্বনাশের সংবাদ ভগ্নী বহন কোরে এনেছে তা শুনবার আগ্রহে তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে।

রাবণ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'আহা শূর্পনখা ! রাক্ষসদের কি বিপর্যয় ঘটেছে, তা খুলে বলবে তো ! জনস্থানে যদি আরও কোন বিপদ ঘটে থাকে তো আমাকে আগেই সংবাদ দাও নি কেন ? জনস্থান থেকে অকম্পন কি একই কারণে লঙ্কায় এসেছে ? আর, তোমাকেই বা এমন নির্মমভাবে আঘাত করলো কে ?'

শূর্পনখার ক্রোধ রাবণের বর্ধিত আবেগের প্রভাবে স্তিমিত হয়েছে। ক্রোধের পরিবর্তে এখন প্রগাঢ় বিষাদের ছায়া শূর্পনখার মুখে, চোখে। দিগ্বিজয়ী ভ্রাতার সম্মুখে নিজের এবং রাক্ষসদের বিপদের বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে তিনি দুঃখে এবং স্বজন বিয়োগের শোকে ভেঙ্গে পড়লেন। দুনয়ন থেকে ঝরে পড়লো অজস্র ধারা। শোকাবেগ দমন করতে অক্ষম হয়ে শূর্পনখার কম্পিত ও ক্ষীণ দেহলতা অকস্মাৎ ভূমিতে আশ্রয় নিলো।

বিষন্ন বিভীষণ লক্ষ্য করলেন যে শূর্পনখা সংজ্ঞাহীন। বিভীষণ রাবণকে স্তব্ধ হতে ইঙ্গিত কোরে, ধীর পদে এসে শূর্পনখার ভূলুণ্ঠিত দেহখানি পরম যত্নে পালঙ্কে স্থাপন করলেন।

রাণী মন্দোদরীর স্বর্গীয় মুখশ্রীতে বিষাদের চিহ্ন। এক অনাগত বিপদের আশঙ্কায় তাঁর দক্ষিণ নেত্র কম্পিত হলো। মন্দোদরী মাতৃসুলভ উদ্বেগে এবং স্নেহের আতিশয্যে ননদিনীর অনড় মস্তকটি নিজের ক্রোড়ের উপর রাখলেন।

*   *   *   *

খরের অনুচর অকম্পন জনস্থান থেকে খর, দূষণ, ত্রিশিরা সহ চোদ্দ হাজার রাক্ষসের নিধনের সংবাদ নিয়ে লংকায় পেঁাচেছিলেন। শূর্পনখা অসুস্থ হবার পরে, অকম্পন রাবণ ও বিভীষণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'রাক্ষসাধিপতি, আপনি বোধহয় জনস্থানের দুঃসংবাদ পেয়েছেন। খর প্রথমে চোদ্দজন মহাবল রাক্ষসকে রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিলেন।'

রাবণ এতক্ষণে আত্মস্থ হয়েছেন। তিনি তাঁর স্বাভাবিক উগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কে এই রাম? আর রামের অপরাধ কি ছিল বললে না তো, দূত?'

রাক্ষসরাজের প্রশ্নে ভীত হয়ে অকম্পন বললেন—'রাম হচ্ছেন কোশলরাজ্যের অধিপতি দশরথের নির্বাসিত পুত্র। রাক্ষসদের শাসনকর্তার অনুমতি না নিয়েই রাম পত্নী সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছে। বিরাধ রাক্ষসকে এখানে এসে আগেই বধ করেছে। মুনি ঋষিদের অনুরোধে তাঁদের যজ্ঞ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রাক্ষসদের সঙ্গে শত্রুতা করেছে। রামের অনুজ লক্ষ্মণ দেবী শূর্পনখার নাক ও কান কেটে তাঁকে বিকৃতরূপা করে দিয়েছে।'

অকম্পনের কথায় রাবণের ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলো। কর্ণমূল রক্তিম আকার ধারণ করলো, নাসারন্ধ্র স্ফীত হলো। চক্ষু দুটি লোহিতবর্ণ ও দৃষ্টি তীব্র হলো। অকম্পন ত্রস্ত হৃদয়ে রক্ষাধিপতির রোষকম্পিত ভীষণ আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে নিস্পন্দ হয়ে গেলেন।

আকস্মিক ক্রোধের আক্রমণে রাবণের নীলবর্ণ মুখ যেন দশগুণ স্ফীত হলো। রাবণের এই ভীমাকৃতি লক্ষ্য কোরে বিভীষণ প্রমাদ গণলেন। রাবণের মতো বিভীষণও জানেন যে দণ্ডকারণ্যে কোশল নৃপতিদেরও অধিকার আছে। সুতরাং রামের দণ্ডকারণ্যে উপস্থিতি রাক্ষসদের অনুমতির উপর নির্ভর করে না। কিন্তু ভগ্নীর নির্য্যাতন এবং যজ্ঞ রক্ষার আয়োজন প্রভৃতির জন্য রাবণ কখনই রামকে ক্ষমা করবেন না।

রাবণের হিংস্র ও বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত, ময়দানবের নন্দিনী, রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরী পতির এই ক্রোধের অভিব্যক্তিতে শংকিত হন। হয়তো পুনরায় রাবণ সদর্পে নিজের অসামান্য তেজ ও শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং আসমুদ্র হিমাচল পরিক্রম কোরে, ধ্বংসের তাণ্ডবলীলায় মত্ত হবেন।

ক্রোধে অধীর হয়ে রাবণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে ইতিমধ্যে। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দূতকে লক্ষ্য কোরে রাবণ প্রায় চিৎকার কোরে বললেন, 'তোমরা সব অপদার্থ, তাই এক সামান্য মানুষের কাছে হেরে গিয়ে, সর্বস্ব খুইয়ে আমার কাছে বালকের মতো রোদন করতে এসেছ! কেন, তোমরা চারদিক থেকে এই তিনটি মানুষকে ঘিরে ফেলে, তাদের পিষে মেরে ফেলতে পারো নি?'

বিভীষণ মৃদুস্বরে বললেন এই সময়ে, 'শুনেছি, রামের মতো বীরপুরুষ ত্রিভুবনে নেই। মহামুনি বিশ্বামিত্র রামের প্রথম যৌবনে রামকে দিয়ে প্রাচ্যদেশে—অঙ্গ, বিদেহ প্রভৃতি রাজ্যে অনেক রাক্ষস নিধন করিয়েছেন। এ সবই আর্য্য ঋষিদের যাগযজ্ঞ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। মারীচের মাতা তাড়কা রাক্ষসী রামের হাতে নিহত হয়েছিলেন, আপনার বোধহয় মনে আছে। মারীচ ও সুবাহু দুজনে পালিয়ে বেঁচে গিয়েছিল। সুতরাং রামের বাহুবলকে সামান্য মনে করার কারণ নেই। খর, দূষণ ও ত্রিশিরা সকলেই অত্যন্ত শক্তিমান ও কৌশলী যোদ্ধা ছিল। এই সব

কারণে আমরা বেশ উপলব্ধি করতে পারি যে রামের বাহুবল, সাহস, রণনৈপুণ্য কতো বেশী।'

রাক্ষসরাজ ক্রোধ দমন কোরে নীরব উত্তেজনায় বিভীষণের কথাগুলি শুনছিলেন। তিনি মনে মনে বিলক্ষণ চঞ্চল হয়েছেন। আরও হয়েছেন এই আর্য্যজাতীয় মানুষ রামের অমানুষিক পরাক্রম ও তেজের বিবরণ লাভ কোরে।

রাবণ আর্য্য-ক্ষত্রিয়দের শৌর্য্য এবং বীর্য্যের প্রমাণ যথেষ্টভাবেই পেয়েছেন। সপ্তদ্বীপের অধিপতি মান্ধাতা এবং হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জুনকে তিনি পরাজিত করতে সক্ষম হন নি। মনে সংশয় জাগে রাবণের। তবে, এই রাম কে? সে কি শুধু একজন সামান্য মানুষ, এক নির্বাসিত রাজপুত্র মাত্র!

অকম্পন অতঃপর রাবণের পদতলে পতিত হয়ে আর্ত কণ্ঠে বললেন, 'প্রভু, আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করুন। রামের বীরত্বের প্রভাব, এবং রণচাতুর্য্য নিজের চোখে না দেখলে, বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের বিশাল সৈন্যবাহিনী যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করেছে, তারা সব সময়েই চোখের সম্মুখে ধনুর্বাণধারী রামকে দেখেছে! মহারাজ, এ এক অভাবনীয় ব্যাপার! আমি বলে বোঝাতে পারবো না।'

গভীর আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী রাবণ আপন বীরত্বের মহিমায় উজ্জ্বল, আপন মাহাত্ম্যের গরিমায় সদা সচেতন! বিভীষণ রাবণের মানুষ জাতির প্রতি অবজ্ঞা, এবং বিদ্বেষের ভাবের সঙ্গে বিশেষভাবেই পরিচিত। বিভীষণ অকম্পনের মন্তব্যে উদ্বিগ্ন বোধ করেন।

ব্রহ্মার বর রাবণকে মানুষের হাতে মৃত্যু না হবার প্রতিশ্রুতি দেয় নি। রাবণের হৃদয়ে সংশয়ের একখণ্ড কালো মেঘ। রাবণ কি এই মানুষ রামের বীরত্বকে অতিক্রম কোরে তাকে বিনাশ করতে পারবেন না?

রাবণ এতদিন রামকে অথবা আর্য্যাবর্ত্তে ক্ষত্রিয়দের অগ্রগতিকে তেমন গুরুত্ব প্রদান করেন নি। এখন নতুনভাবে রামের অসাধারণ বীরত্বের বিবরণ শুনে তিনি ধৈর্য্যহারা হয়েছেন।

অল্প চিন্তার পরে বিচলিত কণ্ঠে রাবণ বিভীষণকে প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা বিভীষণ, এই রাম সুদূর অযোধ্যা থেকে কি ভাবে দণ্ডকারণ্যে পঞ্চবটীতে এসে উপস্থিত হলো, তুমি কি জানো?'

বিভীষণ রাবণের প্রশ্নে স্থিরভাবেই উত্তর দিলেন, 'জানি বইকি মহারাজ। রামের প্রথম যৌবনে তাঁর রাক্ষসনিধনের কাহিনী আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাই আমি রামের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত থাকতে চেষ্টা করেছি। শুনেছি, তিনি অযোধ্যায় বিমাতার ষড়যন্ত্রে রাজ্য হারিয়ে পিতৃসত্য রক্ষার জন্য চৌদ্দ বৎসরের নির্বাসন বরণ করেছিলেন। রাম প্রথমে চিত্রকূট পর্বতের পাদদেশে আশ্রম নির্মাণ কোরে, সেখানে বাস করেছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর রূপবতী ভার্য্যা সীতা এবং অনুগত ও বীর ভ্রাতা লক্ষ্মণ। অযোধ্যাবাসীরা এবং রামের অন্য ভ্রাতা ভরত বনে এসে তাঁকে স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। রাম তাঁদের সান্নিধ্য এড়িয়ে যাবার জন্য বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ দিকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত করেন। অগস্ত্য মুনির অভিপ্রায় অনুযায়ী রাম পঞ্চবটীতে এসে বাস করার উদ্দেশ্যে কুটীর স্থাপন করেন এবং মুনি ঋষিদের যাগযজ্ঞ বিঘ্নহীন করতে ব্রতী হন। কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত যে কোশলরাজের অধিকার বিস্তৃত আছে, তা আমরা সকলেই জানি।'

বিভীষণের বিবরণে রাবণের দাম্ভিক আননে এক সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনের ভাব।' এই ভাব বিদ্রূপ না বিদ্বেষের তা হয়তো অকম্পন বুঝতে পারেন না। কিন্তু বিভীষণ রাবণের মনের প্রতিক্রিয়াটি ঠিকমতোই উপলব্ধি করেন।

শান্তিকামী বিভীষণ তাই প্রথমেই, যাতে রামের সঙ্গে রাবণ সংঘর্ষের কথা চিন্তা না করেন, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'রাজপুত্র রাম একাধারে পিতৃবৎসল, মাতৃবৎসল, ভ্রাতৃবৎসল এবং পত্নীবৎসল। প্রজাদের প্রতিও তাঁর অসীম অনুরাগ। মহারাজ, আমি যতদূর জানি এই আদর্শ পুরুষ রাম অরণ্যের ক্লেশ উপেক্ষা কোরে প্রাকৃতিক পরিবেশে এক সুখের নীড় রচনা করেছিলেন।'

বিভীষণের শেষের মন্তব্যটি উপেক্ষা কোরে রাবণ আকস্মিকভাবে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিনি দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, 'দূত, তুমি দণ্ডকারণ্যে গিয়ে পলাতক রাক্ষসদের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করো। মারীচকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। আমি নিজে রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করতে যাবো। রাক্ষসদের এই অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের প্রতিশোধ আমি নেবোই। তা ছাড়া ভগ্নী শূর্পনখার অপমান তো আমারই অপমান। কি বলো বিভীষণ? আমি কি এই দুঃসাহসী দুই অর্বাচীনকে প্রশ্রয় দিতে পারি? তাদের মরণকাল ঘনিয়ে এসেছে বোধহয়।'

অকম্পন বিনীতভাবে বললেন, 'মহারাজ, দেবতা বা অসুর কেউই রামকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে না। তবে আপনি যদি অভয় দেন, আমি একটি কথা নিবেদন করতে পারি।'

অকম্পনের উক্তিতে রাবণ যেন এক আশার আলো দেখতে পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'তুমি যা বলার নির্ভয়ে বলো।'

রাক্ষসরাজের আশ্বাসে মনে সাহস সঞ্চয় কোরে অকম্পন বললেন, 'মহারাজ, আগেই বলেছি সীতা নামে রামের এক অসীম রূপবতী ভার্য্যা আছে। শুনেছি, রাম সীতার প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত। রাম এক মুহূর্তও স্ত্রীকে চোখের আড়াল করেন না। আপনি অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ কোরে, রামকে মোহগ্রস্ত করুন, তারপর সীতাকে হরণ করুন। সীতার বিরহে রাম অধিক দিন প্রাণ ধারণ করতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

অকম্পনের অনৈতিক এবং অধার্মিক প্রস্তাবে রাবণ উল্লাস প্রকাশ করলেও, বিভীষণের মুখ বিবর্ণ হলো। বিভীষণের হৃদয়ের গভীরে এক প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব। একদিকে রাক্ষসদের মান, সম্ভ্রম, জাতীয় মর্য্যাদা। অন্যদিকে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যৌক্তিকতা, বিবেকসম্মত কর্তব্য পালনের প্রচেষ্টা।

রাবণ, বিভীষণের পাণ্ডুবর্ণ মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে ভ্রাতার মনের কথা উপলব্ধি করেন। কিন্তু এখানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। রাম বিনা অনুমতিতে রাক্ষসদের অধিকারে পদার্পণ করেছে এবং রাম ও লক্ষ্মণ বিনা প্ররোচনায় ভগ্নী শূর্পনখাকে অপদস্থ কোরে তার অঙ্গহানি করেছে। উভয় ক্ষেত্রেই রাবণ ভীষণভাবে অপমানিত বোধ করেছেন! সামান্য মানুষের এত স্পর্দ্ধা! রাবণ কখনও এক হীন মানুষের দুঃসাহস এবং অবিমৃষ্যকারিতাকে ক্ষমা করবেন না।

রাবণ জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'অকম্পন, আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভয় পাবার কিছুই নেই। আমিও ব্রহ্ম তেজের অধিকারী, আমিও ত্রিভুবন-বিজয়ী বীর। দেখি, কেমনভাবে রাম লক্ষ্মণ নিজেদের প্রাণ নিয়ে অযোধ্যায় ফিরতে

পারে। সীতাকে আমি লুণ্ঠন করবো না। কৌশলে, রামের বিবাহিতা পত্নীকে আমি অপহরণ করবো। তারপরে তাকে লঙ্কায় নিয়ে এসে বশীভূত কোরে আমার অন্তঃপুরে চিরস্থায়ীভাবে রেখে দেবো।'

অকম্পন রাবণের কথায় বিশেষ উৎসাহিত বোধ কোরে রাক্ষসাধিপতিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানালেন।

বিভীষণ এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন কোরে বললেন, 'মহারাজ, এই ঘোর অন্যায় কাজে লিপ্ত হবেন কিনা, বেশ উত্তমরূপে চিন্তা করুন। আমার মন আপনার প্রস্তাবে আদৌ সায় দিচ্ছে না। রামের সঙ্গে শত্রুতার ফল ভালো হবে না। মনে রাখবেন, সমস্ত রাক্ষসকুলের এবং লঙ্কার নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার হাতেই আছে।'

রাবণ চিন্তিত মনে নতবদনে সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মারীচ, হিরণ্যকশিপু দৈত্যের বংশোদ্ভূত সুন্দ অসুরের ঔরসে এবং তাড়কা রাক্ষসীর গর্ভ থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। অপরিমিত শক্তির অধিকারী মারিচ, রাম ও লক্ষ্মণকে প্রথম থেকেই তাঁর শত্রু বলে গণনা করেছিলেন। মুনি ঋষিদের যাগ-যজ্ঞে নানা রকম উৎপাতের সৃষ্টি কোরে, মারীচ ও তাঁর অনুচরেরা আর্য্যাবর্তের পূর্বদিকে মিথিলা, মগধ, অঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে আর্য্যদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারের প্রধান অন্তরায় হয়েছিলেন।

বিশ্বামিত্র মুনির আহ্বানে কোশলপতি রাজা দশরথ রাম ও লক্ষ্মণকে এই অনার্য্যদের দলনে প্রেরণ করলে, বিভৎসরূপা তাড়কা রাক্ষসী এবং মারীচসহ সুবাহু ও অন্যান্য হিংস্র রাক্ষসদের সঙ্গে রাজপুত্রদের সংঘর্ষ হয়। রামের অলৌকিক বীরত্বে এই প্রতিহিংসাপরায়ণ নিষ্ঠুর নরখাদকদের বিপর্য্যয় ঘটে। তাড়কার বিনাশ সাধিত হোলে, রামের আক্রমণে জর্জরিত মারীচ আর্য্যাবর্ত ত্যাগ কোরে দণ্ডকারণ্যে তপস্যায় মগ্ন হয়েছিলেন। সুবাহু রামের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে বনবাসের সময় পূর্ণ করার জন্য দণ্ডকারণ্যে গোদাবরীর তীরে এসে উপস্থিত হলে, রাক্ষসপ্রবর মারীচের মন চঞ্চল হয়। শত্রুকে দীর্ঘদিনের অদর্শনে অন্তঃকরণে ব্রাহ্মণ তপস্বীদের উপর আগের অত্যাচারের জন্য যে অনুতাপ এবং প্রায়শ্চিত্তের মনোভাব জাগরিত হয়েছিল, এখন শত্রুকে পুনরায় প্রত্যক্ষ কোরে সেই সাত্ত্বিক ভাব অদৃশ্য হলো। পরিবর্তে, মনে উদ্রেক হলো রামের বিরুদ্ধে মাতৃবধের জন্য প্রবল প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি।

যেমন চিন্তা তেমন কাজ। মারীচ দুজন সঙ্গীর সঙ্গে মৃগের রূপ ধারণ কোরে রামকে অতর্কিতে আক্রমণ করলেন। রাম অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ কোরে তার অনুচর দুজনকে বধ করলেন। মারীচ পালিয়ে গিয়ে কোনক্রমে পরিত্রাণ লাভ করলেন। রামকে নির্য্যাতন করার স্পৃহা মারীচের চিরতরে ঘুচে গেল।

লঙ্কায় রাবণ ইতিমধ্যে মন্ত্রীদের সঙ্গে দ্রুত পরামর্শ কোরে পুষ্পক রথের সহায়তায় আকাশপথে সমুদ্র লঙ্ঘন করলেন। তারপরে বহুবিধ অরণ্য, সরোবর এবং নদী অতিক্রম কোরে দণ্ডকারণ্যে এসে পৌঁছলেন।

তখন মারীচ রামের হাতে নিজের নিগ্রহের কাহিনী বর্ণনা কোরে, রাবণকে সীতা হরণের অভিলাষ বর্জন করতে উপদেশ দিলেন। মারীচ এমন ভয়ও দেখালেন যে রামের বীরত্বের ও বিক্রমের প্রভাবে শুধু রাবণ কেন, সমগ্র রাক্ষসকুলই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। সুতরাং নিরপরাধ রামের সঙ্গে অহেতুক শত্রুতা করা উচিত নয়, আরও নয় এই কারণে যে রামকে পরাজিত করা দৈত্য, দানব, রাক্ষস, এমনকি দেবতাদেরও অসাধ্য।

—'তোমার এই অযাচিত উপদেশের জন্য আমি লংকা থেকে এত দূর ছুটে আসি নি। তুমি আমাকে সীতাকে হরণ করার জন্য সহায়তা করবে কিনা আমি জানতে চাই। তুমি হ্যাঁ কি না-কি বলবে বলো।'

উগ্রভাবে এই কথাগুলি বলে রাবণ স্তব্ধ হলেন।

মারীচ চিরদিন রাবণের অনুগত, সুতরাং রাবণের দাম্ভিক এবং ক্রূর প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত। মারীচ মনে মনে ভীত না হলেও বিচলিত বোধ করেন। রাবণ, বিভীষণ নন যে যুক্তি ও ন্যায়নীতিতে কর্ণপাত করবেন। রাবণ রাক্ষসরাজ রাবণই।

ন্যায় ও অন্যায়ের বোধ রাবণের রাক্ষসপ্রবৃত্তি ও রাক্ষস-স্বার্থের নিকট অতি তুচ্ছ। রাবণের অহমিকার প্রতি যে আঘাত রাম করেছেন দণ্ডকারণ্যে চৌদ্দ হাজার রাক্ষস নিধন কোরে, যে অন্যায় রাম করেছেন রাক্ষসদের স্বার্থের বিরুদ্ধে, যে অপমান রাম করেছেন রাক্ষসাধিপতি রাবণের প্রিয়তমা ভগ্নীকে বিকৃতরূপা করার মধ্যে, তার জন্য রামকে রাবণের হিংস্র ক্রোধ এবং নির্দয় প্রতিশোধের সম্মুখীন হতেই হবে। রাবণ রামের সঙ্গে বিগ্রহে প্রবৃত্ত হতে দৃঢ়সংকল্প। এইভাবে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেন, মারীচ।

মারীচ মনে মনে বল সঞ্চয় কোরে বিনীতভাবে বললেন, 'মহারাজ! আমি আপনাকে অযাচিত উপদেশ দিই নি। কারণ, তা দেবার অধিকার আমার নেই। আমি শুধু আমার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর কোরে আমার নিজের ধারণা আপনাকে জানিয়েছি। আপনাকে কে বা কারা এই সীতাহরণের মন্ত্রণা দিয়েছে, আমি জানি না। তবে আমি পুনরায় বলছি, ওদের নিজেদের পথে যেতে দিন, ওদের সঙ্গে কোন সংঘর্ষে আপনি লিপ্ত হবেন না। হলে কিন্তু আপনার এবং রাক্ষসদের পক্ষে পরিণাম শুভ হবে না।'

মারীচের অকপট ও স্পষ্ট ভাষণে রাবণ আদৌ বিচলিত হলেন না। তাঁর ক্রোধবহ্নি তীব্রভাবে বর্ধিত হয়ে যেন মারীচের সর্বাঙ্গ দগ্ধ করলো।

ঘৃণায় ও বিদ্বেষে মুখ কুঞ্চিত কোরে, রাবণ গর্বিতভাবে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'মারীচ, আমি যা সিদ্ধান্ত করেছি তার একটুও নড়চড় হবে না। তুমি মায়াবলে এক বিচিত্র বর্ণের স্বর্ণমৃগের আকার ধারণ কোরে, সীতা এবং তার সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণের চোখে এক মরীচিকার সৃষ্টি করবে। সীতা যখনই রাম ও লক্ষ্মণকে এই স্বর্ণমৃগটিকে ধরার জন্য পাঠাবে, আমি সেই সুযোগে রামের নির্জন কুটীরে সন্ন্যাসী-ভিক্ষুকের বেশে উপস্থিত হয়ে সীতাকে হরণ করবো। যদি আমার কথার অন্যথা হয়, তবে তোমাকে আমি হত্যা করতেও দ্বিধা করবো না।'

রাবণের ভীতিপ্রদ বচনে এবং রাবণের ঘন নীল আননের নিষ্ঠুর ও ক্রূর অভিব্যক্তিতে অভিভূত হয়ে মারীচ মনে মনে প্রমাদ গণলেন। এই আসন্ন পরীক্ষার পরিণাম কি? রাবণের আদেশ পালন না করলে রাবণের হাতে মৃত্যু, পালন করলে রামের হাতে

মৃত্যু। এই দুই নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনার মধ্যে মারীচ রামের হাতে নিধনই শ্রেয়তর বলে সিদ্ধান্ত করলেন।

মারীচ রাবণের আদেশ মতো কাজ করতে স্বীকৃত হয়ে, রাক্ষসরাজের উত্তপ্ত অন্তঃকরণে শীতল বারি সিঞ্চন কোরে সাময়িকভাবে আত্মরক্ষায় সমর্থ হলেন।

* * * *

রাম কল্পনাও করেন নি যে জনস্থানে রাক্ষসদের সঙ্গে বিরোধ তাঁকে এক প্রচণ্ড বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করবে। পঞ্চবটীর প্রেমনিবিড় অরণ্যবাস যে বিঘ্নিত হতে চলেছে, সীতার মনে কেন যেন এই আশংকার উদয় হয়েছিল। কিন্তু পতির উষ্ণ হৃদয়ের স্বপ্নময় স্পর্শ, দেবরের নীরব ও অক্লান্ত সেবা সীতার মানসিক স্থৈর্য্যকে নষ্ট হতে দেয় নি।

দণ্ডকারণ্যের নৈসর্গিক শোভায় মুগ্ধ হয়ে সীতা আনন্দে আত্মহারা। রামের হাত দুটি ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সীতা বললেন, 'নাথ, এই গহন অরণ্যে প্রকৃতির লীলাভূমিতে বাস কোরে আমার মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। তুমি কি এই পঞ্চবটীকে চিত্রকূটের চেয়ে মনোরম বলে মনে করো না?'

সীতার মনের ভাবটি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরে রাম আবেগময় কণ্ঠে বললেন, 'প্রিয়তমে, তুমি যেখানে আমার পাশে থাকবে, সেই স্থানই আমার কাছে মনোরম। সেই স্থানই আমার গৃহ।'

পতির এই বাক্যে সীতা মনে মনে পুলকিত হন। এখানকার বৃক্ষলতা, পক্ষীর কূজন, বন্য পুষ্প এবং নানাবিধ ফলের প্রাচুর্য, তটিনীর স্বচ্ছ জল, অদূরে ময়ূরের নৃত্য, সীতার মনকে হরণ করেছে। গোদাবরী নদীর কিনারায় প্রকৃতির সৌন্দর্যময় চিত্রটি সীতার মনের মধ্যে গভীরভাবে অংকিত হয়েছে। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে যেন মনের কোণে একটা উদ্বেগ ও শংকার রেশ, যার অস্তিত্ব এই রাক্ষসদের সঙ্গে সংঘর্ষের আগে আদৌ ছিল না।

যত দিন যায় সীতার চিত্ত এক অনাগত বিপর্যয়ের ভয়ে সংকুচিত হয়। কিন্তু রামের হৃদয়ে দুশ্চিন্তার বাষ্পও নেই। রাম বৈদেহীকে প্রবোধ দেন, পত্নীর হৃদয়ের দ্বিধা ও দ্বন্দ্বকে দূরীভূত করতে সর্বদাই সচেষ্ট হন।

রামের হৃদয়ে বিকার নেই, শংকা নেই। রামের মনে এক উদার মুক্তির আনন্দ। রাজধর্ম পালনের জন্য উৎসর্গীকৃত দেহ ও মন আজ অরণ্যের পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, নদীর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে যোগীর গার্হস্থ্য সুখ অনুভব করছে।

প্রিয়তমা পত্নীর কৃচ্ছ্রসাধনে দুঃখিত রাম, লক্ষ্মণের বঞ্চিত জীবনের জন্যও হয়তো নিজেকে দায়ী মনে করেন। বিলাসনগরী অযোধ্যার সুখ-সম্ভোগের স্মৃতি হয়তো সময়ে সময়ে মনকে আচ্ছন্ন করে। কিন্তু তাতে নিজের বঞ্চনার দুঃখ অপেক্ষা অপরকে বঞ্চিত করার অপরাধবোধই তাঁর মনকে বার বার পীড়িত করে।

রামকে অনেকক্ষণ নীরব দেখে সীতা রামের সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে প্রেমবিহ্বল কণ্ঠে বললেন, 'প্রাণেশ্বর, তুমি কি মনে মনে আমার দুঃখের কথা চিন্তা কোরে কষ্ট পাচ্ছো? প্রিয়তম, তুমি আমার পাশে থাকতে আমার দুঃখ কি? যেখানে তোমার স্থান সেখানেই আমার স্থান। তুমি এবং তোমার উপযুক্ত ভাই লক্ষ্মণ যেখানে উপস্থিত, সেখানে আমার দুঃখই বা কি আর ভয়ই বা কি!'

রামের মুখে এবং চক্ষে এক গাঢ় প্রেম ও প্রীতির অভিব্যক্তি। পতির প্রণয়ের এই দুর্লভ মুহূর্তটিতে সীতার দেহের মধ্য থেকে এক অপার্থিব জ্যোতি নির্গত

হয়। রামের স্বর্গীয় আননশোভায় বিমোহিত হয়ে, সীতা রামকে এক নিবিড় আলিঙ্গনে বন্ধ করেন। সীতার চক্ষু দুটি আর্দ্র হয়।

রাম কিছু উচ্চারণ করার আগেই মধুর কণ্ঠে সীতা বলেন, 'আর্যপুত্র, তোমার মতো পতি লাভ কোরে আমার জন্ম সার্থক হয়েছে। তোমার একনিষ্ঠ প্রেমই আমার হৃদয়ের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। তুমি শৌর্যে, বীর্যে, মহত্বে-সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। এই স্থান সম্বন্ধে আমার মনে যে একটা অজানা ভয় সময়ে সময়ে উদয় হয়, সেটা নেহাতই মনের একটা ভ্রম। তোমরা দুই বীরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা থাকতে, রাক্ষসদের কাছ থেকে আমাদের কোন বিপদের আশংকা নেই।'

রাম সীতাকে বাহুডোরে বন্ধন কোরে, কোমল কণ্ঠে বললেন, 'বৈদেহী, তোমার অকপট উক্তিতে আমার প্রাণ ভরে যায়। তুমি মনে কোনো ভয় রেখো না। আমি উপস্থিত থাকতে, কেউ তোমার কেশ স্পর্শ করতে পারবে না। আর আমার আগেই লক্ষ্মণ যে কোন আততায়ীকে বিতাড়িত অথবা হত্যা করতে পারবে। লক্ষ্মণের বীরত্বের পরিচয় আর নতুন কোরে দেবার প্রয়োজন নেই।'

রামের মিষ্ট বাক্যে আশ্বস্ত হয়ে সীতা বললেন, 'নাথ, এসো, আমরা কুটির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ কোরে ক্ষণকালের জন্য গোদাবরীর তীরে গিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করি এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করি।'

রাম, সীতার প্রস্তাব অনুমোদন কোরে লক্ষ্মণের উদ্দেশে গেলেন। সীতা হৃষ্টচিত্তে রামের অনুগমন করলেন।

* * * *

মারীচের মায়াবী শক্তিতে বনবাসী সীতা ও রামের চোখে এক অভাবনীয় মোহের সঞ্চার হলো।

লক্ষ্মণ সেই মনোহর, নানাবিধ রত্নে বিভূষিত, স্নিগ্ধবর্ণ মৃগটিকে প্রথম থেকেই সন্দিগ্ধ চিত্তে দেখে দূর থেকে বললেন, 'আমার মনে হয়, দুষ্টস্বভাব মারীচই এই স্বর্ণময় মৃগের মরীচিকা সৃষ্টি কোরে আমাদের ক্ষতি করার বাসনা করেছে।'

পুষ্পনয়নে অনুরতা সীতা রত্নবিচিত্রিত মৃগটিকে দেখে এতই প্রলুব্ধ এবং মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন যে তিনি রাক্ষসের এই কূট চাতুর্যের কথা চিন্তা করতেই সক্ষম হলেন না। যতই মৃগটিকে লক্ষ্য করেন, ততই তাকে নিকটে পাবার লোভ তাঁকে গ্রাস করতে থাকে। ততই তিনি রামকে এই মৃগটিকে তাঁকে এনে দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন।

হরিণটিকে লক্ষ্য কোরে রামেরও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। স্বেচ্ছায় অরণ্যের কঠিন জীবনের দুঃখ ও ক্লেশ সহ্যকারী প্রিয়তমা ভার্যার এই সামান্য অভিলাষটি পূর্ণ করার জন্য তিনি অস্বাভাবিকভাবে ব্যগ্র হলেন। সাবধানী লক্ষ্মণের হিতবাক্য রামের হৃদয় স্পর্শ করলো না।

মৃগটিকে পাবার জন্য সীতার আগ্রহ দেখে রাম বললেন, 'লক্ষ্মণ, এই মৃগটিকে পাবার তীব্র বাসনা হয়েছে, জানকীর। এই মৃগের কাঞ্চনময় চর্মের উপর বসা সকলের পক্ষে অত্যন্ত সুখস্পর্শ হবে, সন্দেহ নেই। আমি শীঘ্র একে ধরে নিয়ে আসছি, তুমি চারদিকে দৃষ্টি রেখে কুটিরে থাকো। প্রয়োজনে, জটায়ু তোমাকে সাহায্য করবেন।'

হয়তো রামের মনে এক আশু বিপদের পূর্ববোধ জেগেছিল। রামের বাণের আঘাতে মরবার আগে মৃগরূপী মারীচ নিজের রাক্ষস রূপ ধারণ কোরে, হা সীতা, হা লক্ষ্মণ, বলে চিৎকারের মধ্যে রামের সঙ্গে চরম শত্রুতা সাধন করে গেলেন।

রামের প্রাণ সংশয় হয়েছে চিন্তা কোরে, শোকে দুঃখে সীতা রামের প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে লক্ষ্মণকে মায়ামৃগের নিকট যেতে বাধ্য করলেন। অত্যন্ত অনিচ্ছাকৃত-ভাবে লক্ষ্মণ আশ্রম ত্যাগ করলে, সীতা তাঁর অদূরদর্শিতার অশুভ পরিণাম থেকে অব্যাহতি পেলেন না। রাবণ ভিক্ষুকের বেশে আবির্ভূত হয়ে ছলনার সাহায্যে সীতাকে হরণ করলেন।

* * * *

রাম ও লক্ষ্মণ বেশ কিছুক্ষণ পরে মৃগসহ কুটিরে ফিরে এসে সীতাকে দেখতে পেলেন না। ইতিমধ্যে যে রাবণ তপস্বীর ছদ্মবেশে ভিক্ষার জন্য কুটিরে উপনীত হয়ে ছলে এবং বলে সীতাকে হরণ করেছেন, তা তাঁরা জানতে পারেন নি।

সীতার অদর্শনে দুঃখে ও শোকে আত্মহারা হয়ে রাম ভুলুণ্ঠিত দ্রুমের মতো ভূমিকে আলিঙ্গন কোরে করুণ স্বরে বিলাপে মগ্ন হলেন। প্রেমময়ী ভার্য্যার নিরবচ্ছিন্ন সান্নিধ্য, নিবিড় প্রেমের স্পর্শ, একত্র আহার-বিহার, সব কিছুর মধুর স্মৃতি রামের ভগ্ন হৃদয়কে মথিত করে এক তীব্র হাহাকার ও বেদনায় পর্যবসিত হলো।

সীতার বিরহে কাতর নবদূর্বাদলশ্যাম দশরথ-তনয় রামের অশ্রুবিধৌত, বিষাদগ্রস্ত মুখটি নিরীক্ষণ কোরে যেন বনের পশু, পক্ষী, যক্ষ, কিন্নর, সকলেই অভিভুত হয়ে উদাস নয়নে রামের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানালো। বনের বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প যেন রামের এই শোকের উচ্ছ্বাসে ম্রিয়মাণ হলো।

রাম অস্থিরচিত্তে গোদাবরীর তীরে উপস্থিত হয়ে উম্মাদের মতো চিৎকার করে বললেন, 'লক্ষ্মণ, জানকী হয়তো নিজের লজ্জা ও সম্মান রক্ষা করার জন্য এই পুণ্যতোয়া গোদাবরীতে আশ্রয় নিয়ে আমাদের দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত কোরে চিরদিনের মতো চলে গেছেন। হায়, পিতৃসত্য পালন কোরে সীতাকে এবং তোমাকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় আমার জননীর কাছে এবং মাতা কৈকেয়ী ও মাতা সুমিত্রার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারলাম না! আমার আর এক মুহূর্তও প্রাণ ধারণ করতে ইচ্ছা করছে না।'

দণ্ডকারণ্যের চারিদিকের নির্জনতা ভেদ কোরে রামের শোকবিদ্ধ কণ্ঠস্বর যেন আকাশে বাতাসে বৃক্ষপত্রে প্রতিধ্বনিত হলো। সীতার সুস্নিগ্ধ ও অমায়িক ব্যক্তিত্বের স্পর্শে যে অরণ্যভূমি যেন সজীব হয়ে ফলে, ফুলে, সৌরভে সমৃদ্ধ ও আমোদিত হয়ে উঠেছিল, সেই বিশাল বনরাজ্যে আজ ঊষর মরুভূমির রুক্ষতা। মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ সীতার অভাবে যেন জীর্ণ ও শ্রীহীন।

বক্ষে করাঘাত কোরে শিশুর মতো রোদন করছেন রাম। বাষ্পাকুল নয়নে কখনও লক্ষ্মণকে দায়ী করছেন এই দুর্দৈবের জন্য।

—'স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ব্যাকুলতার প্রকাশে, তোমার মতো ধৈর্য্যবান, বিচক্ষণ বীরের এই মতিভ্রম হলো কেন লক্ষ্মণ? তুমি কোন যুক্তিতে তাঁকে একাকী রেখে গেলে!'

ঘটনাচক্রে বিমূঢ় লক্ষ্মণ এই অভিযোগের কি উত্তর দেবেন! রামের কাতরতায় লক্ষ্মণের দুঃখিত হৃদয়ে রামের জন্য অনুকম্পার সঞ্চার হলো।

লক্ষ্মণ সবিনয়ে বললেন, 'আপনি এত ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন? আসুন, আগে আমরা সমস্ত বনভূমি তন্ন তন্ন করে খুঁজি।'

রামের করুণ মুখচ্ছবি লক্ষ্মণকে বিচলিত করে। অনুনয়ের স্বরে লক্ষ্মণ পুনরায় বললেন, 'প্রভু,আপনি এই দুঃখ ও শোকের আবেগকে সংযত করুন। জানকীর অদর্শনে আমার হৃদয়ও কি বিষাদে মগ্ন হচ্ছে না?. কিন্তু শিশুর মতো রোদন করলেই

তো তাঁকে পাওয়া যাবে না। আপনার তুল্য বীর কোথায় আছে? শিশুর মতো আচরণ আপনার আদৌ শোভা পায় না। চেষ্টা না করলে কোন বিষয়েই সুফল পাওয়া যায় না।'

লক্ষ্মণের সান্ত্বনা এবং মৃদু তিরস্কার-মিশ্রিত ভাষণে রাম সম্বিত লাভ করলেন। রামের মনের কোণে এই সন্দেহ যে অরণ্যের কোন রাক্ষসই ঘৃণ্য চৌর্যবৃত্তির দ্বারা তাঁর এই অপূরণীয় ক্ষতি সাধন কোরে আগের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে।

এই কথা মনে মনে চিন্তা কোরেই রাম হঠাৎ রুদ্র মূর্তি ধারণ করলেন। নিমেষের মধ্যে তাঁর তৈলহীন বন্ধ জটাজুট যেন অসংযত হয়ে গেল। দেহস্থ তেজের প্রভাবে এবং রৌদ্রের দহনে রামের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ আকৃতি এক ভয়ংকর সংহারকারী মূর্তিতে পরিণত হলো।

রামের এই উগ্র মূর্তি লক্ষ্মণও যেন সহ্য করতে পারলেন না। তথাপি লক্ষ্মণ রামের মুখের প্রতি শান্ত দৃষ্টি প্রসারিত কোরে নীরবে অপেক্ষা করলেন।

আপন ক্ষাত্রতেজ ও পুরুষকারে উদ্দীপিত হয়ে রাম কঠিন স্বরে বললেন, 'লক্ষ্মণ, আমাকে অনেকেই কোমলস্বভাব মনে কোরে আমার শক্তি ও সামর্থ্যকে হেয় জ্ঞান করে। আমি সংযতচিত্ত, করুণাপ্রবণ এবং মৃদুস্বভাব। হয়তো অনেকেই সেই কারণেই আমার বীরত্বের প্রখরতা উপলব্ধি করে না, উপরন্তু আমাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে।'

রামের এই আত্ম-বিশ্লেষণে লক্ষ্মণ মনে মনে উৎসাহিত হন। এইবার রাম নিজের শক্তি এবং তেজের সহায়তায় এই বিপর্যয়ের প্রতিকারে আগ্রহী হবেন এবং অর্থহীন শোকাবেগ বর্জন কোরে মৈথিলীর সন্ধানে তৎপর হবেন।

রাম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পরে পুনরায় রোষকষায়িত নয়নে বললেন, 'দয়া মায়া, ক্ষমা প্রভৃতি গুণই আমার বিপদের কারণ হয়েছে। আমি এইসব গুণ বিসর্জন দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে রাক্ষসদের ও সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ করবো। কেউই আমাকে সংহার-প্রবৃত্তি থেকে নিবারণ করতে পারবে না।'

রামের সেই বিজাতীয় রোষের প্রতি এই বলে শান্তির প্রলেপ দিলেন, লক্ষ্মণ, 'ভ্রাতঃ, আমাকে ক্ষমা করুন। বিপদের মুখে অসহায় আর্তনাদ অথবা অবৈষয়িক ক্রোধ, এই দুইয়েরই অনেক ঊর্ধ্বে আপনি। আপনি প্রকৃত বীর, অলৌকিক শক্তির অধিকারী। আপনি উদারহৃদয়, মহৎ ও বিচক্ষণ। আসুন, ভাবপ্রবণতা পরিত্যাগ করে, এই অরণ্যের মধ্যে এবং বাহিরে আমরা মৈথিলীর সন্ধান করি। কোথায়ও না কোথায়ও আমরা তাঁর অদৃশ্য হবার কোন না কোন সূত্র আবিষ্কার করবোই।'

স্থিতধী লক্ষ্মণ অরণ্যের নিরীহ হরিণদের মূক ইঙ্গিত ও পদক্ষেপ লক্ষ্য কোরে জানকীর দক্ষিণ দিকে অপসারণের বিষয়ে আগেই নিশ্চিত হয়েছিলেন। রামকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মণ অরণ্যের মধ্যে দক্ষিণ দিকেই অগ্রসর হলেন।

সীতার হারিয়ে যাওয়ার প্রথম সূত্র শীঘ্রই তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হলো। বৈদেহীর দেহবিচ্যুত পুষ্পস্তবকগুলি ভূমিতে নিপতিত দেখে রামই সেগুলি সীতার কবরী থেকে স্খলিত বলে সনাক্ত করলেন। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ভার্য্যার পরিত্যক্ত কুসুমগুলি রামের হৃদয়ে পুনরায় আবেগের সঞ্চার করলো।

একটু অগ্রসর হতেই ভূমিতে রাক্ষসের এবং সীতার পদচিহ্ন দৃষ্ট হলো। অদূরে ভূমির উপর সীতার একটি অলংকার পড়ে থাকতে লক্ষ্য করলেন, দুজনে। তারপরে

রক্তরঞ্জিত ভূমিতল দৃষ্টিপথে এলো। রামের মনে ঘোর সংশয় যে রাক্ষস বোধ হয় সীতাকে খণ্ড খণ্ড কোরে উদরস্থ করেছে।

সীতার পরিত্যক্ত অলংকারখানি নিয়ে গভীর মমতা সহকারে অশ্রুপূর্ণ লোচনে রাম বারবার সেইটিকে লক্ষ্য করলেন। যেন কাঞ্চনময় সেই অলংকারের গাত্রে সীতার অনিন্দ্যসুন্দর ও পবিত্র মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে! লক্ষ্মণ এই দৃশ্যে বিচলিত হয়ে দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন।

ক্ষোভেও দুঃখে জর্জরিত হয়ে রাম বললেন—'ভাই, এই দেখ দুই রাক্ষসের মধ্যে ঘোর যুদ্ধের চিহ্ন এই স্থানের চার দিকে। এই দেখ রত্নখচিত প্রকাণ্ড এক ধনু, স্বর্ণময় বর্ম, বিরাটাকার ছত্র, এ সব চূর্ণিত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। এই সব তীক্ষ্ন বাণসমূহ, নিহত সারথী, যুদ্ধের রথ, অগ্নিপ্রভ ধ্বজ, এসব কার বলো দেখি? দেবতার না রাক্ষসের? লক্ষ্মণ, নিশ্চয়ই এইসব বস্তু রাক্ষসদের এবং এই রাক্ষসেরাই আমার প্রাণাধিক প্রিয় জানকীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে এবং তার পরে তার দেহ ভক্ষণ করেছে।'

এই উক্তির পরে গভীর হতাশায় মগ্ন হলেন রাম। চক্ষে তাঁর অশ্রুর বন্যা। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে, এই ভয়ংকর দৈব বিড়ম্বনার গভীরতা উপলব্ধি কোরে।

রামের কাতর কণ্ঠে ক্ষীণ আর্তনাদের শব্দ। লক্ষ্মণ লক্ষ্য করলেন রাম ভূমিতে পতিত হয়ে বিলাপ করছেন,—'হায়, আমি অযোধ্যাবাসীদেরই বা কি বলবো! জানকীর পিতামাতার কাছেই বা কি কোরে মুখ দেখাব! আমার মৃত্যুর পরে জীবনের পরপারে স্বর্গগত পিতার সামনেই বা কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবো! হায় লক্ষ্মণ, সীতার বিরহে আমি মৃত্যুবরণ করলেও, পিতৃসত্য পালনের অক্ষমতার পাপ আমাকে ত্যাগ করবে না!'

লক্ষ্মণ রামের হৃদয়ের দুঃখ ও দ্বন্দ্বের কথা সম্যকভাবেই উপলব্ধি করেছেন। লক্ষ্মণ নিমেষের মধ্যেই লক্ষ্য করলেন যে রামের বহিরঙ্গ থেকে হতাশার মেঘ ক্রমশঃ অপসৃত হচ্ছে। রাম মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে করতে প্রচণ্ড ক্রোধে আবিষ্ট হয়ে কৃতান্তের মতো ভীষণ হলেন। দু হাত মুষ্টিবদ্ধ কোরে যেন হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য রাম অসীম নীল অম্বরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

রামকে পুনরায় পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণ ধীর কণ্ঠে বললেন, 'এইবার প্রথমেই আমরা গৃধ্ররাজ জটায়ুর খোঁজ করবো। তাঁকে আহত অথবা বধ না কোরে, দস্যু কখনও জানকীকে এই অরণ্যভূমি থেকে বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না। কে আমাদের শত্রু, সেই কথাই আমাদের প্রথমেই জানতে হবে।'

লক্ষ্মণ অতঃপর জনস্থানের প্রতিটি বনাঞ্চলে ও গিরিকন্দরে রাক্ষসদের খোঁজ করার জন্য রামকে পরামর্শ দিলেন। এইভাবে অনুসন্ধান করার সময়ে তাঁরা ক্ষতবিক্ষত-দেহ গৃধ্ররাজ জটায়ুকে রক্তাক্ত ও ভূপাতিত অবস্থায় দেখলেন। জটায়ুর তখন প্রায় শেষ অবস্থা।

জটায়ু অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে বললেন—'রাবণ সীতাকে হরণ কোরে নিয়ে গেছে। আমি এই বার্ধক্যজীর্ণ দেহেও প্রাণপণে যুদ্ধ কোরে তার ধনু, বাণ, রথ, ছত্র-সবই চূর্ণ করেছি। সেই দুরাত্মা বলশালী রাবণ খড়্গাঘাতে আমার পক্ষ দুটি ছেদন করেছে। সে আকাশমার্গে সীতাকে নিয়ে দক্ষিণের দিকে চলে গেছে। রাম, আমি তোমার পিতার পুরানো বয়স্য। এই দুঃসংবাদ তোমাকে জানাবার জন্যই আমি

বেঁচে আছি। তুমি দুঃখিত হয়োনা। আমি বলছি তুমি শীঘ্রই সীতাকে ফিরে পাবে।'

এর বেশী কোন সংবাদ জটায়ু দিতে পারলেন না। রাবণের নিবাস সঠিক কোথায় বলার আগেই জটায়ুর প্রাণবায়ু নির্গত হলো। রাম ও লক্ষ্মণ যত্ন সহকারে জটায়ুর দেহের সৎকার করলেন এবং গোদাবরীর তীরে গিয়ে তর্পণ করলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লঙ্কেশ্বর রাবণ আকাশমার্গে বহু বন উপবন পর্বত নদী ও সরোবরের উপর দিয়ে এসে অবশেষে সাগর অতিক্রম কোরে লংকাপুরীতে প্রবেশ করলেন। রাবণ কিন্তু সীতাকে মহিষী মন্দোদরীর নিকট নিয়ে যেতে কুণ্ঠিত হলেন।

মন্দোদরী কখনই রাবণের এই পরস্ত্রী-হরণকে স্বাগত জানাতেন না। অপর পক্ষে, হয়তো রাবণের এই কাজকে অত্যন্ত গর্হিত ও হীন বলে বিবেচনা করতেন।

নিজের পত্নীর চরিত্র সম্বন্ধে রাবণ উত্তমরূপেই অবহিত ছিলেন। তাই রাবণ লংকার অন্তঃপুরে রাক্ষসী পরিচারিকাদের হাতেই সীতার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। সীতাকে শয্যাসঙ্গিনী করার অদম্য লিপ্সায় রাবণের লালসাপূর্ণ উগ্র রাক্ষসপ্রবৃত্তি প্রায় দুর্দমনীয় হয়ে উঠলো। কিন্তু সীতা পরস্ত্রী এবং সে স্বেচ্ছায় রাবণের নিকট আত্ম-সমর্পণ না করলে, রাবণ বলপ্রয়োগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

বিভীষণ রাবণের পরনারীলোলুপতার হীন প্রবণতার সঙ্গে পরিচিত থাকলেও, রাবণের নীতিজ্ঞানের উপর বিভীষণের পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু স্বার্থান্বেষী পার্শ্বচর এবং চাটুকারের অভাব রাক্ষসপুরীতে ছিল না। বিভীষণের উদার এবং কোমল হৃদয় অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিল না। সেই অন্যায় জ্যেষ্ঠ এবং সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ রাবণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হলেও, নয়।

বিভীষণের বিশ্রামপ্রকোষ্ঠে হঠাৎ তাঁর কিশোর পুত্র তরণীসেনের আবির্ভাব ঘটলো। বিভীষণ গবাক্ষপথে দূরে কি যেন লক্ষ্য করছিলেন। সরমা গৃহে অনুপস্থিত।

তরণীসেন ধীর পদে পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে নত মুখে অপেক্ষা করলেন। বিভীষণের মুখ বর্ণহীন ও বিমর্ষ। তিনি গম্ভীরভাবে প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থিত পালঙ্কে এসে বসলেন।

পিতার সৌম্য মূর্তিতে এই অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য কোরে তরণীসেন মনে মনে চঞ্চল হন। তাঁর বালকহৃদয়ে এক ভয়ের সঞ্চার হয়। পিতাকে কোন প্রশ্ন করতে কুণ্ঠা বোধ করেন, তরণীসেন।

এই সময়ে ঈষৎ উত্তেজিতভাবে গৃহে প্রবেশ করেন সরমা। সম্মুখে কাষ্ঠ-পুত্তলীবৎ পুত্রকে দেখে সরমা বিস্মিত বোধ করেন। হঠাৎ সরমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় স্বামীর মৌন মূর্তির উপর। বিভীষণের মুখের ভাব সরমাকে আদৌ আশ্বস্ত করে না। সরমার হৃদয়ে এক অজানা আতংকের সঞ্চার হয়।

পালঙ্কের উপর অর্ধশয়ান বিভীষণ সরমার এই সংশয়াপন্ন ভাবটি লক্ষ্য কোরে তরণীসেনকে সস্নেহে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। পিতার এই স্নেহের স্পর্শে তরণীসেন বিশেষ অভিভূত বোধ করেন এবং তাঁর দুচক্ষে অশ্রুস্রোত বহে যায়। পুত্রের চক্ষে আনন্দাশ্রু মাতাকেও যথেষ্ট বিচলিত করে। মাতা ও পুত্র পরস্পরে দৃষ্টি বিনিময় কোরে যেন ইঙ্গিতে কিছু ভাব বিনিময়ও করেন।

—'তরণী, তুমি অস্ত্রশিক্ষাকে অবহেলা কোরে এই অসময়ে এখানে এসেছ কেন, বৎস? তোমার দেহ ও মন কি সুস্থ নেই? কি হয়েছে তোমার?'

বিভীষণের সহৃদয় সম্ভাষণে তরণীসেন বিগলিত বোধ করলেন। তরণীসেন স্বভাবতঃই শান্ত ও স্বল্পবাক। সরমা পুত্রের নিকটে এসে প্রগাঢ় অনুকম্পায় তার মাথার উপর হাত রাখলেন। তরণীসেনের সরল ও নিষ্পাপ মুখে এক সংকোচের অভিব্যক্তি। বিভীষণ পুত্রের বিব্রত অবস্থা লক্ষ্য কোরে সরমার প্রতি এক প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

সরমা তরণীসেনের দুটি হাত ধরে তাঁকে বিভীষণের পাশে বসালেন। তরণীসেন সলজ্জভাবে পিতার মুখের প্রতি পলকের জন্য দৃষ্টিপাত কোরে, পুনরায় যেন মিনতিভরা নয়নে জননীর নিকট আশ্বাসের প্রার্থনা করলেন।

বিভীষণ পুত্রের এই অস্বাভাবিক আচরণের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলেন না। কিন্তু মাতা সরমা পুত্রের প্রকৃতির সঙ্গে অনেক বেশী পরিচিত।

সরমা তরণীসেনের মনের অবস্থাটি সম্যকভাবে উপলব্ধি কোরে বিভীষণের উদ্দেশে বললেন, 'প্রভু, তরণী নিশ্চয়ই কোন গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, এই আমার ধারণা। হয়তো আপনার সম্মুখে সহজভাবে ব্যক্ত করতে পারছে না।'

বিভীষণের মনেও পুত্রের নির্বাক উপস্থিতিতে এই রকম এক সংশয়ের উদয় হয়েছে। পুত্রকে আশ্বস্ত করতে বিভীষণ উপবিষ্ট পুত্রের মস্তকে হস্ত সঞ্চালন করলেন। মুখে তাঁর নীরব প্রশ্নের অভিব্যক্তি, হৃদয়ে স্নেহের উচ্ছ্বাস।

অপত্যস্নেহ উদ্বেলিত হয়েছে পিতা মাতা দুজনেরই হৃদয়ে। এই প্রাণাধিক বাধ্য পুত্রের ভবিষ্যতের জন্য দুজনেই উদ্বিগ্ন।

রাক্ষসকুলজাত তরণীসেনের রাক্ষসপ্রীতিও যতো, পিতার ইষ্টদেবতা যে বিষ্ণু তাঁর প্রতি ভক্তিও ততোধিক। তরণী রাক্ষসদের আপনজন বলে বিবেচনা করেন, কিন্তু এই অল্প বয়সেই রাক্ষসদের কিছু রীতি ও নীতি ঠিক মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারেন না।

জ্যেষ্ঠতাত রাবণ তরণীর চক্ষে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, যাকে নিজের থেকেই শ্রদ্ধা করতে হয়, সম্মান জানাতে হয়। কিন্তু ভালোবাসার পাত্র তরণীসেনের নিকট তাঁর জনক ও জননী, যাঁদের দেখলেই মনে এক স্নিগ্ধ প্রফুল্লতার ভাব জাগে, যাঁদের মুখের মধ্য থেকে এক অপূর্ব দিব্য জ্যোতি নির্গত হয়, যা হয়তো অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

রাবণ তরণীসেনের নিকট এক বিস্ময়; শৌর্য্য, বীর্য্য, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং জ্ঞানের এক জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। কিন্তু পিতা বিভীষণ সৌম্য, শান্ত, সমাহিত, যার মধ্যে এক সত্যভাষী, সদালাপী, বিনম্র ভক্তকে খুঁজে পাওয়া যায়।

পুত্রের চিন্তান্বিত মুখটি বিভীষণের দৃষ্টি অতিক্রম করে না। পুত্রের হৃদয়ে যদি সংশয় কিছু থাকে, তবে তা পিতামাতাকেই নিরসন করতে হবে।

বিভীষণ পুত্রের সংকোচকে অধিক প্রশ্রয় না দিয়ে সহজভাবে বললেন,—'তরণী,

তুমি পিতামাতার কাছে কোনও সংকোচ কোরো না। তোমার ভয়ের কোন হেতু নেই। বলো, তুমি কি বলতে চাও, অথবা কি জানতে চাও ?'

পিতার স্নেহে ও আন্তরিকতায় তরণীর কোন দিনই সংশয় ছিল না। তরণী ধীরে ধীরে নিজের অবনত বদনটি তুলে জননীর প্রতি আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। জননীর চক্ষে সম্পূর্ণ আশ্বাসের চিহ্ন।

তরণী অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'পিতা, অস্ত্রশালায় অভ্যাস করার সময়ে সকলের চোখে, মুখে এক উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করলাম। আর্যাবর্তের কোশলরাজ্যের নৃপতির নির্বাসিত পুত্র রামের সুন্দরী পত্নীকে অপহরণ কোরে আমাদের লংকাপুরীর অশোকবনে রাখা হয়েছে। আমি আপনার কাছে রামের বীরত্বের অনেক কাহিনী শুনেছি। শুনে, আমার মনে হয়েছে এই রকম বীরত্বের ও মহত্বের অধিকারী কি শুধুই সামান্য মানুষ হতে পারে! পিতা, আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করুন। জ্যেষ্ঠতাতের অনুমোদনেও যদি এই গর্হিত অপহরণ হয়ে থাকে, তবে তা অত্যন্ত অন্যায় ও অসঙ্গত বলেই আমি মনে করি।'

পুত্রের এই কথায় বিভীষণের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। সরমাও স্বামীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় কোরে পুত্রের মুখের প্রতি চক্ষুদুটি নিবদ্ধ করেন। স্বামী কি ভাবে পুত্রের এই সরল ও অকপট প্রশ্নের সমাধান করবেন, সরমা বুঝতে পারেন না।

বিভীষণ ঈষৎ বিব্রত বোধ কোরে শীঘ্রই আত্মস্থ হলেন। অনুভব করলেন পুত্রের যুক্তির কঠোরতা, এবং উপলব্ধি করলেন পুত্রের মনে দ্বন্দ্বের গভীরতা। তরণীসেন কিশোর কুমার, কিন্তু তরণীসেনের বোধশক্তি অতি প্রখর।

বিভীষণ তরণীর স্কন্ধে ডান হাতটি স্থাপন কোরে স্মিত মুখে বললেন, 'তরণী, তুমি এতটুকু বয়সেই অনেক গভীরভাবে চিন্তা করো। পুত্র, তোমার জন্য মনে মনে আমার গর্বের সীমা নেই। তেমনই তোমার জন্য আমার আশংকাও অনেক। তুমি যদি বিষ্ণুর সার্বভৌমত্ব এবং মাহাত্ম্যতে বিশ্বাস করো, তুমি যদি রামের গুণাবলীর মধ্যে এক অলৌকিক মহিমার বিকাশ হয়েছে বলে অনুমান করো, তবে হয়তো এই বিষ্ণু এবং রামের মধ্যে এক ব্যক্তিত্বের অভিন্নতা তোমার সূক্ষ্ম অনুভূতির কাছে ধরা পড়বে। তবে সে সময় এখনও আসে নি, আর সে বয়স এবং অভিজ্ঞতা তোমার হয় নি। বৎস, জ্ঞানীরা আগে থেকে অনেক কিছুই বুঝতে পারে, সুতরাং তাদের সব কাজের বিচার সব সময়ে স্থূল দৃষ্টিতে করা যায় না। আমার উপদেশ এই যে জীবনে যা অন্যায় বলে মানবে, তার সঙ্গে কখনও আপোষ কোরো না। তবে, এ কথাও জেনো যে স্বদেশ এবং স্বজন সব সময়ে নিজের চেয়ে অনেক বড়। আর, জেনে রেখো যে কর্তব্যের কোন বিকল্প নেই।'

বিচক্ষণ তরণীসেন তাঁর সূক্ষ্ম বোধশক্তিতে পূজনীয় পিতার উপদেশের সার তত্ত্বটি মর্মে মর্মে অনুভব করলেন। পিতার জ্ঞানগর্ভ বাক্যে তাঁর বিষ্ণুভক্তি যেমন অটল থাকলো, তেমনই অটুট থাকলো তাঁর দেশপ্রেম, জ্যেষ্ঠ্যতাতের প্রতি অনুরক্তি, রাক্ষসকুলের প্রতি মমত্ববোধ। তবে, যা অন্যায়, তা অন্যায়, যা অনৈতিক তা গর্হিত।

তরণীসেন পিতার অন্তহীন প্রজ্ঞা এবং মাতার অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রসাদে ধন্য। ধীর পদে পালংক ত্যাগ কোরে তরণীসেন প্রথমে পিতাকে এবং পরে মাতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। পুত্রের প্রতি পিতার উপদেশের সারমর্ম সরমা উত্তমরূপেই বুঝেছিলেন।

স্বামী এবং পুত্রের কথপোকথনের পরে সরমার চক্ষুদুটি অশ্রুপূর্ণ। স্বামী ও পুত্র দুজনের গর্বেই সরমার সরল হৃদয় উৎফুল্ল।

পুত্র প্রশান্ত বদনে কক্ষ ত্যাগ করলেন দেখে সরমার মুখে তৃপ্তির হাসি।

*   *   *   *

পুত্র কক্ষ থেকে নির্গত হলে বিভীষণ পুনরায় পালঙ্কের উপর দেহটি বিস্তৃত করলেন। সরমা অসময়ে পতিদেবতার এই আলস্যের ভাব দেখে উদ্বিগ্ন বোধ করলেন।

এই সময়ে তো স্বামী লংকাধিপতির সমীপে রাজকার্য্যের আলোচনায় যোগদান করেন! তবে কি স্বামী আজ অসুস্থ অথবা লংকেশ্বরের প্রতি বিরক্ত। সীতাকে হরণ করে আনার কাহিনী লংকায় আর কারোরই বোধহয় অজানা নেই।

সরমার মনে এক আতঙ্কের শিহরণ! সেই অসহায় নারীকে তার স্বামী ও স্বজনদের নিকট থেকে বলপূর্বক অপহরণ কোরে আনার মতো নিষ্ঠুর এবং অনৈতিক কাজ আর আছে নাকি!

সরমার মন ও প্রাণ সীতাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়। সরমা পুত্রের সম্মুখে কোন প্রকারে মনের ক্ষোভ ও দুঃখ সংবরণ কোরে ছিলেন। কিন্তু উদারচেতা, পরদুঃখকাতর পতির নিকট তাঁর হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারটি উন্মুক্ত হলো।

অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে বিভীষণের বিশাল স্কন্ধে নিজের দুটি কোমল হাত রেখে অনুরাগমিশ্রিত কণ্ঠে সরমা বললেন, 'প্রাণনাথ, কেন রক্ষরাজ এমন অন্যায় কাজ করলেন? অসহায় সীতার ম্লান চক্ষু, শুষ্ক মুখ এবং শীর্ণ দেহলতাটি মনে মনে কল্পনা কোরে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এক অবলা নারীর প্রতি এই অবিচার ও অত্যাচার কখনই আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হোতে পারে না। আপনি কি এর কোন বিহিত করতে পারেন না?'

ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে পতির মুখের প্রতিক্রিয়া নিরীক্ষণ কোরে সরমার নিজের নয়ন-দুটি অশ্রুসজল হলো। পতির ভাবগম্ভীর বিশাল আকৃতিটি সরমার মনে এক বিস্ময় ও ভয়ের সৃষ্টি করলো।

আবেগমণ্ডিত কণ্ঠে সরমা বললেন, 'আপনি কি সীতার মনের ভিতরের দুঃখ ও যন্ত্রণার করুণ আর্ত্তনাদ নিজের মনের মধ্যে শুনতে পাচ্ছেন না? স্বামিন্, এই বন্দিনী নারীর বেদনায় আমার এই পৃথিবীকে বিরস এবং তিক্ত বোধ হচ্ছে। আমি স্বামীর সোহাগ, পুত্রের ভালোবাসা, গৃহের ঐশ্বর্য, সবই লংকায় এসে পেয়েছি। জীবনে কষ্ট কাকে বলে তা বুঝি নি। কিন্তু আজ পরের দুঃখ আমাকে এত উতলা করছে কেন প্রভু?'

—'সরমা, তুমি মহৎপ্রাণা, একদিন তুমি হয়তো মহীয়সী হয়ে উঠবে। পরের দুঃখে যখন তোমার মন কাঁদে, তখন তুমি দেবতার কৃপা লাভের পথে অনেক দূরে এগিয়েছ। কিন্তু শুধু বসে বসে নীরবে চোখের জল ফেললেই তো কারোর ভালো করতে পারবে না!'

—'তবে কি করবো প্রভু, বলে দিন আমাকে। আমি প্রসন্ন মনে সেই কর্তব্য পালন করবো।'

বিভীষণ সরমার চোখে ও মুখে আগ্রহ ও আন্তরিকতার চিহ্ন লক্ষ্য করলেন। সরমার সহৃদয় সহযোগিতা বিভীষণের বিশেষভাবে কাম্য।

রাক্ষসরাজের এই পরনারীহরণের এবং এ ক্ষেত্রে রামের মতো সর্বগুণে বিভূষিত আর্য্যক্ষত্রিয়ের প্রিয়তমা পত্নীকে নির্দয়ভাবে হরণ করার প্রবৃত্তিকে বিভীষণের অমলিন

চিত্ত কোনদিনই সমর্থন করবে না। বিভীষণ আগেই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, কিন্তু রাবণ কর্ণপাত করেন নি।

রাম একাকী জনস্থানে চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে বিনাশ করেছেন। বিভীষণের এই সতর্কবাণীতেও রাবণ কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। বিভীষণের চিন্তায় রাম তো আর সাধারণ মানুষ নন!

রাবণ মদগর্বে উন্মত্ত হয়ে পৈশাচিক আনন্দে এক কুটিল প্রতিহিংসার পন্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিভীষণ এই পদক্ষেপের পরিণামে এক ভীষণ বিপদের সংকেত দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন। বিভীষণ উদ্বিগ্ন হন মনে মনে, তবে কি রাবণের এই পাপ-কাজ স্বেচ্ছাকৃত, যার আভাস তিনি আগেই দিয়েছিলেন!

কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে যা অসঙ্গত ও বর্বরোচিত, বিভীষণকে তা'কে নিশ্চয়ই বাধা প্রদান করবেন। লংকায় সরমাই হবেন তাঁর প্রধান সহায়।

বিভীষণ অর্থপূর্ণ চক্ষে পত্নীর প্রেমবিহ্বল আঁখি দুটি নিরীক্ষণ করলেন। পত্নীকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে ব্যাকুলভাবে বললেন, 'প্রিয়তমে, তুমি ধন্য যেহেতু তুমি পরের মনোবেদনার ভাগ নিতে পারো! কিন্তু দেবী, তুমি কি এই উত্তাল তরঙ্গমালাসেবিত বিশাল সমুদ্রের অপর তীরে অরণ্যবাসের ক্লেশে জীর্ণ এবং প্রিয়তমা ভার্য্যা সীতার বিরহে ক্লিষ্ট রাজপুত্র রামের মনের মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছো? আহা, সেই রাক্ষসত্রাস, মহাবলী, মহৎহৃদয় রাম আজ অযোধ্যার অধীশ্বর না হয়ে বিমাতার ষড়যন্ত্রে পিতার আজ্ঞায় নির্বাসনের কষ্ট ও দুঃখ হাসি মুখে বরণ করে নিয়েছেন! তাঁর এই অপ্রত্যাশিত ও অপ্রাপ্য দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যের কথা ভাবলেও, মনে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগে। অথচ রাম ঘোর সংসারী। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী এবং আত্মীয়স্বজন নিয়েই তিনি অযোধ্যাকে পুণ্যের আলোয় আলোকিত করে ছিলেন। তিনিই আবার আর্যাবর্তকে অবৈদিক ও হিংস্র রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। সরমা, তুমি সেই রাজ-ভিক্ষুক, সর্বত্যাগী, ভ্রাতৃবৎসল, পত্নীপ্রেমী রামের কথা চিন্তা কোরে এক বিন্দু অশ্রু ত্যাগ করো। সীতার দুঃখের জন্য অশ্রু রামের দুঃখের জন্য অশ্রুবিন্দুর সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমার হৃদয়ে সকলের দুঃখ দূর করার এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠুক। সরমা, লংকাপুরীতে সীতাকে রক্ষা করা, সান্ত্বনা দেওয়া, উৎসাহিত করা, ইহজীবনের প্রতি তাঁর তৃষ্ণাকে বাঁচিয়ে রাখা—এই সবই হবে তোমার পবিত্র দায়িত্ব, তোমার নির্দিষ্ট কাজ। সরমা, এই কাজের মধ্যে দিয়ে তুমি এবং আমি, দুজনই ঈশ্বরের অভিলাষ পূর্ণ করবো।'

পতিপ্রাণা সরমা স্বাভাবিক ও সরল বিশ্বাসে বিভীষণের উদ্দীপ্ত আননের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন। পতির দুটি উজ্জ্বল চক্ষু ভেদ কোরে যেন জ্ঞানের এক তীব্র শিখা সরমার দৃষ্টির সম্মুখে ভাস্বর হয়ে ওঠে। সরমা হঠাৎ যেন হতচেতন হয়ে পড়েন।

মুহূর্তের মধ্যে বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে সরমা গভীর আবেগে স্বামীর হাত দুটি জড়িয়ে ধরেন। বিভীষণ পরম প্রীতি ও তৃপ্তির সঙ্গে সরমার মাথাটি নিজের বুকের উপর স্থাপন করেন। স্বামী ও স্ত্রীর এই স্বর্গীয় মিলনের ক্ষণে সরমার চক্ষে আনন্দাশ্রু।

সরমাকে অধিকতর প্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে বিভীষণ মৃদুকণ্ঠে অথচ দৃঢ়ভাবে বললেন, 'সরমা, তুমি দেখে নিও, রাম এসে সীতাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন।

এ' আমার স্থির বিশ্বাস। অবশ্য তার আগেই যাতে রাক্ষসরাজ সসম্মানে সীতাকে রামের হাতে ফিরিয়ে দেন, আমি সেই চেষ্টাই করে যাবো।'

—'প্রভু. প্রার্থনা করি রক্ষরাজ যেন আপনার হিতোপদেশে কর্ণপাত করেন। সীতার দুঃখে তাঁর হৃদয়ও কি বিগলিত হবে না ?'

—'সরমা, রাম রাক্ষসদের শত্রু। রাম আমাদের ভগ্নীর নিগ্রহের কারণ হয়েছেন। রাম জনস্থানে চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে নিধন করেছেন। এর পরেও কি রক্ষরাজ রামকে ক্ষমা করবেন ? সুতরাং রাম ও রাবণের বিরোধ মেটবার নয়। রাক্ষসদের ভাগ্য রাবণের মনের গতি ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে। জানি না, মহারাজ শেষ পর্যন্ত কোন পথ অবলম্বন করবেন। সরমা, এই সৃষ্টির গভীর রহস্য তুমি ও আমি কি বুঝবো ! আর মহাপ্রাজ্ঞ রাবণই বা কি বুঝবেন ! তবে, এ কথা জেনো যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধিত হবেই।'

বিভীষণের বক্ষ থেকে এক দীর্ঘশ্বাস মুক্ত হলো। সরমা উপলব্ধি করলেন যে এইবার স্বামী গাম্ভীর্যের মুখোশের অন্তরালে কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকবেন।

* * * *

মহারাণী মন্দোদরীর হৃদয়ের প্রশান্তি আজ বিলীয়মান। দিনের আহার ও রাত্রের নিদ্রার যে সুখ, তা ক্রমশঃ এক সংশয়ের বিষে বিষময় হয়ে উঠছে। লঙ্কেশ্বর সীতাকে অপহরণ করলেন কেন ? আর তাই যদি করলেন, তবে সীতাকে মন্দোদরীর নিকট রাখলেন না কেন ? কি উদ্দেশ্য মহারাজের !

রাবণের পরস্ত্রীলোলুপতার অপবাদ যে নিতান্তই অপবাদ নয়, তা অপরূপা লঙ্কেশ্বরীর অজানা নয়। ছয় রিপুর প্রথম রিপুটিই যে তাঁর অলোকসামান্য মহাবীর ও মহাপ্রাজ্ঞ পতিকে নূতন ভাবে এই নারীহরণে প্রবৃত্ত করেছে, মন্দোদরী এই কথা চিন্তা কোরে অবসাদগ্রস্ত এবং উদ্বিগ্ন।

অশোকবনে দুঃখিনী সীতার বিষাদময়ী মূর্তিটি চিরদিনের জন্য মন্দোদরীর হৃদয়ের মর্মস্থলে অঙ্কিত হয়েছে। এক অঙ্গে এত রূপ কারোর হয় ! এই অকল্পনীয় সুষমার আধারটিকে কোন দেবতা কোন উদ্দেশ্যে গড়েছিলেন ! কোন পার্থিব জীবের দেহ এমন স্বর্গীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয় ?

মন্দোদরী সমবেদনাপূর্ণ হৃদয়ে সীতার মন্দ ভাগ্যের কথা চিন্তা করেন। তাও তো অপহরণের উৎপীড়নে ও নারীত্বের অপমানে সেই শুভ্রকায়া বরবর্ণিনীর আনন বিবর্ণ, চক্ষে অশ্রুর ধারা, কুসুমকোমল দেহলতা বিশীর্ণ। তবুও এই মানবীর মুখের জ্যোতি, দেহের লাবণ্য, আয়ত চক্ষের শান্ত দৃষ্টি যেন বারবার মন্দোদরীর মনের দর্পণে প্রতিফলিত হয়।

এই মানবী রাক্ষসের মতো রূপ পরিবর্তন করতে অক্ষম, সুতরাং সীতার রূপ মায়াও নয়, মরীচিকাও নয়-শাশ্বত এবং সত্য। মন্দোদরী নিশ্চিত যে ঐ মানবী সামান্যা নয়। লঙ্কেশ্বরের নির্বাচনের জন্য প্রশংসা করতে হয়! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক অজ্ঞাত আশঙ্কার রেশ মন্দোদরীর উদার হৃদয়ের এক প্রান্তে উদয় হয়।

মন্দোদরী এই অপহরণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। কিন্তু মন্দোদরী কখনই নির্বাসিত রাজপুত্র রামের প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে এমন রূপবতী বলে কল্পনাও করেন নি।

তাঁর নিজের অসামান্য রূপলাবণ্যের সম্বন্ধে মন্দোদরীর মনে হয়তো একটু গর্ব ছিল। তিনি উত্তমরূপেই জানেন যে রাবণ তাঁর প্রধানা মহিষীকে অসাধারণ সৌন্দর্য এবং অশেষ গুণরাশির জন্য হৃদয়ের মধ্যে এক অতি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এক কথায়, মন্দোদরী রক্ষরাজের হৃদয়েশ্বরী, কারণ রক্ষরাজ তাঁর হৃদয় আর কোন রমণীকেই দান করেন নি। মন্দোদরী অনুভব করেন যে বিষ্ণুভক্ত, সাত্ত্বিক-প্রবৃত্তিসম্পন্ন বিভীষণও তাঁর রূপ ও গুণের প্রতি আকৃষ্ট।

মন্দোদরীর হৃদয়ে সহসা সীতার চিন্তা পুনরায় উদয় হয়। দেবভোগ্যা, সৌন্দর্যের প্রতিমা সীতাকে তাঁর স্বামী সাধারণ রাক্ষস সহচরীদের তত্ত্বাবধানে অশোকবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন কেন!

আহা, এই নির্যাতিত রাজবধূরে কত না লাঞ্ছনা এই ক্রুদ্ধপ্রকৃতি এবং কুৎসিতদর্শনা রাক্ষসীদের হাতে হচ্ছে! তবে কি রাজপ্রাসাদের কামনাবিদ্ধ পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র অশোকবনের উদার প্রকৃতির মধ্যে সীতাকে রাখবার এক বিশেষ তাৎপর্য আছে?

* * * *

লঙ্কেশ্বর রাজসভায় দৈনন্দিন কর্তব্য পালনের পরে লঙ্কাপুরীর রাজকীয় সৌধের চূড়ায় বিশ্রামকক্ষে উপস্থিত হয়েছেন। দূরে মহাসমুদ্রের সুনীল জলরাশি অশান্ত হিল্লোলে উপকূলের বালুকাপ্রান্তর স্পর্শ করার আগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ ফেনপুঞ্জ সৃষ্টি করছে। লঙ্কেশ্বর উদাস দৃষ্টি প্রসারিত কোরে দেখেছিলেন যে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গগুলি ভেঙ্গে গিয়ে বেলাভূমির তটে পেঁাছে পুনরায় সেই অগাধ জলধির মধ্যেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণের যে মূল উদ্দেশ্য, তা পূর্ণ হবে কিনা কে জানে! কে জানে এই গর্জনমুখরিত মহাসিন্ধুর মতোই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ঊর্মিমালাকে পুনরায় নিজের দিকে আকর্ষণ কোরে, মহাকাল রাবণের দুষ্কর্মের অবাধ গতির উপর শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির চরম প্রতিশোধ সংঘটিত করাবে কিনা!

রাক্ষসরাজের মনের চাঞ্চল্যকে আপন অনুভূতির দ্বারা আত্মভূত করলেন রাণী মন্দোদরী। মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়ে নিজের অলঙ্কারমণ্ডিত শুভ্র ভুজদুটি স্বামীর প্রতি প্রসারিত করলেন। মুখে তাঁর এক সহানুভূতিপূর্ণ হাসির রেখা।

মন্দোদরী নিজের মনের সংশয় ও উদ্বেগ গোপন কোরে মৃদুস্বরে বললেন, 'প্রভু! আপনার রাজকার্য এখনকার মতো শেষ হয়েছে তো? আমি পরিচারিকাকে শীতল পানীয় আনতে বলেছি। আপনি পান কোরে শান্ত হোন।'

রাবণ লক্ষ্য করলেন যে রাণীর চক্ষে ও মুখে প্রেমপূর্ণ আন্তরিকতার চিহ্ন। রাবণ গভীর অনুরাগের দৃষ্টিতে প্রিয়তমা পত্নীর করপল্লব ধারণ করলেন। মন্দোদরী অগ্রসর হয়ে রাবণের বিশাল বক্ষের উপর নিজের মস্তকটি স্থাপন কোরে নীরবে অপেক্ষা করলেন। রক্ষকুলপতি প্রিয়তমা পত্নীর এই নির্বাক প্রেমস্পর্শের সুখকর প্রভাবে পরিতৃপ্ত হয়ে ক্ষণিকের জন্য নয়নদুটি নিমীলিত করলেন।

অল্পক্ষণ পরে রাবণ তাঁর দৃষ্টিকে রাণীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উপর নিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মন্দোদরী সলজ্জ হাস্যে চক্ষুদুটি অবনত করলেন।

রাবণ মন্দোদরীর অতুলনীয় মুখচ্ছবি দর্শনে মোহিত হয়ে প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, 'রাণী, তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র ইন্দ্রজিৎ যে সাবালক হয়ে উঠেছে, এ'কথা কিন্তু তোমার মুখের দিকে তাকালে আমার মনেই থাকে না। কিন্তু দেবী, হঠাৎ তোমার

মুখে চিন্তার রেখা এসে পড়লো কেন ? মনে হচ্ছে, কিছু বলার জন্য যেন তোমার প্রাণ আকুলি বিকুলি করছে। কি বলবে, বলো না, ভয় কিসের ?'

—'ভয় নয় প্রভু ! আপনি রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ, রাক্ষসদের রাজা। তাদের অবিসংবাদিত নেতা আপনি। তাদের ভালো মন্দ আপনার উপরই নির্ভর করছে। তাই, আমার মাঝে মাঝে আশংকা হয়, যে যদি আপনার আচরিত শ্রেষ্ঠ রাক্ষস আদর্শও শেষ পর্যন্ত কোন বিপর্যয় ডেকে আনে ! তবে, আমরাও হয়তো সেই বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাবো না।'

—'রাণী, তা হলে আমারও পরিত্রাণ নেই, এ কথা ভুলে যাচ্ছ কেন। তবে, এ কথাও জেনো যে আমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, এবং পাতালবিজয়ী, রাবণ। আমার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হলে, কেউই প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে না। সে দেবতা হলেও না।'

—'কিন্তু সে যদি মানব হয়, প্রভু, এবং এবং এমন এক অসামান্য মানব হয় যার সামনে হাজার হাজার বিপক্ষ বীর অল্প সময়ের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায় !'

—'মন্দোদরী, তুমি কি এই বন্দিনী সীতার পতি নির্বাসিত রাজপুত্র রামের কথা বলছো ! হাঃ হাঃ হাঃ ! ভিক্ষুক রাম এই বিশাল সমুদ্র পেরিয়ে লংকাপুরীর এই সুদৃঢ় রক্ষণব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত কোরে আমাক পরাজিত করবে ! রাণী, সত্যই কি তুমি আমাকে এত অপদার্থ মনে করলে !'

মন্দোদরী স্বামীর গর্বোৎফুল্ল মুখমণ্ডলে আত্মপ্রত্যয়ের জ্বলন্ত বিকাশ দেখে মনে মনে লজ্জিত হন। তথাপি বিভীষণের সতর্কবাণীকে স্মরণ কোরে কোমল কণ্ঠে বলেন, 'মহারাজ, জনস্থানে রাক্ষসদের বধ করবার জন্য রামকে সমুচিত শিক্ষা দিতে কি রামের পত্নী সীতাকে হরণ করা একান্তই আবশ্যক ছিল ? প্রভু, অপরাধ নেবেন না। পরনারীকে হরণ করা তো মহাপাপ বলেই জানি। তা ছাড়া, সীতাকে দেখা অবধি আমার মনে হয়েছে যে এই মানবী সামান্যা নারী নয়। আমার মন বলছে, এই নারী থেকে লংকার এবং রাক্ষসদের সমূহ ক্ষতি হবে !'

মন্দোদরীর শঙ্কিত বাক্যে কৌতুক অনুভব কোরে রাবণ প্রথমে তীক্ষ্ন কণ্ঠে হাস্য করলেন। রাবণের নিদারুণ অট্টহাসিতে বিশ্রামকক্ষটি শব্দময় হয়ে উঠলো।

রাণীর মনে হলো যেন রাক্ষসরাজের উত্তেজিত মুখমণ্ডল আরও নীলবর্ণ ধারণ কোরে আকাশ এবং সমুদ্রের নীলিমার মতো বিস্তারিত এবং সীমাহীন হয়ে উঠলো। এই বিরাট পুরুষ যেন তাঁর অতি ভয়ংকর রূপ নিয়ে মন্দোদরীর বিক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে ভয়শূন্যতার এক প্রগাঢ় আশ্বাস প্রদান করছে। এক বিশাল সত্তার অপরাজেয়তা যেন রাক্ষসরাজের এই দর্পিত ও আত্মবাদী আস্ফালনের মধ্যে মূর্ত হয়ে প্রকোষ্ঠের চার কোণ থেকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—হাঃ হাঃ হাঃ।

—'মন্দোদরী, কোনটা পাপ আর কোনটা পুণ্য তা রাক্ষস রাবণ ভালো করেই জানে। তুমি এত অল্পতেই ভয় পাচ্ছ কেন, প্রিয়তমে ? কিছু ভেবো না তুমি। সীতাকে আমি এক মাসের মধ্যেই অংকশায়িনী করবো। লঙ্কায় আমার ঐশ্বর্য্য, প্রভাব ও প্রতিপত্তি দেখে সীতা নিশ্চয়ই অল্পদিনের মধ্যে তার দীন, হীন ও অক্ষম পতিদেবতার চিন্তা ত্যাগ কোরে, আমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে।'

তার পরে ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে মন্দোদরীর প্রতি এক লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে আশ্বাসপূর্ণ কণ্ঠে রাবণ বললেন, 'তবে, মনে কোরো না যে লংকেশ্বরের হৃদয়ের অন্তঃপুরে সীতা মন্দোদরীর স্থান কোন দিনও অধিকার করবে।'

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসরাজ রাণীকে সপ্রেম আলিঙ্গন করলেন। মন্দোদরীর বক্ষলগ্ন মাথাটিতে হস্ত সঞ্চালন করতে করতে উদ্ধত কণ্ঠে বললেন, রাবণ, 'মন্দোদরী, আমি রাক্ষসরাজ রাবণ। ত্রিভুবন আমার বাহুবলের শক্তিতে কম্পিত। দেবতারা পর্য্যন্ত আমার ভয়ে ভীত। আমি কিসের ভয় করি! আমি জানি না, আমার নিয়তি কি। তবে তোমার বীর পতির পরিণতি যাই হোক না কেন, সে শেষ পর্যন্ত বীরত্বের পরিচয়ই দিয়ে যাবে।'

মন্দোদরীর মুখে এক অপূর্ব স্নিগ্ধতা। মন্দোদরী শেষ চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রেমপূর্ণ আঁখি দুটি রাবণের উজ্জ্বল নয়ন দুটিতে নিবদ্ধ কোরে মধুর কণ্ঠে বললেন, 'প্রভু, আমি জানি আপনি সামান্য নন্। আপনার বজ্রের মতো কঠিন দেহ কেউই স্পর্শ করতে পারে না। তার উপর ইন্দ্রজিৎ আপনার সহায়। তথাপি, এই অসহায়া সীতাকে কি রামের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারেন না? আহা, সীতার মনের ক্ষোভ ও দুঃখ, তার মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়!

রাবণ রাক্ষসরাজ্ঞীর এই অনুকম্পার ভাবে বিস্মিত হন না। কিন্তু রাবণের মনের কোণে নেই কোন অনুতাপ, কোন দুঃখবোধ। রাবণ তাঁর শত্রু রামকে সারা জীবনের মতো শিক্ষা দিতে চান। আর মনে মনে আশা করেন সীতার দেহ, যা তাঁকে পেতেই হবে যে কোন মূল্যে। সীতাকে প্রত্যর্পণ করার চিন্তা বাতুলতা। বিভীষণ অথবা মন্দোদরী রাক্ষসকুলের সব নয়। রাবণ উত্তমরূপেই অবগত আছেন যে তাঁর মুখ্য-মন্ত্রীরা এবং সভাসদেরা রামকে শাস্তি প্রদানের জন্য এই অভিনব পন্থাটি অনুমোদন করেছে। সুতরাং রাক্ষসদের ইচ্ছাই রাবণের ইচ্ছা। দেখা থাক না কতদূর কি হয়!

রাবণ মন্দোদরীর বেদনাবিজড়িত অনুপম দেহশ্রীতে অভিভূত হয়ে মন্দোদরীর ওষ্ঠে এক নিবিড় চুম্বন অঙ্কিত করেন। রাবণের প্রেমের অভিব্যক্তিতে শিহরিত হয়ে পরম পরিতৃপ্তিতে মন্দোদরী চক্ষু দুটি নিমীলিত করেন। রাবণের বিশাল বক্ষপুট যেন পক্ষী-শাবকের মতোই মন্দোদরীর এক নিরাপদ আশ্রয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মণের অনুপ্রেরণায় রাম তাঁর শোক এবং মানসিক নিষ্ক্রিয়তা বর্জন করে সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন। প্রথমে পশ্চিমে কিছুদূরে অগ্রসর হয়ে তাঁরা এক নিবিড় অরণ্যের মধ্যে উপস্থিত হলেন। বহু প্রাচীন বৃক্ষে সমাকীর্ণ অন্ধকারময় এই অরণ্য হিংস্র পশুদের বিচরণভূমি। এই অরণ্য ত্যাগ কোরে তাঁরা পুনরায় দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন।

দক্ষিণে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত, কয়েকটি স্রোতহীন নদী এবং বিশাল বনভূমি। জনস্থান ত্যাগ কোরে তাঁরা ক্রৌঞ্চারণ্যে এসেছেন। এখানে এক করালবদনা, বিকটদশনা রাক্ষসী তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে লক্ষ্মণকে পতিরূপে কামনা করলো। রাক্ষসী লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলে, লক্ষ্মণ তাঁকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করতে কার্পণ্য করলেন না।

ইতিমধ্যে বনভূমি কম্পিত করে এক মুণ্ডগ্রীবাহীন রাক্ষস ঝড়ের বেগে রাম ও লক্ষ্মণকে আক্রমণ করলো। এই রাক্ষসের মুখটি তার বিরাট দেহের উদরে নিবিষ্ট এবং তার জ্বলন্ত চক্ষু দুটি থেকে যেন আগুনের শিখা নির্গত হচ্ছে।

রাম মধুর স্বরে লক্ষ্মণকে আশ্বাস দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। দুই ভ্রাতার মিলিত আঘাতে রাক্ষস তার দুটি বাহুই হারালো। রামের বাণে জর্জরিত হয়ে মৃত্যুর আগে রাক্ষস জানালো যে সে শাপভ্রষ্ট এক দানব পুত্র এবং রামের হাতে মৃত্যুর মধ্যেই তার মুক্তির উপায় নিহিত ছিল।

প্রথমে পশ্চিমে এবং পুনরায় দক্ষিণ দিকে চলেছেন তাঁরা। পথে বহু পর্বত পুষ্পিত কানন, স্বচ্ছজলপূর্ণ তটিনী। এইভাবে কয়েকদিনের পথ অতিক্রম কোরে এবং অতি সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ফলমূলাদিতে ক্ষুধা এবং নির্মল সলিলে তৃষ্ণা নিবারণ কোরে, রাম ও লক্ষ্মণ সেই রাক্ষস-নির্দিষ্ট সুবিখ্যাত পম্পা সরোবরে পেঁাছালেন। এই পম্পার তীর পর্যন্ত কোশল নৃপতিদের রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল।

চারদিকে পক্ষীগুঞ্জন মুখরিত সুদৃশ্য বৃক্ষশ্রেণী সেই সরোবরের স্বচ্ছ নীরে প্রতিফলিত হচ্ছে। উচ্চ-বৃক্ষ-সমন্বিত সেই ঘন বনকে দূর থেকে পর্বতশ্রেণী বলে ভ্রম হয়। পম্পার এই নৈসর্গিক শোভায় রামের মনে এক অভূতপূর্ব পুলকের হিল্লোল। পারিপার্শ্বিক মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী ক্ষণিকের জন্যও পত্নীবৎসল এবং ভ্রাতৃবৎসল রামকে অভিভূত কোরে, রামের ক্ষতবিক্ষত অন্তঃকরণে সান্ত্বনার প্রলেপ দান করে।

কিন্তু পর মুহূর্তেই প্রিয়তমা ভার্য্যার অন্যের কবলিত হওয়ার দুঃখ রামের মনকে ভার ক্রান্ত করে। কিছুক্ষণ আগেও পম্পা সরোবরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অযোধ্যায় ভ্রাতা ভরতের স্বেচ্ছাকৃত কৃচ্ছ্রসাধন ও মহৎ আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে হৃদয়ে এক পবিত্র কৃতজ্ঞতার সঞ্চার করছিল। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনের গতিতে আসে পরিবর্তনের স্রোত।

হায়, সীতাকে রাবণ কোথায় নিয়ে গেল! সেই দুরাত্মা পরস্ত্রী-অপহরণকারী দস্যু কি আর এতদিন সীতাকে জীবিত রেখেছে! তাঁদের পঞ্চবটীর সুখের নীড় ভেঙ্গে যাওয়ার দুঃখ রামের হৃদয়ে আর একবার বজ্রের আঘাতের মতো নিদারুণ বলে মনে হয়।

সীতার বিরহে রামের মনের জ্বালা দুরন্ত প্লাবনের মতো যেন রামের সমস্ত সত্তাকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অযোধ্যায় পিতার ও মাতার স্নেহের দ্বারা সুরক্ষিত, প্রজাবৃন্দের প্রশংসায় মুখরিত সুখের দিনগুলির স্বপ্নময় স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে মানসপটে উদিত হয়। ভ্রাতাদের সঙ্গে একসঙ্গে আহার, বিহার, অস্ত্রশিক্ষা ও অধ্যয়নের অবিস্মরণীয় চিত্রগুলি হৃদয়-মুকুরে একে একে দৃশ্যমান হয়।

চৌদ্দ বৎসরের বনবাস তো রাম নিজেই মাথা পেতে গ্রহণ করেছিলেন। লক্ষ্মণ, ইন্দ্রিয়াসক্ত দুর্বলচিত্ত পিতার বিমাতা কৈকেয়ীর প্রতি অসঙ্গত পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বললে, রাম সম্মত হন নি।

তাই রাম শোকবিদ্ধ হৃদয়ে চিন্তা করেন যে কে এই জীবনের চরম পরীক্ষার পথ প্রশস্ত করে দিল, অপ্রাপ্য শাস্তির বোঝা মাথার উপর চাপিয়ে দিল! সহৃদয় ও স্নেহময় পিতার উপর মুহূর্তের জন্যও অভিমান হয় না। ভরতের বিরুদ্ধে ক্ষণিকের জন্যও মনের উপর বিদ্বেষের কোন ছায়া পড়ে না।

পূতচরিত্র স্বার্থশূন্য ভরতের কি অপরাধ! সে তো পিতার ইচ্ছায় তার মাতামহের নিরাপদ আশ্রয়েই বর্ধিত হচ্ছিল। বস্তুতঃ অযোধ্যায় ভরতের সঙ্গ রাম অতি অল্পই

লাভ করেছেন। কৈকেয়ীর পুত্রবিরহের শূন্যতাকে রামের উপস্থিতিই মধুরভাবে পূর্ণ করেছে। কৌশল্যা অপেক্ষা কৈকেয়ীকে রাম কম ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন নি।

তবে কি জন্য রামের জীবনে নেমে এলো এই নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা! রাম আজ হৃত-সর্বস্ব, স্বদেশচ্যুত, রিক্ত। পরিশ্রান্ত রাম পম্পা সরোবরের তীরে বিশ্রামের অবকাশে যতোই চিন্তা করেন তাঁর এই দুর্ভাগ্যের কথা, ততোই তাঁর হৃদয়ে আগের আনন্দের স্মৃতি ম্লান হয়ে আসে।

রামের বৈরাগ্যপূর্ণ নির্মল চিত্তে ভাগ্যের নির্মমতা ও প্রতিকূলতার কথাই বার বার উদয় হয়। এই তেরো বৎসর প্রকৃতির লীলাভূমিতে বিচরণ করে রামের হৃদয়ে উদ্ভূত হয়েছিল প্রকৃতির প্রতি এক গভীর একাত্মতা। এই শান্ত নির্জন কলকোলাহলহীন পরিবেশে তিনি যেন নিজের আলয়ে বিশ্রামের সুখ অনুভব করেছেন, সীতার সঙ্গে প্রেমের নিবিড় বন্ধনের মধ্যে বন থেকে বনান্তরে বিচরণ করেছেন।

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, কই পাশে তো জীবনসঙ্গিনী মৈথিলী নেই। হায়, রাক্ষসদের নির্দয় ও হিংস্র প্রবৃত্তির যূপকাষ্ঠে, ঐশ্বর্যময়ী প্রকৃতির মর্মস্থলে রচিত তাঁদের সুখের আবাস, ক্ষণিকের বিভ্রমের জন্য চিরতরে বিধ্বস্ত হয়ে গেল!

রাম তো দণ্ডকারণ্যে আসার আগে রাবণের নামও তেমন শোনেন নি। কি জন্য রাক্ষস রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল! কি তার অভিপ্রায়?

রামের অস্থির চিত্তে বিক্ষিপ্ত চিন্তার আক্রমণ। নির্বাসিত জীবন শুরু হবার আগেই রামের সঙ্গে রাক্ষসদের সংঘর্ষের সূচনা হয়েছে। জীবনের প্রায় উষাকাল থেকেই তাঁকে রাক্ষসদের নিধনে নিযুক্ত হতে হয়েছে। আর্যাবর্তের পূর্বভাগের এক বিরাট অঞ্চলকে তাঁরা রাক্ষসদের যজ্ঞ-ধ্বংসের তাণ্ডব ও অন্যান্য অত্যাচার থেকে মুক্ত করেছিলেন।

বনে নির্বাসিত হয়েও নিস্তার নেই। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ দিকে নূতন আর্য উপনিবেশগুলির রক্ষার দায়িত্ব স্বতঃই রামের উপর পড়েছিল। অগস্ত্য মুনি রামকে অনার্যদের সুসংস্কৃত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেবার উপদেশ দিলেন।

রামের চিন্তাস্রোত ক্ষণিক ব্যাহত হলো। ভ্রাতা লক্ষণ গেছেন ঋষ্যমূক পর্বতের দিক নির্ণয়ে। কিন্তু তার বিলম্ব হচ্ছে কেন! কবন্ধ রাক্ষসের কথা মতো সেইখানেই সাক্ষাৎ হবে কিষ্কিন্ধ্যার বানররাজ বালির বিতাড়িত ভ্রাতা সুগ্রীবের সঙ্গে। তারাই নাকি সন্ধান দিতে পারবে যে কোন পথে গেছে সীতার অপহরণকারী।

পুনরায় রাক্ষসদের চিন্তাই রামের মনকে অধিকার করে। রাক্ষসেরা দণ্ডকারণ্যের পাশে জনস্থানে বেশ প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল। তাদের নিবীর্য করা, এমন কি ধ্বংস করা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শূর্পনখা বলেছিল বটে যে সে লংকার রাক্ষসরাজ রাবণের ভগ্নী।

'মনে পড়েছে এতক্ষণে', রাম নিজের মনেই বলে উঠলেন। রাম যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে বলে যেতে লাগলেন,—'কোথায় এই লংকা! লংকা কি আরও দক্ষিণে? লংকার নাম তো কোনদিন শুনি নি। আরও দক্ষিণে গেলে তো সমুদ্রই পড়বে মনে হচ্ছে। দেখি, লক্ষ্মণ ঋষ্যমূক পর্বতের কোন খোঁজ পেলো কিনা।'

রাম আপন চিন্তায় বিভোর ছিলেন। লক্ষ্য করেন নি, কখন লক্ষ্মণ এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন।

লক্ষ্মণ উপলব্ধি করলেন যে রাম এতক্ষণ একাকী অতি গভীর মানসিক যোগাভ্যাসে লিপ্ত ছিলেন। তার ফলেই রামের মুখ থেকে এই স্বগতোক্তি নির্গত হয়েছে।

লক্ষ্মণ নিজের উপস্থিতিকে জানাবার জন্য জ্যেষ্ঠের হাত স্পর্শ করে বললেন, 'ঋষ্যমূক পর্বতে পেঁছাতে আমাদের আর অধিক বিলম্ব হবে না। একটু পূবে অগ্রসর হলেই কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের সীমানায় এই পর্বত। আমরা আগামী কালই গন্তব্য স্থলে গিয়ে উপস্থিত হবো।'

লক্ষ্মণের কথায় রাম উৎফুল্ল বোধ করলেন। লক্ষ্মণের হাত দুটি সস্নেহে ধারণ করে বললেন, 'ভাই, সীতাকে হারিয়েছি, তার জন্য মনের মধ্যে দুঃখের সাগরের সৃষ্টি হয়েছে। এখন তুমি আমার পাশে আছো, ছায়ার মতো অনুসরণ করছো। তাই, আমার একমাত্র ভরসা যে সেই দুঃখের সাগর আমি শৌর্য ও বীর্যের দ্বারা অতিক্রম করবো। লক্ষ্মণ, তোমার মতো ভাই কি কারোর হয়!'

রামের এই হৃদয়মথিত প্রশস্তিতে লক্ষ্মণের কর্ণমূল লজ্জায় আরক্ত হলো। লক্ষ্মণের দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহ, বিশাল বক্ষ, বলশালী ভুজ দুটি, আয়ত আঁখি দুটি যেন জ্যেষ্ঠের স্নেহভারে নমনীয় হয়ে জ্যেষ্ঠের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হতে চাইছে।

লক্ষ্মণের মনের ভাবের সঙ্গে তাঁর মুখের পরিবর্তনটি লক্ষ্য করে রামের দেহও উত্তেজনায় ঈষৎ স্পন্দিত হয়। রামের দুই বিস্তৃত নয়নের স্বর্গীয় দৃষ্টি যেন ক্ষণিকের জন্য লক্ষ্মণকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। লক্ষ্মণের বিমূঢ় ও শূন্য দৃষ্টি রামের হৃদয়ে স্নেহের প্রস্রবণকে উদ্বেলিত করে। আর মুহূর্তের বিলম্ব না কোরে রাম লক্ষ্মণের বীর তনুটিকে আলিঙ্গনে আবন্ধ করেন।

রামের মুখে নির্বাক বিস্ময়, চোখে আনন্দের অশ্রু। এই অন্ধকারময় ভাগ্যাকাশে লক্ষ্মণই ধ্রুবতারা!

লক্ষ্মণ একটু বিব্রত বোধ করেন, জ্যেষ্ঠের আবেগের আতিশয্য দেখে। ভাবপ্রবণ-তার বিলাসে ভাসমান হওয়ার উপযুক্ত ক্ষণ এখন নয়। এখন কাজের সময়। লক্ষ্মণ মনে করেন যে তিনি নিজে আবেগচঞ্চল হলে জ্যেষ্ঠ রাম প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ভার্যার বিরহে আরও কাতর হবেন। তাঁদের সীতাকে উদ্ধারের প্রচেষ্টায় বিলম্ব হবে।

কিন্তু লক্ষ্মণের চিন্তা যথার্থ ও সুনিয়ন্ত্রিত হলেও, স্থিতপ্রজ্ঞ রামের নিকট ভাবপ্রবণতার স্থায়িত্ব ছিল ক্ষণিকের। রাম উত্তমরূপেই নিজের সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং ঠিক প্রয়োজনীয় মুহূর্তে রাম তাঁর কর্তব্য নিরূপণ করবেন।

লক্ষ্মণকে হঠাৎ প্রশ্ন করেন রাম, 'ভাই লক্ষ্মণ, এই দুষ্ট ও অনার্যস্বভাব দস্যু রাবণ কি উদ্দেশ্যে আমার শত্রুতা করছে, তুমি বলতে পারো?'

এই আকস্মিক প্রশ্নে লক্ষ্মণ বিস্মিত হলেন না। তিনি মায়ামৃগের মরিচীকা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন। তিনি রাম ও সীতাকে সতর্ক করতেও দ্বিধা করেন নি।

সুতরাং লক্ষ্মণ সহজভাবেই বললেন, 'আপনি পুরুষশ্রেষ্ঠ। আপনি নিজেই বিচার ও বিবেচনা করে দেখতে পারেন যে এই দস্যু রাবণের অভিপ্রায় কি। আপনাকে আমি বলে দিলে তবে আপনি বুঝবেন!'

লক্ষ্মণের তির্যক ভাষণে রাম সচকিত হলেন। সত্যই তো, রাবণ যে রাক্ষস-নিধনের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সীতাকে অপহরণ করতে পারে, এ'কথা তো তাঁর মনে হয় নি। রাবণ এই রাক্ষসদের নায়ক। রাক্ষসদেরই বিভিন্ন গোষ্ঠী আর্যাবর্ত থেকে বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণাপথের অরণ্যদেশে স্থানে স্থানে তাদের সুদৃঢ় আবাসভূমি রচনা করেছে।

রাম মনে মনে বিবেচনা করলেন যে তিনি নিজে ইতিমধ্যে জনস্থানে রাক্ষসদের

দর্পকে চূর্ণবিচূর্ণ করে রাক্ষসদের সমূলে বিনাশ করেছেন। লংকাধীপ ও রাক্ষসপতি রাবণ এখন তাঁর শত্রু। সুতরাং এই রাক্ষসাধিপতি রাবণের নিবাস লংকাপুরী কোথায়, তা তাঁদের আবিষ্কার করতে হবে।

রাম লক্ষ্মণকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'লক্ষ্মণ, আমি আমাদের বিপদের গভীরতা সম্যকভাবেই বুঝতে পেরেছি। ভাই, মাঝে মাঝেই সীতাকে অদর্শনজনিত ক্ষোভ ও দুঃখ আমার মনকে জর্জরিত করছে। কিন্তু জেনে রেখো, সীতার অপহরণকারী তার এই গর্হিত কাজের জন্য আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। লক্ষ্মণ, তুমি আমার পাশে থাকলে, আমার শক্তি দ্বিগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু ভাই, একটি সংশয় আমার মনে উদয় হচ্ছে। দক্ষিণ দিকে যতোই অগ্রসর হচ্ছি, ততোই নানা রকমের জীব চোখে পড়ছে। এরা তো মানুষ বলে মনেই হয় না। এরা নিঃসন্দেহে এখানকার আদিম অধিবাসী এবং অনার্য। রাক্ষসদের রীতি, নীতি, সংস্কার প্রভৃতির সম্পূর্ণ পরিচয় পাই নি। এখন আবার বানরদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে! এরাও তো অনার্য। এরা রাক্ষসদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করবে তো?'

—'দেখাই যাক না, সুগ্রীব কি বলেন এবং আমাদের কেমনভাবে গ্রহণ করেন। আপনি আমার পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ। আপনার মতো স্থিতধী এবং জ্ঞানী কে আছেন? আপনাকে আমি কি পরামর্শ দেবো? তবে, আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন যে এই জগতে একমাত্র কিছুর বিনিময়েই সকলে কিছু উপকার করে। তেমনই আপনাকেও সুগ্রীবের বিশেষ উপকার করেই, তার কাছ থেকে অনুগ্রহ বা সাহায্য নিতে হবে। এতে আপনার কুণ্ঠিত হলে চলবে না।'

—'তুমি ঠিক বলেছ লক্ষ্মণ। এই ভাবেই মৈথিলীর উদ্ধারে আমাদের বুদ্ধি ও বল নিয়োগ করতে হবে। এসো ভাই, এখন কিছু ফলমূল খেয়ে নিয়ে আজ রাত্রির মতো কোন বৃক্ষের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করি। কাল প্রাতেই যাত্রা করা যাবে।'

লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের ইঙ্গিত লাভ করে ধনুক ও তীক্ষ্ণ তীর হাতে নিয়ে রাত্রের পাহারার জন্য প্রস্তুত হলেন।

* * * *

পরদিন অভীষ্ট পথে অগ্রসর হবার সময়ে স্থানে স্থানে প্রকৃতির ঐশ্বর্যসম্ভারে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে রাম বার বার জানকীর অভাব অনুভব করে দুঃখ প্রকাশ করলেন। লক্ষ্মণ রামের প্রকৃতির সঙ্গে উত্তমরূপেই পরিচিত। লক্ষ্মণের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে অজানা দস্যুর হাতে সীতার নিগ্রহ ও অত্যাচারের অশুভ সম্ভাবনাই রামের মনকে পীড়ন করছে।

রামের হৃদয়ে প্রকৃতপক্ষে নানা প্রকার উদ্বেগের আবির্ভাব হয়েছে। সীতাকে উদ্ধার করতে না পারলে, রাম তাঁর জননীকে এবং অযোধ্যাবাসীদেরই বা কি বলবেন। কোশলরাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর্য ক্ষত্রিয় নরপতির পুত্র, অলৌকিক বীরত্বের অধিকারী রাম অসভ্য বর্বর রাক্ষসদের হাত থেকে নিজের ধর্মপত্নীকে রক্ষা করতে পারে নি, সকলে এই কথাই ভাববে!

এই অনপনেয় কলংকের বোঝা মাথায় নিয়ে তিনি কেমনভাবে স্বদেশে স্বজনদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন! চৌদ্দ বৎসর বনবাসের পরে তাঁর অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করার নৈতিক যোগ্যতাও সকলের সংশয়ের বস্তু হবে।

রামের চেয়ে কে বেশী জানে যে নির্লোভ ভরত কোন সময়েই রাজ্যপদ গ্রহণে আগ্রহ

প্রকাশ করে নি। চৌদ্দ বৎসর অতিক্রান্ত হলে, ভরত রামের প্রতিনিধিত্ব ত্যাগ করে রামের হাতে রাজ্যের ভার অর্পণ করতে অগ্রণী হবে। কিন্তু রাম পিতৃসত্য পালন করলেও সীতার অভাবে নিজেকে ধর্মসঙ্গতভাবে অযোধ্যার সিংহাসনে বসার উপযুক্ত বলে বিবেচনা করবেন না। সীতাকে উদ্ধার করতে না পারলে, রাম কখনও নিজেকে ক্ষমা করবেন না।

একের পর এক চিন্তা এসে মনকে এক আবর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে। ভ্রাতাদের সম্বন্ধে রাম নিঃসংশয়। কোনদিনও রামের জীবদ্দশায় তাঁরা কেউই কোশলরাজ্যের রাজপদ অলংকৃত করার স্বপ্নও দেখবেন না। তবে তাঁর প্রিয় জন্মভূমির, স্বদেশবাসীর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের ভবিষ্যৎ কি? দেশের কৃষিকার্যের উন্নতির ভবিষ্যৎ কি? যজ্ঞনাশকারী ব্রাহ্মণ্যবিরোধী হিংস্র অনার্যদের বিপক্ষে দক্ষিণাপথের আর্য উপনিবেশ-গুলিরই বা ভবিষ্যৎ কি!

দক্ষিণাপথ কি অবৈদিক রাক্ষস ও বানরদের আত্মসর্বস্ব লোলুপতা এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগের নরকভূমি হয়ে থাকবে! এখানে কি কৃষি, শিল্প, ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ—কিছুই প্রতিষ্ঠিত হবে না!

এক দীর্ঘ নিশ্বাস মুক্তি লাভ করে রামের বক্ষ থেকে।

লক্ষ্মণ রামের দীর্ঘশ্বাস মোচনের শব্দে সচকিত হয়ে বললেন, 'প্রভু, আপনি বার বার নিজেকে নৈরাশ্যের হাতে সমর্পণ করছেন কেন? আমরা এই বানরদের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, নিজেদের উদ্যমের সাহায্যে নিশ্চয়ই বৈদেহীকে আবার ফিরিয়ে আনবো।'

লক্ষ্মণের তেজোদ্দীপ্ত মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাম শান্তভাবে বললেন,— 'লক্ষ্মণ, আমি হতাশ হইনি একটুও। আমাকে লংকাপুরী খুঁজে বার করে সীতাকে উদ্ধার করতেই হবে। অন্যথায় জানবে আমার উদ্যম ও বীরত্ব সমস্তই নিস্ফল। তবে, একথাও ঠিক যে আমাদের শত্রু কত শক্তির অধিকারী, তা আমাদের প্রথমেই ভালো-ভাবে নির্ণয় করতে হবে। ছলে, বলে, কৌশলে, এবং বন্ধুজনের সাহচর্যে সেই শত্রুকে চরম আঘাত হানতে হবে। ভাই, শুধু তুমি আর আমি এ দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন করতে পারবো না। এখন দেখা যাক, এই বানরেরা আমাদের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করে করে কিনা।'

লক্ষ্মণ রামের উক্তিকে নীরবে সমর্থন জানালেন। রামের মধ্যে সক্রিয় উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত হয়েছে দেখে লক্ষ্মণ আশ্বস্ত বোধ করলেন।

লক্ষ্মণের মৌন সম্মতিতে প্রীত হয়ে রাম সপ্রতিভভাবে বললেন, 'আর লক্ষ্মণ, তুমি এই কথা মনে রেখো যে এই বানরদের সঙ্গে তুমিই আমার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করবে। আমরা এদের সহায়তায় কার্যসিদ্ধি করতে চাই। এদের, উন্নত জীবনধারণ প্রণালী ও আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত করাতে চাই। তুমি নিশ্চয়ই জেনো যে এই আদিম অধিবাসী বানরদের সঙ্গে সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে কোন সংকোচ অথবা কুসংস্কার নেই। যে কেউ আমাদের এই সীতাকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যকে স্বীকার করে নেবে, যে কেউ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই উদ্দেশ্যকে সাফল্য-মণ্ডিত করতে এগিয়ে আসবে, তাকেই বা তাদেরকেই আমাদের মিত্র বলে মানবো, বিশ্বাস করবো।'

রামের দীর্ঘ ভাষণে লক্ষ্মণ মনে মনে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত বোধ করেন। রামের

বীরত্ব, মহত্ত্ব, ধৈর্য, ক্ষমা—সকল গুণের পরিচয়ই লক্ষ্মণ পেয়েছেন। এইবার রামের কূটনীতি এবং রাজনীতির জ্ঞানের চরম পরীক্ষা। লক্ষ্মণ জানেন রামের তুল্য মানুষ ইহজগতে নেই।

ইতিমধ্যে তাঁরা দক্ষিণ দিকে বেশ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। অদূরে এক পর্বত দেখা যাচ্ছে। বেলা প্রথম প্রহরের বেশী উত্তীর্ণ হয়নি। লক্ষ্মণ স্থির করলেন যে কপিবর সুগ্রীবের সঙ্গে আজকের মধ্যেই মিলিত হতে হবে।

এই চিন্তার সঙ্গেই সম্মুখে পর্বতশৃঙ্গে কতিপয় বিশিষ্ট আকৃতির বানর লক্ষ্মণের দৃষ্টিগোচর হলো। এই বানরদের একটি দলভুক্ত বলেই মনে হলো লক্ষ্মণের। কিন্তু বানরেরা ত্বরিতপদে দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলো।

লক্ষ্মণ অনুমান করলেন যে এই দলটির দলপতি সুগ্রীবই, কারণ পর্বতটি ঋষ্যমূক। হয়তো দুই ভ্রাতার বীরত্বব্যঞ্জক মুখাকৃতি এবং দেহসৌষ্ঠব লক্ষ্য করে বানরেরা অদৃশ্য হয়েছে। সুগ্রীব হয়তো তাঁদের দুজনকে জ্যেষ্ঠ বালীর নিযুক্ত হত্যাকারী বলে সন্দেহ করেছেন!

রামও বানরদের দ্রুত অপসরণ লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মনে অল্প সন্দেহ যে সুগ্রীবকে এখানেই পাওয়া যাবে। রাম লক্ষ্মণকে ইশারা করে বানরদের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ করলেন।

* * * *

সুগ্রীবের প্রধান অনুচর ধূর্ত এবং বাগ্মীশ্রেষ্ঠ হনুমানের শিষ্ট ও মার্জিত আচরণে রাম ও লক্ষ্মণ শুধু বিস্মিতই হলেন না, যার পর নাই প্রীত হলেন। বানররূপী এই অনার্য আদিবাসীদের গতি, প্রকৃতি, সংস্কার, জীবন-ধারণ-প্রণালী, কিছুর সঙ্গেই এঁরা পরিচিত ছিলেন না। বানরদের বাহুবল ও বিক্রম সম্বন্ধেও তাঁদের জ্ঞান নেই।

তবুও হনুমানের আর্যজনোচিত বচনে এবং বাকচাতুর্যে রাম ও লক্ষ্মণ দুজনেই হনুমানের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন। হনুমান নিজেকে সুগ্রীবের সচিব বলে পরিচয় প্রদান করে, এই শ্বাপদসংকুল ভীষণ অরণ্যপ্রদেশে তাঁদের আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

রামের অনুমতিক্রমে লক্ষ্মণ অযোধ্যায় পিতা দশরথ কর্তৃক রামের নির্বাসিত হওয়া থেকে শুরু করে সীতাহরণের কাহিনী এবং কবন্ধ দনুর বৃত্তান্ত হনুমানকে জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এবং অশ্রুপূর্ণলোচনে সুগ্রীবের সহায়তা প্রার্থনা করলেন।

হনুমান রাম ও লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের দুর্ভাগ্যের কাহিনী বললেন—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী কর্তৃক রাজ্য থেকে বিতাড়ন, বালী কর্তৃক সুগ্রীবের স্ত্রীকে গ্রহণ, কিছুই বাদ দিলেন না। হনুমান সুগ্রীবের পক্ষ থেকে দু'ভ্রাতাকে এই আশ্বাসও দিলেন যে তাঁরা সীতার অন্বেষণে সহায়তা করবেন।

হনুমানের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে তাঁর বিনম্র প্রকৃতি, শিক্ষিত ও সহানুভূতি-সম্পন্ন মনের স্পর্শ লাভ করে রামের অন্তঃকরণে আশার আলো প্রজ্বলিত হলো। রাম, হনুমানের অনুরোধ অনুযায়ী লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হতে চললেন।

ইক্ষ্বাকুকুলসূর্য রামের বংশগৌরবের কথা শুনে এবং আত্মত্যাগের কাহিনীতে মুগ্ধ হয়ে সুদর্শন রূপধারী সুগ্রীব রামকে আন্তরিক অভিবাদন জানালেন।

সুগ্রীব সহানুভূতির সঙ্গে রামকে বললেন, 'আকাশ পথে রাক্ষস যখন এক নারীকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি হা রাম, হা লক্ষ্মণ বলে বিলাপ করছিলেন। পর্বতের উপরে আমাদের বসে থাকতে দেখে তিনি তাঁর উত্তরীয় ও অলংকারসমূহ ফেলে দিয়েছিলেন। আমরা সেই সব রেখে দিয়েছি, তুমি সেগুলি দেখ।'

রাম ও লক্ষ্মণ গভীর আগ্রহের সঙ্গে সেই উত্তরীয় ও আভরণ দেখলেন। জানকীর দুঃখে শোকে কাতর হয়ে রাম বললেন, 'তোমাদের অনুমান অভ্রান্ত। কেয়ুর, কুণ্ডল, নূপুর—এ সবই জনকনন্দিনীর অলংকার।'

সুগ্রীব রামের অশ্রু নিজের হাতে মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'সেই পাপিষ্ঠ রাক্ষসের বাসস্থান কোথায় আমি জানি না! কিন্তু তবুও আমরা তোমার প্রিয়তমা ভার্যাকে খুঁজে বের করবোই। তুমি শোক ত্যাগ করো এবং অবসাদগ্রস্ত না হয়ে পৌরুষকে আশ্রয় করো।'

শাস্ত্রবিধি অনুসারে রাম ও লক্ষ্মণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সুগ্রীব সীতাকে খুঁজে আনার প্রতিশ্রুতি দান করলেন। সুগ্রীবের মনে এই অবসরে রামের শৌর্য ও বীর্যের সহায়তায় নিজের দুঃখের সমাধান করার সম্ভাবনাটিও প্রবল হলো।

আর্য ও অনার্যের এই সখ্যের গ্রন্থি সকলের অজ্ঞাতসারেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবর্তনে এক নূতন অধ্যায় রচনা করতে উদ্যত হলো। রাম এই বানরদের সহৃদয়তায় বিচলিত বোধ করে প্রথমে সুগ্রীবকে এবং পরে হনুমানকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করলেন। তারপরে লক্ষ্মণের পালা। এই দুই আর্য ক্ষাত্রিয়ের নিকট এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। তাঁদের চক্ষে প্রত্যাশার উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ।

রাম হনুমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আর্দ্র কণ্ঠে সুগ্রীবকে বললেন, 'সুগ্রীব, আমাদের এই অসময়ে তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আমাদের হৃদয়কে আনন্দে পরিপূর্ণ করছে। এখন আমরা একা নই। তোমাদের মতো এক শক্তিশালী গোষ্ঠী আমাদের পিছনে থাকবে।'

রামের কথায় সুগ্রীবের আঁখিদুটিতে এক নীরব প্রশ্ন প্রতিফলিত হলো। রাম সুগ্রীবের মুখের করুণ ভাবটি লক্ষ্য করে অনুকম্পার সঙ্গে বললেন—'সুহৃদ্বর, ভ্রাতা বালীর হাতে তোমার লাঞ্ছনার কাহিনী আমি শুনেছি। সে তোমার ধর্মপত্নীকেও অপহরণ করেছে। ভাই, তুমি শীঘ্র কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে জোষ্ঠ বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করো। আমি সেই সুযোগে বালীকে বধ কোরে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য তোমার হাতে তুলে দেব। আশা করবো, তুমি দেশের অধিপতি হয়ে, তোমার পত্নীকে ফিরে পেয়ে, তোমার সমস্ত সহায় ও সম্পদ আমাদের পক্ষে নিয়োগ করবে। তা হলেই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দুরাত্মা রাবণের নিবাস আক্রমণ করে আমরা সীতাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবো। এই ধরাতলে কারোর ক্ষমতা নেই যে আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়।'

এই কথা শুনে হনুমান বিনীতভাবে রামকে বললেন—'আমরা আপনার অলৌকিক বীরত্বের কাহিনী আগেই শুনেছি। জনস্থানে চৌদ্দ হাজার রাক্ষসদের নিধন করে আপনি তাদের দণ্ডকারণ্য থেকে সমূলে উচ্ছেদ করেছেন। এখন মুনিঋষিরা নিশ্চিন্তে যাগ-যজ্ঞ, অধ্যয়ন করতে পারবেন। উত্তর দিক থেকে আর্যেরা ক্রমশঃই দক্ষিণ থেকে আরো দক্ষিণে এগিয়ে আসবেন, যেমন আপনি এসেছেন। এতে অবশ্য আমাদের আশংকার কোন কারণ নেই। মুনিঋষিদের যজ্ঞ পণ্ড করায় বানরদের কোন প্রবৃত্তি নেই। আর্যদের উপরও কোন বিদ্বেষ নেই।'

সুগ্রীব লক্ষ্য করলেন যে হনুমানের বাকপটুতায় রাম চমৎকৃত হয়েছেন। লক্ষ্মণের অধরেও হাসির রেখা।

বানরদের নায়করূপে তাঁর নিজেরও কিছু মন্তব্য করা প্রয়োজন বোধ করে, সুগ্রীব তৎক্ষণাৎ রামকে বললেন, 'বন্ধু, তুমি হয়তো বানরদের স্বভাব ও প্রকৃতির পরিচয় তেমন পাও নি। আমি এবং আমার ভ্রাতা বালী দুজনেই দেবতার ঔরসে কিন্তু বানরীর গর্ভে জন্মেছি। আমার মাতার রূপে মোহিত হয়ে ইন্দ্র এবং সূর্য দুজনেরই বীর্যস্খলন হয়, এবং জন্মগ্রহণ করে যথাক্রমে বালী এবং সুগ্রীব। আমিই সেই সুগ্রীব, বুঝতেই পারছো। আর আমাদের এই প্রধান সহচর ও শ্রেষ্ঠ হিতৈষী ও সচিব হনুমানের জন্মও বায়ুর ঔরসে বানরী অঞ্জনার গর্ভে। হনুমানকে শাপভ্রষ্ট দেবতা বললেও অত্যুক্তি হয় না। ওর এত ক্ষমতা, যে ও নিজেই তা ভালো করে জানে না।'

সুগ্রীবের কথার ধরণে রাম তাঁর মনোগত অভিপ্রায়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। লক্ষ্মণও এই সময়ে রামকে ইঙ্গিতের দ্বারা কিছু জানালেন।

রাম সুগ্রীবের হাত দুটি ধরে আন্তরিকভাবে বললেন, 'সখা সুগ্রীব, তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না। তোমার জ্যেষ্ঠ বালী ইন্দ্রের ঔরসজাত পুত্র হলেও এবং অপরিমিত শক্তির অধিকারী হলেও, সে আমার হাত থেকে নিস্কৃতি পাবে না। তুমি নির্ভয়ে থাকো এবং বালীকে যুদ্ধে প্ররোচিত করো। তাহলে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।'

সুগ্রীব রামের হাত দুটিতে মৃদু চাপ দিয়ে সৌহার্দের কণ্ঠে বললেন,—'ক্ষত্রিয় কুলতিলক, আমরা বানরেরা মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করতে চাই না। আমাদের এই বানর জাতির মধ্যে আকৃতিগত ভাবে কয়েকটি শ্রেণী আছে। আমাদের মধ্যে ভল্লুক শ্রেণীও আছে। তারা আমাদেরই জ্ঞাতি এবং স্বজন। আমাদের এই বিরাট জাতিতে বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট গোষ্ঠী আছে, যাদের নিবাস এই কিস্কিন্ধ্যা রাজ্যে এবং তার আশেপাশে। বালী অত্যন্ত বিক্রমশালী, উদ্ধত প্রকৃতির এবং কামোন্মত্ত। কিন্তু সেও পুজার্চনা করে, বরং আমিই ধর্মের দিক থেকে তেমন উন্নত নই। বালীর পত্নী তারা অত্যন্ত সহৃদয়া, সুন্দরী এবং পতিপরায়ণা। তাদের একমাত্র পুত্র অঙ্গদও বীরবাহু এবং পিতামাতার বাধ্য সন্তান। আমার পত্নী রুমা এখন বালীর কবলিত। বালী বহুভাবে আমার নির্যাতন করেছে এবং বিনা কারণে আমাকে দেশচ্যুত করেছে। আমি এর প্রতিশোধ নেবোই। রাম, তোমার মতো এক শ্রেষ্ঠ আর্য ক্ষত্রিয় বীর যখন তার যোগ্য ভ্রাতাকে নিয়ে আমার সঙ্গে সখ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তখন তোমার বিপদ, তোমার দুঃখ এখন থেকে আমার এবং আমাদের সকলেরই বিপদ এবং দুঃখ। তুমি তোমার বীরত্বের পরিচয় দিয়ে বালীকে বধ করো, তা'হলে যেমন ভাবেই হোক আমরা বানরেরা তোমার কাজ সম্পন্ন করবোই। আমাদের অগণিত সৈন্য এবং বিশিষ্ট ও বিজ্ঞ সেনানায়কেরা অতি দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকেও অপদস্থ এবং পরাজিত করতে সক্ষম।'

রাম পুনরায় সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করে মধুর কণ্ঠে বললেন,—'বন্ধু, তোমাদের সহৃদয়তা রাবণের হৃদয়হীনতাকে আমার চোখে শতগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে। তোমরা বানরেরা নিজেদের নিয়েই থাকো। অন্যের কাজে তোমাদের মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু রাক্ষসেরা মুনিঋষিদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। আর্যক্ষত্রিয় এবং রাজার সন্তান হিসেবে, এই রাক্ষসদের দমন করা, তাদের যথোচিত শাস্তি দেওয়া ছাড়া আমার অন্য কোন উপায় ছিল না। তা বলে রাক্ষসরাজ এক অবলা নারীকে জোর করে হরণ করে নিয়ে যাবে! ছিঃ ছিঃ, যতই আমি রাবণের দুস্কৃতির কথা চিন্তা করছি, ততই

ক্রোধে আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে। সেই ক্রোধের জ্বালায় আমি আমার প্রাণাধিক প্রিয় ভার্যার অপহরণের শোককে একবারও ভুলে থাকতে পারছি না। লক্ষ্মণ, চলো আমরা এখন আমাদের অরণ্যের আশ্রয়ে ফিরে যাই। সুগ্রীবের সঙ্গে বালীর সম্মুখ যুদ্ধের খবর শুনলেই, আমরা অকুস্থলে গিয়ে উপস্থিত হবো। তখন যা করার আমি তাইই করবো। নির্বাসনের সময়ে আমাদের নগরাভ্যন্তরে যাওয়া শাস্ত্রসঙ্গত নয়।'

লক্ষ্মণ এতক্ষণ নীরবে জ্যেষ্ঠের বাক্যালাপ গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছিলেন। বানরদের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে রামের ঔৎসুক্য লক্ষ্মণের হৃদয়েও একইভাবে বর্তমান। সুগ্রীব ও হনুমানের কথার মধ্য থেকে বানরদের রীতিনীতি সম্বন্ধে অল্প ধারণা লক্ষ্মণের হলো। লক্ষ্মণ আগেই যে উপকার এবং প্রত্যুপকারের প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, এই বানরদের সঙ্গে সখ্য সেই প্রথম উপকারের উপরই নির্ভরশীল। লক্ষ্মণ নিশ্চিত যে জ্যেষ্ঠ রাম যে কোন প্রকারেই হোক কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালীকে নিহত করবেনই।

সুগ্রীব, হনুমান এবং অন্য অনুচরেরা বায়ুযোগে ঋষ্যমূক পর্বতের শৃঙ্গে যাত্রা করলেন। রাম সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে হনুমান এক লম্ফে পর্বত চূড়ায় গিয়ে অধিষ্ঠিত হলেন। বানররূপী এই অদ্ভুত প্রাণী যে বল ও বিক্রমে অতুলনীয়, এই কথাই রামের হৃদয়ে বার বার উদয় হলো। অকস্মাৎ রামের দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হলো। রাম দূরে ঋষ্যমূক পর্বতশৃঙ্গের প্রতি আগ্রহ সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। হনুমান যেন ব্যাকুলভাবে রামের প্রতি পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন।

ধূসর গোধূলি এসে সেই নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশকে আচ্ছন্ন করলো। ক্রমে ক্রমে সূর্যের শেষ রশ্মি আকাশে বিলীয়মান হলে গাঢ় অন্ধকার চারদিকে পরিব্যাপ্ত হলো। লক্ষ্মণ নিজেও রামের সঙ্গেই অদূরে পর্বতের দিকেই লক্ষ্য করছিলেন। রামের মতো লক্ষ্মণের মনেও আনন্দ ও সংশয়ের মিশ্র প্রতিক্রিয়া। এই নূতন সখ্য আর্য ও অনার্যের মধ্যে মিলনের গ্রন্থি বন্ধনে সহায়ক হলেও, রামের প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হবে তো! লক্ষ্মণ নিশ্চিত যে সীতাকে উদ্ধারে কৃতকার্য না হলে, রাম আর অযোধ্যার পথে যাবেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করে লংকায় নিয়ে আসার পর থেকেই এক অদ্ভুত মানসিক চাঞ্চল্যে সমগ্র লংকাপুরী আক্রান্ত। শান্তি নেই রাক্ষসপতি রাবণের মনে—সীতা এখনও তাঁর বশীভূত হন নি।

শান্তি নেই সীতার মনে—গভীর ঘৃণা ও অবহেলার সঙ্গে রাবণকে প্রত্যাখ্যান করলেও, এই রাক্ষসীসমাকীর্ণ ভয়ংকর পরিবেশ এবং নিরন্তর পতি-বিরহের বেদনা তাঁকে ক্ষোভে এবং দুঃখে মগ্ন রেখেছে।

শান্তি নেই রাণী মন্দোদরীর মনে—রাক্ষসরাজ এক পর-নারীকে ভোগের জন্য হরণ করে এনে শুধু যে রাণীর মনে স্বামীর দুষ্কৃতির জন্য এক পাপ পুণ্যের দ্বন্দ্ব জাগরিত করেছেন তাইই নয়, সীতার দুঃখও রাণীর মনকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছে।

শান্তি নেই বিভীষণের মনে—জ্যেষ্ঠ রাবণের লোভী ও নিষ্ঠুর রাক্ষস-প্রবৃত্তির প্রতি দেশবাসীর প্রতিবাদহীন আনুগত্যে তিনি রাক্ষসদের ভবিষ্যৎ এবং লংকার ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন।

সরমাই এই মানসিক দ্বন্দ্বের উর্ধে থেকে সীতার প্রতি গভীর অনুকম্পা এবং সম্ভ্রম প্রদর্শন করছেন। তিনি লক্ষ্য করছেন, রাবণের নির্দেশে মুখরা এবং ভীষণা রাক্ষসীরা সীতার সঙ্গে অসঙ্গত আচরণ করছে কিনা। বিভীষণের উপদেশ সরমা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে সচেষ্ট।

বিভীষণ রাবণকে সীতাহরণের যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে একান্তভাবে কয়েকবার বলেছেন এবং তর্কেও প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু রাবণের সেই এক কথা—রাম রাক্ষসদের পরম শত্রু, রামকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হলে, এই পথ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তা করা সম্ভব ছিল না।

রাবণ উপদেশের ভঙ্গীতে বলেন 'বিভীষণ, তুমি পাপ পুণ্যের বিচার রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির নির্দেশ সাপেক্ষেই তো করবে। তা ছাড়া এক সামান্য মানবীকে লংকায় আনাতে তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? আমার মন্ত্রীরা ও সেনাপতিরা তো এই বিষয়ে কোন দুশ্চিন্তারই প্রশ্রয় দিচ্ছে না। আচ্ছা, তুমি কি সত্যই মনে করো যে রাম কোন দিনও আমার কবল থেকে সীতাকে উদ্ধার করতে পারবে?'

জ্যেষ্ঠের অনড় মনোভাব বিভীষণকে শঙ্কিত করে। কিন্তু রাবণের কাজকে সমর্থন করার কোন নৈতিক যুক্তি তিনি নিজের মনের মধ্যে আবিষ্কার করতে সক্ষম হন না।

তবুও সাধারণ ন্যায় অন্যায়ের জ্ঞান থেকে বিভীষণ না বলেও পারেন না, 'মহারাজ রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি কি পরস্ত্রীহরণকে শত্রুকে দলন করার একমাত্র উপায় বলে নির্দেশ করে? আপনি যদি রামকে আপনার শত্রু বলেই বিবেচনা করেন, তবে আপনি রামকে শাস্তি দিলেন না কেন, অথবা সসৈন্যে দণ্ডকারণ্যেই রামকে আক্রমণ করলেন না কেন? আমাকে মার্জনা করবেন, তবে কি রামের শৌর্য ও বীর্য এবং খর, দূষণ, ত্রিশিরা সমেত চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে ধ্বংস করার ক্ষমতায় ভীত হয়ে রামকে না স্পর্শ করে, তাঁর সুন্দরী পত্নীকে, এক অবলা নারীকে, চোরের মতো রামের অনুপস্থিতিতে হরণ করে নিয়ে এলেন? মহারাজ, আমি সত্য কথা বলতে কখনই ভয় পাই না, এ'কথা আপনার অজানা নয়। আপনার মন্ত্রীরা অথবা সেনাপতিরা যদি এই চৌর্যবৃত্তির দ্বারা পরনারী অপহরণের কাজকে উৎসাহ দিয়ে থাকে এবং তাকে এখানে বন্দী করে রাখার কাজকে সমর্থন করে থাকে, তবে জানবেন তারা তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্যই সে কাজ করেছে, আপনার ভালোর জন্য করে নি। রাক্ষসদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করার জন্যই প্রহস্ত, অকম্পন প্রভৃতি মন্ত্রীরা আপনাকে পতঙ্গের মতোই আগুনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।'

বিভীষণের স্পষ্টোক্তিতে রাবণের মুখাবয়ব ভীষণ আকার ধারণ করলো। দম্ভে এবং ক্রোধে প্রজ্জলিত হয়ে রাবণ কর্কশভাবে বললেন,—'বিভীষণ, তুমি স্পষ্টবাদী আমি জানি। কিন্তু তোমার এই শান্ত ও নিরুত্তাপ যোগীসুলভ মনোবৃত্তিকে আমি রাক্ষসোচিত বলে মনে করতে পারি না। দুষ্টের দমন করতে হলে, কূট পন্থা অবলম্বন করাই রাজনীতি, এবং রাষ্ট্রনীতিও বটে। রাম দণ্ডকারণ্য এবং আরও দক্ষিণে প্রায় কিষ্কিন্ধ্যা পর্যন্ত অরণ্যময়, পর্বতসঙ্কুল ভূভাগকে কোশলরাজ্যের অধীন বলে মনে করে। সে আমাদের বিনা অনুমতিতেই গোদাবরীতীরে পঞ্চবটীতে আশ্রম নির্মাণ

করে বাস করেছে। সে আমার অনুচরবৃন্দকে বধ করেছে এবং আমাদের ভগ্নীর নির্যাতন করেছে। সুতরাং তাকে শিক্ষা দেবার জন্য যদি সীতাকে লংকায় এনে থাকি, তবে আমি রাক্ষসকুলের নেতা এবং রাক্ষসদের রাজা হিসেব আমাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী ঠিক কাজই করেছি।'

—'রাক্ষসদের ঐতিহ্য বলবেন না, আপনার নিজের ঐতিহ্যের কথা বলুন। আপনার মহান চরিত্রের এই বিরাট কলংকের কথা সকলেই জানে। আকাশের চাঁদের কলংক যেমন লক্ষ কোটি তারকার অজ্ঞাতসারেই চাঁদের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যকে ক্ষুন্ন করে, তেমনই আপনার লক্ষ কোটি অনুচরদের অজ্ঞাতসারেই এই পরনারীসম্ভোগের প্রবৃত্তি এবং নারী-লোলুপতা আপনার পৃথিবীব্যাপী সুনাম ও খ্যাতিকে কলংকিত করেছে। এই কথা আপনি নিজে যে জানেন না, তা তো নয়! তা ছাড়া দণ্ডকারণ্যে কোশল-রাজ্যেরও অধিকার আছে।

বিভীষণের তির্যক বচনে রাবণের হৃদয় ক্ষোভে এবং বিদ্বেষে দগ্ধ হয়। কিন্তু বিভীষণের যুক্তির গভীরতায় তিনি বিস্মিত না হয়ে পারেন না। পুনরায় পর মুহূর্তেই ক্রোধ এবং দর্প তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে।

তখনই সীতার সুশ্রী আনন, সুকুমার দেহ, ক্ষীণ কটিদেশ, সুপুষ্ট নিতম্বদ্বয়, উন্নত পয়োধরের কাল্পনিক চিত্র যেন রাবণের চক্ষে এক স্বপ্নের মোহজাল বিস্তার করে। এই নারী যদি স্বেচ্ছায় রাবণকে দেহ দান না করে, তবে রাবণের রাক্ষসজন্মই বৃথা! সীতাকে জয় করতে পারলে, রাবণ যেন আর একবার পৃথিবীকে জয় করতে পারবেন।

সীতাকে লাভ করার সুখচিন্তায় রাবণের ক্রোধ প্রশমিত হয়।

রাবণ আত্মস্থ হয়ে কিছুক্ষণ নীরবে অবস্থান করলেন। তারপরে শান্তভাবে বললেন, 'তা ছাড়া রাম যদি তেমন সহায় ও সম্পদশালী হয়, তেমন বড় বীর হয় এবং লংকায় এসে রাক্ষসদের উপর হানা দেয়, তবে আমিও এক প্রকৃত বীরের সঙ্গে যুদ্ধের সুযোগ পাবো এবং নিজের রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দেবো। বিভীষণ, ভুলে যেও না যে দেব, রক্ষ, যক্ষ, দানব, গন্ধর্ব—কারোর হাতে আমার মৃত্যু নেই। আর সামান্য এক মানব এই বিশাল সমুদ্র পেরিয়ে লংকায় পৌঁছাতে পারবে না। যদি সত্যই রাম লংকায় আসে, তখন বুঝবো যে হয় সে নিজে মরতে এসেছে, আর নয়তো এই রাক্ষসাধিপতি রাবণের নিয়তি মানুষের রূপ পরিগ্রহণ করে লংকার সিংহদ্বারে উপস্থিত হয়েছে।'

রাবণের কথার গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করে এবং রাক্ষসদের রাজার ও লংকার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বিভীষণ মনে গভীর অস্বস্তি অনুভব করেন। ইতিমধ্যে বিভীষণ লক্ষ্য করলেন, রাবণ কথোপকথনের মধ্যে বিলাসকক্ষ থেকে উত্তেজিতভাবে নিষ্ক্রান্ত হলেন। বিভীষণ রাবণের এই আকস্মিক উত্তেজনার কারণ নির্ণয় করার আগেই, লঘুপদে কক্ষে প্রবেশ করলেন রাজ্ঞী মন্দোদরী।

কক্ষের অভ্যন্তরে স্বপ্নময় আলোআঁধারীর মায়াজালে মন্দোদরীর উপস্থিতি যেন অন্ধকার আকাশে হঠাৎ পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের মতো মনে হয় বিভীষণের। মন্দোদরী এই প্রভাতকালে রাজভ্রাতা বিভীষণকে এইখানে আশা করেন নি। দু'জনের চক্ষু মিলিত হতেই, দু'জনের অধরেই বিস্ময় ও পুলকের ক্ষীণ হাসি।

মন্দোদরীও দেবরের উপস্থিতিতে মনে এক অনাস্বাদিতপূর্ব স্বস্তি অনুভব করলেন। এক মনোমুগ্ধকর হাসির রেখা বিকশিত হলো তাঁর তুলনাহীন রক্তিম ওষ্ঠদ্বয়ের প্রান্তে।

মৃদু কণ্ঠে বললেন রাণী, 'দেবর বিভীষণ, নিশ্চয়ই জ্যেষ্ঠের কাছে সীতাকে বন্দী করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলে, তুমি। কিছু ফল হলো কি? মহারাজ কি বললেন?'

বিভীষণের অন্তঃকরণ মন্দোদরীর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হলো। বিভীষণ মন্দোদরীর প্রতি আপন দৃষ্টি-ভিক্ষু আঁখিদুটি নিবদ্ধ করলেন। এই নারীর প্রতি রক্ষরাজ অনুরক্ত হলেও, মন্দোদরীর পতিপ্রেমের যোগ্য মর্যাদা রাবণ দেন নি। হয়তো মন্দোদরীর প্রতি একনিষ্ঠ কোন সময়েই হন নি রাবণ। কিন্তু মন্দোদরী রাবণকেই তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান বলে মনে করেছেন।

বিভীষণ জানেন যে মন্দোদরী বিভীষণকে শ্রদ্ধা করেন, সম্মান করেন। মন্দোদরী নিজে বিভীষণের সহমর্মিতার কথাও উপলব্ধি করেন। মন্দোদরীর প্রশ্নের উত্তরে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেন বিভীষণ।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে আবেগমুক্ত করে শান্তভাবে বললেন, 'রাজ্ঞী, আপনি কি মহারাজের সঙ্গে সীতার বিষয়ে কোন আলোচনা করেন নি? আপনিও কি সীতাকে বন্দী করে রাখার স্বপক্ষেই আপনার অভিমত প্রকাশ করেছেন? আমি তো তাঁর মনের মধ্যে এবিষয়ে কোন দ্বন্দ্বের চিহ্নই আবিষ্কার করতে পারি নি!'

এক গভীর দীর্ঘশ্বাস মুক্ত হলো মন্দোদরীর বক্ষ থেকে। বিভীষণের মুখের ও হৃদয়ের প্রশান্তি মন্দোদরীকে চিরদিনই আকর্ষণ করে। বিভীষণের সাত্ত্বিক মনোবৃত্তি হয়তো সব সময়ে মন্দোদরীর মনঃপূত হয় না। কিন্তু বিভীষণ যে স্থিতপ্রজ্ঞ এবং ধার্মিক, বিভীষণ যে অত্যন্ত স্বদেশবৎসল ও ন্যায়নিষ্ঠ, এ সব মন্দোদরী, রাবণের মতোই উত্তমরূপে জানেন।

মন্দোদরী রাবণের আগমনের আশংকায় মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'দেবর বিভীষণ, তোমার জ্যেষ্ঠকে তুমি ভালোভাবেই চেনো। রাক্ষসসুলভ দম্ভ এবং নিষ্ঠুরতা তাঁর দেহের ও মনের সমস্ত গুণকে আবৃত করে রেখেছে। আমার হৃদয়ে এক অনাগত বিপর্যয়ের আশংকা জেগে উঠেছে। এই সাধ্বী সীতার অভিশাপেই হয়তো রাক্ষসদের সর্বনাশ হবে!'

বিভীষণও রাবণের পুনরায় আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে শান্তভাবে বললেন—'দেবী, আপনি অসহায় বোধ করবেন না। আমি নিরন্তর আপনার পাশেই থাকবো এবং রাক্ষসরাজকে এই অবস্থার আশু প্রতিকারের জন্য অনুরোধ করে যাবো। তাঁর নিজের মনের মধ্যে যে আশা ও আকাঙ্ক্ষার ছবিই প্রস্ফুটিত হয়ে থাক না কেন, মানুষ রামের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তাঁর মনের মধ্যে যতো তীব্র আকুলতাই জাগুক না কেন, দেশের এবং দেশবাসীর ভবিষ্যৎ ও মঙ্গলের চিন্তাও তো তাঁকে করতেই হবে!'

বিভীষণের উক্তিতে গভীরভাবে বিচলিত হয়ে মন্দোদরী বললেন, 'দেবর বিভীষণ, আমি জানি, একমাত্র তুমি রক্ষরাজকে নীতি ও ধর্মের পথে নিয়ে আসতে পারবে। অন্য সকলেই চাটুকারিতার সাহায্যে নিজেদের স্বার্থের উন্নতির কামনা করে। দেবর কুম্ভকর্ণ দীর্ঘদিন নিদ্রাজগতকে আশ্রয় করে না থাকলে, হয়তো তুমি এবং কুম্ভকর্ণ দুজনেই তোমাদের জ্যেষ্ঠকে সীতা হরণের বিষময় পরিণাম থেকে রক্ষা করতে পারতে। কিন্তু, বিধাতা আমাদের সহায় নন। কুম্ভকর্ণকে অসময়ে তার নিদ্রা থেকে জাগরিত করলে, অশুভ ফল হবে। সুতরাং তোমাকে এই পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে

হবে। দেবর, তুমি এই গুরুতর কাজে সক্ষম হবে তো? আমি তোমার মুখের পানেই তাকিয়ে আছি।'

—'রাণী মন্দোদরী, আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আমি লংকায় থাকতে জ্যেষ্ঠকে চরম অধর্মের হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে কিছুতেই দেবো না। প্রয়োজন হলে, আমি মন্ত্রীদের সম্মুখীন হবো। আপনি বোধ হয় জানেন, ইতিমধ্যে আমি সরমাকে অশোকবনে সীতার উপর লক্ষ্য রাখতে আদেশ দিয়েছি, যাতে রাজার কুটিলনয়না বিকৃতবদনা রাক্ষসী সহচরীরা সীতার কোন চরম ক্ষতি না করতে পারে এবং সীতা যাতে আত্মবিসর্জনের পথে যাবার চিন্তা না করেন। সীতাকে সসম্মানে রামের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে রামের সঙ্গে সখ্যতার সূত্রে আবদ্ধ হওয়াই রাক্ষসদের পক্ষে সর্বতোভাবে মঙ্গলজনক। আমি জানি আপনিও সকল সময়ই মহারাজকে এই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করছেন।'

বিভীষণের আত্মবিশ্বাস মন্দোদরীর মনে পরম আশ্বাসের সৃষ্টি করে। মন্দোদরী চিন্তা করেন যে তাঁর এবং বিভীষণের মানসিকতা এই বিষয়ে এক এবং অভিন্ন। সুতরাং তাঁর বিশ্বাস যে তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাঁরা শেষপর্যন্ত রাবণকে রাক্ষসসুলভ নৃশংসতা এবং অনৈতিকতা বর্জন করিয়ে ধর্মসম্মত পথে নিয়ে আসতে সক্ষম হবেন এবং রাক্ষসদের ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ করবেন।

মন্দোদরী লক্ষ্য করলেন যে বিভীষণ চিন্তান্বিত ও বিষাদপূর্ণ আননে নত মুখে অপেক্ষা করছেন। মন্দোদরী আকস্মিকভাবে গভীর মমতায় দেবরের হাত দুটি ধারণ করে স্থির দৃষ্টিতে বিভীষণের চক্ষুর ভাষাটি পাঠ করতে প্রবৃত্ত হলেন।

এই অপ্রতিহত আবেগের উচ্ছ্বাস বিভীষণকেও অভিভূত করে। বিভীষণ মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করেন জ্যেষ্ঠের সঙ্গে আরও বলিষ্ঠভাবে ন্যায় ও অন্যায়ের তর্কে প্রবিষ্ট হতে।

মন্দোদরী নিজেই বিভীষণের হাতদুটি ছেড়ে দিয়ে নিজের ভাবপ্রবণতায় লজ্জিত হলেন। তাঁর সুগৌর মুখমণ্ডল রক্তিম, তাঁর বক্ষ কম্পিত, পদদ্বয় স্পন্দিত। বিভীষণ ভ্রাতৃজায়ার হৃদয়ের মধুর স্পর্শটি লাভ করে প্রফুল্ল বদনে সেই কক্ষ ত্যাগ করলেন। বিভীষণের গমনের প্রতি লক্ষ্য করে মন্দোদরীর সমগ্র সত্তাটি যেন এক স্বর্গীয় আলোকে উজ্জ্বল হলো।

* * * *

রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের সঙ্গে বাক্যালাপের মধ্যে দ্রুতপদে যেন মেদিনী কম্পিত করে কোথায় গেলেন!

ইতিমধ্যেই বন্দিনী সীতাকে রাবণের আদেশে অশোকবনে নিয়ে আসা হয়েছিল। বিবিধ তরুরাজীতে সমাকীর্ণ এই বনে সব ঋতুর পুষ্পের সমারোহ। মৃগ ও পক্ষী অবাধে বিচরণ করছে, কোকিল কূজন করছে, ভ্রমর গুঞ্জন করছে।

স্থানে স্থানে মণিমুক্তাখচিত সোপানাবলী নিচে জলপূর্ণ সরোবরে গিয়ে মিলিত হয়েছে। বনের কেন্দ্রভাগে স্বচ্ছসলিলা এক নদী প্রবাহিত হচ্ছে এবং তাতে হংস, সারস প্রভৃতি আনন্দে ক্রীড়া করছে। দূরে দূরে গুল্মলতাগুলি পুষ্পে পরিপূর্ণ হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে উপবনের সৃষ্টি করেছে।

বনের মধ্যে অনেক স্থানে প্রস্তরময় উচ্চভুমি, যাকে দেখে হঠাৎ মনে গিরি বলে ভ্রম হয়। বিশ্রম্ভালাপের জন্য বৃক্ষের ছায়ায় কতকগুলি মনোরম শিলাগৃহ, যেগুলি দূরে থেকে শান্তির নীড় বলেই প্রতিভাত হয়।

এই অশোকবনে একটি কাঞ্চনবর্ণ শিংশপা বৃক্ষের নীচে এক স্বর্ণময় বেদীর উপর সীতা অবস্থান করছেন। অভাগিনী পতিবিরহকাতরা সীতার মুখ বিবর্ণ ও শুষ্ক। চেড়ীকুল-বেষ্টিত অবনতশির সীতা যেন দুঃখের এক প্রতিমূর্তি!

হৃদয়ে পতির চিন্তাই তাঁর সর্বক্ষণের সাথী। সীতার দৃঢ় বিশ্বাস যে রাবণ বল প্রয়োগ করে তাঁর মতো সাধ্বী রমণীকে হরণ করলেও, কামনার পরিতৃপ্তির জন্য সীতার পবিত্র দেহকে স্পর্শ করতে কখনই সাহসী হবে না।

তথাপি, সীতার মনে সব সময়েই এক উদ্বেগ। অবাঞ্ছিত রাক্ষসী সঙ্গিনীরা সর্বদাই তাঁর মধ্যে রাবণের ঐশ্বর্য, সম্পদ, শক্তি প্রভৃতির প্রতি প্রলোভন জাগিয়ে রাবণের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বলছে। বার বার এবং বিভিন্ন ভাবে ও কৌশলে তারা রাবণের প্রশস্তি ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে সীতাকে রাক্ষসরাজের পত্নীত্ব স্বীকার করতে অনুরোধ করে যাচ্ছে।

সময় সময় তারা ক্রুদ্ধা সর্পিনীর মতো সীতাকে ভয় দেখাতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে না। সীতার উপর অনেক নির্যাতন হবে, একথা জানাতেও পশ্চাদপদ হচ্ছে না।

এই কুৎসিত ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতির রাক্ষসীদের নিরন্তর বাক্যযন্ত্রণায় এবং মানসিক পীড়নে, সীতা মাঝে মাঝে গভীর ক্লান্তি ও ক্লেশ অনুভব করেন। অশোকবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যেও সমগ্র পরিবেশটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর ও শ্বাসরোধকারী বলে বোধ হয়।

সেই মুহূর্তে আপন বিলাসকক্ষে বিভীষণের সঙ্গ পরিত্যাগ করে কোন অনুচরীর ইঙ্গিত অনুসারে রাবণ সকালের পূজার বেশেই আকস্মিকভাবে সীতার সন্নিধানে উপস্থিত হন। সীতাকে দূর থেকে লক্ষ্য করে রাবণ অনুভব করেন যে বোধহয় সীতা তার ভাগ্যের এই অপত্যাশিত পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিয়ে রাবণের প্রস্তাবই শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করবে।

কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটি রিপুই রাক্ষস রাবণের দেহের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। তাই রাবণ সীতার সম্বন্ধে শেষ চেষ্টা করতে কৃতসংকল্প। রাবণের চোখের সম্মুখে মর্তের এই জীবন্ত বিদ্যুৎশিখা রাবণের মনে ও প্রাণে কামনার শিহরণ আনে। আশাহত হয়েও রাবণকে আশা করতে প্ররোচিত করে।

কৃতাঞ্জলি হয়ে রাবণ সীতাকে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'সীতা, লঙ্কাধিপতি রাবণ তোমাকে হৃদয়ে একেশ্বরীরূপে প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। তুমি তার এই আন্তরিক আবেদনে সাড়া দাও। তুমি রাবণের শক্তি এবং ঐশ্বর্য সবই নিজের চোখে দেখেছ। স্বল্পায়ু, দীন ও দুর্বলচরিত্র রাম এক সাধারণ মানুষ। সে কখনই তোমার তুল্য অলৌকিক রূপলাবণ্যের অধিকারী নারীর যোগ্য পতি নয়। আমি, রাবণই তোমার একমাত্র সুযোগ্য ভর্তা। তুমি আমাকে গ্রহণ কোরে লঙ্কার অজস্র বিলাস-উপকরণ উপভোগ করার জন্য এই বিশাল রাজ্যের রাণী হও। আমি চিরকাল তোমার আজ্ঞাবহ দাস হয়ে থাকবো। জেনে রেখো, দেব অসুর দানব—কেউই আমার দেহের কোন ক্ষতিই করতে পারে না।'

রাবণ সীতার মুখের ভাবে এই আত্ম-প্রশংসার কোন প্রতিক্রিয়াই লক্ষ্য করলেন না। মনে মনে নিরাশ হলেও রাবণ সীতার মনস্তুষ্টির জন্য আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'সীতা, তুমিই কর্ত্রীর মতো এই রাক্ষসরাজ্য পালন করবে। বনবাসের সময়ে তোমার পূর্বজন্মার্জিত পাপ সব ক্ষয় হয়ে গেছে। এখন তুমি পুণ্যের অংশটিকে ভোগের মধ্যে

সার্থক করো। তুমি যে লংকার অধীশ্বরী হতে চলছে, এ তোমার পুণ্যের ফল বলেই জানবে।'

রাবণের এই শ্লেষপূর্ণ বাক্যে এবং তাঁর দেবতুল্য পতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের দুঃখে, সীতার হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হয়। সীতা বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করে অশ্রু ত্যাগ করলেন। সঙ্গিনী রাক্ষসীরা রাবণের আকস্মিক আগমনে সচকিত হয় এবং দূরে দাঁড়িয়ে রাক্ষসরাজের প্রেম নিবেদনের দৃশ্যটি উপভোগ করতে থাকে। রাবণের আত্মতৃপ্ত এবং কামনাবিকৃত মানসিকতায় সীতার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। রাক্ষসীদের নির্মম আচরণেও সীতা মর্মাহত হন।

কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের তেজ, এবং আত্মবিশ্বাস সীতার হৃদয়ে যেন এক সীমাহীন নৈতিক বলের সঞ্চার করে। ইতিমধ্যে রাবণ বেদীর উপরে আরোহণ করে ক্রমশঃ সীতার দেহের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

রাবণের এবং নিজের মধ্যে একটি তৃণখণ্ড স্থাপন করে সীতা নির্ভীকচিত্তে বললেন, 'আত্মম্ভরী রাক্ষস, তুমি যার হাতেই নিষ্কৃতি পাও, জানবে যে রামের সঙ্গে শত্রুতা করলে তুমি রক্ষা পাবে না। আমি ধর্মপ্রাণ ক্ষত্রিয়রাজসন্তান রামের ধর্মপত্নী। তুমি পাপী, তোমার দেহ মন, দুইই অপবিত্র। তুমি কোন দিনই আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। ইতর রাক্ষস! তুমি আমার সংজ্ঞাহীন দেহকে বন্ধন বা বধ করো, তাতে আমার ক্ষতি নেই। কারণ, তোমার আশ্রয়ে থেকে আমার বেঁচে থাকার কোন অর্থই হয় না। কিন্তু জ্ঞানতঃ আমি অসতীত্বের অপবাদ অর্জন করতে মোটেই আগ্রহী নই। সুতরাং তোমার অলীক আশাকে ত্যাগ করো।'

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সীতার কমনীয় মুখে এক তীব্র ঘৃণার ভাব প্রকাশিত হলো। সীতার দুটি আয়ত নয়নে যেন আকাশের সূর্যের দীপ্তি। রাবণ সীতার এই অস্বাভাবিক ও ভয়ংকর মূর্তি দেখে বিচলিত বোধ করলেন। রাবণের মনের বল ক্ষীণ হলো। ইঙ্গিতে রাক্ষসীদের সীতার নিকটে আসতে আদেশ দিয়ে, রাবণ ক্ষুণ্ণ মনে অশোকবন ত্যাগ কোরে প্রাসাদের অভিমুখে অগ্রসর হলেন।

* * * *

বালী ও সুগ্রীবের দ্বৈরথ যুদ্ধের আগে, রামের বল ও বিক্রমের এক পরীক্ষামূলক প্রদর্শনীতে সুগ্রীব কোশলরাজ দশরথের পুত্রের অপরিমিত সামর্থ্যের সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেন। রাম যে অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং ইন্দ্রপুত্র বালীর সুযোগ্য প্রতিপক্ষ, এ'কথা সুগ্রীব এবং হনুমান দুজনেই মনে মনে উপলব্ধি করলেন।

রাম প্রথম থেকেই এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে কূট পদ্ধতি অবলম্বন করতে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। রাম, সুগ্রীব ও তাঁর বানরগোষ্ঠীর সহযোগিতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সীতাকে উদ্ধার করতে আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং সুগ্রীবের সঙ্গে পরামর্শ কোরে, রাম সময়সাপেক্ষ সরল পথ আশ্রয় না করে, বরং বক্র পথটিই বেছে নিলেন। লক্ষ্মণও অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে রামকে এই নীতি থেকে বিরত হতে উপদেশ দিলেন না।

বালীর স্ত্রী তারা সেই দিন পতিকে ভ্রাতা সুগ্রীবের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হতে বার বার অনুরোধ করলেন। কিষ্কিন্ধ্যার গুপ্তচর যুবরাজ অঙ্গদকে অযোধ্যার দুই রাজপুত্র, রাম ও লক্ষণের সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হবার সংবাদ এনে দিয়েছিল। কিন্তু বালী আপন ক্ষমতার গর্বে মত্ত, ভ্রাতা সুগ্রীবের উপর ভীষণভাবে বিদ্বিষ্ট। তিনি কোন কথাই শুনলেন না।

ভ্রাতা সুগ্রীব ময়দানবের পুত্র মায়াবীর সঙ্গে বালীর এক দীর্ঘস্থায়ী বিবর-যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে, বালীর নির্গমদ্বার এক বিরাট প্রস্তর খণ্ড দিয়ে রুদ্ধ করেছিলেন। বালীর দৃঢ় বিশ্বাস, সুগ্রীব নিজে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হয়ে ঐশ্বর্য ও নারীসুখ ভোগ করার বাসনাতেই বালীকে পথের কণ্টক হিসেবে উৎপাটিত করতে চেয়েছিল।

কিন্তু সুগ্রীবের কাহিনী ছিল একেবারে ভিন্নমুখী। এক বৎসর বালী গর্তের মধ্য থেকে নির্গত না হওয়ায় এবং গর্তের মুখে রুধিরস্রোত প্রবাহিত হওয়ায়, সুগ্রীব জ্যেষ্ঠকে মৃত বলেই ধারণা করেছিলেন। তিনি বালীর পারলৌকিক কাজ করে, কিষ্কিন্ধ্যায় এসে মন্ত্রীদের পরামর্শে রাজপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

বালী শত্রু জয় করে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এসেছিলেন, বৎসরাধিককাল পরে। উগ্রস্বভাব ও শক্তিসচেতন বালী সুগ্রীবকে রাজপদে উপবিষ্ট দেখে, মন্ত্রীদের তিরস্কার করলেন। সুগ্রীবকে বেদম প্রহার করে বিশ্বাসঘাতকার চরম শিক্ষা দিলেন। কিন্তু সুগ্রীবের অভিমতে এতে বিশ্বাসঘাতকতার কোন প্রশ্নই ছিল না।

বালী ছিলেন অসীম দৈহিক বলের অধিকারী। ময়দানবের অপর পুত্র দুন্দুভি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ মহিষের রূপ পরিগ্রহণ করে কিষ্কিন্ধ্যায় এসে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করলে, বালী পর্বতাকার দুন্দুভির শৃঙ্গ ধারণ করে তাকে প্রস্তর, বৃক্ষ প্রভৃতির দ্বারা আঘাতে জর্জরিত করলেন। শেষে দুন্দুভির কর্ণ ও মুখ থেকে রক্তস্রাব আরম্ভ হলে তাকে শূন্যে নিক্ষেপ করেছিলেন।

ঋষ্যমূক পর্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে সেই রক্তাক্ত দেহ পতিত হলে, মুনির অভিশাপের দরুণ বালীকে ঋষ্যমূক পর্বতে যাওয়ার বাসনা ত্যাগ করতে হয়েছিল। কারণ সেখানে গেলেই বালীর মৃত্যু ছিল অবধারিত। বালীর ভয়শূন্য অন্তঃকরণেও মুনির শাপের আতঙ্ক প্রবল ছিল।

কনিষ্ঠ সুগ্রীব জ্যেষ্ঠের শক্তিতে এবং পরাক্রমে ভীত হয়ে বালীর এই নিষিদ্ধ অঞ্চলেই সানুচর বাস করছিলেন। এইখানেই রামের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। সুগ্রীবের সঙ্গে রামের মৈত্রী, অতএব সুগ্রীবের শত্রু রামেরও শত্রু। রামও এই ইচ্ছাই করেছিলেন যে তাঁর শত্রু রাবণ সুগ্রীবেরও শত্রু হবেন।

তাই বালীকে দু'ভ্রাতার দ্বন্দ্বযুদ্ধের মাঝখানে অতর্কিতে বাণবিদ্ধ করে হত্যা করতেও রামের সংকোচ হলো না। অনার্য রাক্ষস এবং বানরের তুলনায় হয়তো ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কোশলাধিপতি দশরথের আদর্শ পুত্র ও সেই কালের শ্রেষ্ঠ বীর রামের এই কাজ কম গর্হিত ও কম নিষ্ঠুর নয়! রামের যুক্তি এই ছিল যে যেহেতু বালী কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রবধূতুল্য পত্নীকে কামাসক্ত হয়ে উপভোগ করেছিলেন, সেই হেতু আর্যবিধি অনুসারে বালী রামের বধযোগ্য।

সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়ে সুগ্রীব নিজের পত্নী রুমাকে নিয়ে মত্ত থাকলেন। তারাকেও প্রচলিত সামাজিক নিয়ম মতো বিবাহ করলেন। বালীর অন্তিম বাসনা অনুযায়ী সুগ্রীব অঙ্গদকে যুবরাজ রূপে ঘোষণা করে তাঁকে পুত্রের মতো পালন করতে লাগলেন।

বালী ও সুগ্রীবের চরিত্রে অমিলই ছিল প্রচণ্ড বেশী কিন্তু মিল ছিল কেবল এক স্থানে। দুজনেই ছিলেন নারীসম্ভোগের লালসায় আকণ্ঠ মগ্ন। তাই এই অলস ও কর্মবিমুখ প্রবৃত্তির জন্য বানরদের মধ্যে বস্তুগত উন্নতি তখন হয়নি বললেও অত্যুক্তি হয় না। বানরকুল প্রকৃতির সাম্রাজ্যের মধ্যেই নিজেদের সুখ ও জীবন উপভোগের

উপকরণ খুঁজে নিয়েছিল। তাদের অস্ত্রশস্ত্র বলতে ছিল তীক্ষ্ণ নখ ও দন্ত, শিলা, বৃক্ষ প্রভৃতি। ধাতব পদার্থের সঙ্গে তাদের বিশেষ পরিচয় ঘটেনি।

* * * *

পিতা বিশ্রবার তপস্বীসুলভ সাত্ত্বিকতার ভাবটি বিভীষণ তাঁর পিতার আশীর্বাদেই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। তাই রাক্ষস মাতামহ ও মাতার স্নেহে ও শাসনে লালিত পালিত হলেও, বিভীষণ চিরদিনই চিন্তাশীল, মৃদুভাষী। বিভীষণ শিবপূজার বিরোধী না হলেও বিষ্ণুই তাঁর প্রিয় দেবতা। সেই কারণে বাহিরে ও অন্তরে তিনি বিষ্ণুর অনুরাগী।

বিভীষণ এমনকি জ্যেষ্ঠ রাবণের চোখেও যেন মূর্ত জ্ঞান। রাবণ অন্তরে জ্ঞানী, তাই বিভীষণের বাহিরের স্বরূপটা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয় না।

কিন্তু রাবণ হয়তো কনিষ্ঠের ভিতরের ভক্তটির প্রকৃত পরিচয় পান নি। বিভীষণ সে সুযোগ রাবণকে কেন, অনেককেই দেন নি। বিভীষণের অন্তঃকরণের বিষ্ণুভক্তির ফল্গুধারায় অবগাহন করেছেন পত্নী সরমা। কিশোর তরণীসেন অপরিণতবুদ্ধি হলেও পিতার হৃদয়ের এই মধুর ভক্তিরসের কিছু স্বাদ লাভ করেছেন। রাণী মন্দোদরীর চোখে, বিভীষণ প্রজ্ঞা, নম্রতা এবং শিষ্টতার এক প্রতিমূর্তি!

রাবণ সীতাকে অংকশায়িনী করতে সক্ষম হন নি। বিভীষণ চিন্তা করেন যে রাবণের পরনারীলোলুপতার মানসিকতায় সীতাকে দৈহিকভাবে উপভোগ না করার গূঢ় রহস্যটি কি? কেন রাক্ষসরাজের মোহগ্রস্ত ও কামনাবিদ্ধ আঁখি দুটি সীতার অসামান্য রূপলাবণ্য পান করলেও, তাঁর পাপপঙ্কিল হাত দুটি সীতাকে স্পর্শ করতে উদ্যত হচ্ছে না? বিভীষণের মনের মধ্যে এক প্রশ্ন—শুধু রাবণের নৈতিক সততাই তাঁর পাশবিক প্রবৃত্তিকে সংযত করে রেখেছে, না, অন্য কোন আপাতঃ অবোধ্য কারণ আছে!

প্রতিদিন অপরাহ্ন বেলায় সরমা পতিকে বৈকালিক ভ্রমণের এবং সান্ধ্য উপসনার জন্য প্রস্তুত হতে লক্ষ্য করেন। বেশভূষায় বিভীষণ অমনোযোগী না হলেও, তিনি আড়ম্বরপ্রিয় নন। দেহে স্বচ্ছ রেশমবস্ত্র ও উত্তরীয়, গলায় কণ্ঠী, কপালে শ্বেত চন্দনের ছাপ—এই ভাবেই বিভীষণ কক্ষ থেকে নির্গত হন। মণি ও মানিক্য শোভিত শ্বেত প্রস্তরের সোপানাবলী দিয়ে নেমে গিয়ে বিশাল প্রাসাদ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করেন, বিভীষণ। তখন সরমা এক দৃষ্টিতে স্বামীর গমনপথের প্রতি লক্ষ্য করেন।

তার পরে সরমা কিছুক্ষণ অলিন্দ থেকে প্রাসাদের বহির্দেশের ও পারিপার্শ্বিক নয়নলোভন দৃশ্যাবলী নিরীক্ষণ করেন। তখন তাঁর মনে হয়, হায়, যদি গৃহের বাতায়ন থেকে অথবা অলিন্দের নীচে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়ে প্রাচীরের উপর দৃষ্টি প্রসারিত করে সীতাকে দেখতে পেতেন তিনি!

আজ এই সময়ে বিভীষণকে একাকী কক্ষের অলিন্দে পদচারণা করতে দেখে, সরমা ঈষৎ বিস্মিত হন। বিভীষণের আহ্বানে সরমার কল্পনার জাল ছিন্ন হয়। সরমা দ্রুতপদে পতির পাশে উপস্থিত হন।

অপরাহ্ন বেলায় অস্তপ্রায় দিবাকরের শেষ রশ্মি স্বর্ণলংকার রত্নমণ্ডিত সৌধ শ্রেণীর সুবর্ণচূড়ায় প্রতিফলিত হয়। লংকাপুরীর উত্তরে সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গর্জন যেন উত্তাল-তরঙ্গ-তাড়িত বায়ুস্তরকে ভেদ করে প্রাসাদ দুর্গের সুদৃঢ় বেষ্টনীতে প্রতিহত হয়। পশ্চিম গগনের রক্তাভ বৃত্তটি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে সমুদ্রে লীন হয়। সরমা এই দিনান্তের প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে নিজেকে বিস্মৃত হন।

সরমার নৈকট্য অনুভব করে অথচ সরমাকে নিস্তব্ধ লক্ষ্য করে বিভীষণ কিছু পরিমাণে বিস্মিত হন। সরমা যে তাঁর সরল হৃদয়ের মধ্যে সীতার মনের অপ্রকাশিত বেদনাকে সর্বদা স্মরণ করছেন এবং সীতার ম্লান ও অসহায় মূর্তিটি সর্বদা ধ্যান করছেন, বিভীষণ স্পষ্টভাবে তা না বুঝলেও, হয়তো অনুমান করতে পারেন। সীতার দুঃখে ও শোকে সরমাকে ম্রিয়মাণ বলে বোধ হয়।

সরমা পতির ক্লেদহীন অন্তঃকরণের মধুর স্পর্শ বহুলভাবেই পেয়েছেন। বিভীষণের মুখে একসঙ্গে বিস্ময় এবং বিষাদের ভাব লক্ষ্য করে সরমা উদ্বিগ্ন বোধ করেন। এখনও কেন সরমা স্বামীর প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণ থেকে বঞ্চিত রয়েছেন, সরমা উপলব্ধি করতে পারেন না।

পতি ও পত্নীর এই মানসিক অচল অবস্থা দু'জনের মনেই কৌতুকের উদ্রেক করে। বিভীষণ স্মিত মুখে বললেন, 'সরমা, তুমি কিছু বলছো না যে বড়। আমি তোমায় ডাকলাম, তাও তুমি এসে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?'

সরমা বিভীষণের বাক্যের উত্তরে লঘু পরিহাসের সুরে বললেন, 'প্রভু, সরমাকে কি আপনি সব সময়ে মুখরাই দেখেন। আমি তো আপনার কাছ থেকেই কিছু শুনবো ভেবে আপনার ডাকে সাড়া দিতেই চলে এসেছি।'

সরমার সপ্রতিভ অথচ বিনম্র বচনে প্রীত হয়ে বিভীষণ বললেন, 'সরমে, তোমার লজ্জা, নম্রতা, বিনয় সবই আমার কাছে আকর্ষণীয়। জানো, সরমা, আমার এক এক সময়ে কি মনে হয় ? তুমি আমার পাশে না থাকলে, আমি বোধহয় কোন কিছুই করতে পারতাম না, এমনকি তরণীকেও উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা দিতে পারতাম না। তুমি আমার জীবনে শান্তি ও প্রেরণা দুইই এনেছ।'

বিভীষণের চোখে ও মুখে আন্তরিকতার এবং প্রেমের এক সহজ বিকাশ ঘটে। সরমা মন্থর পদে স্বামীর দেহলগ্ন হয়ে, বিভীষণের উজ্জ্বল আননের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

ভার্যার কমনীয় তনুটি ডান হাতে বেষ্টন করে বিভীষণ মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'প্রিয়তমে, চলো আমরা প্রকোষ্ঠের ভিতরে যাই। তোমার সঙ্গে কিছু গুরুতর পরামর্শ আছে।'

গুরুতর পরামর্শ ! সরমা ভেবে আকুল হন যে পুনরায় কি বিপদ ঘটলো ! যদি কিছু অঘটন ঘটে থাকে, তবে তা সীতাকে কেন্দ্র করে নিশ্চয়। সীতার মতো সতী ও সাধ্বীর ক্ষোভ ও মনের দুঃখ কি রাক্ষসদের কোন অমঙ্গল করবে না ! সীতা তো ক্ষাত্রিয়পুঙ্গব মহাবীর ও মহাগুণী রামের প্রিয়তমা ভার্যা।

সরমা সংকুচিত চিত্তে পালঙ্কে বিভীষণের পাশে এসে বসলেন। প্রকোষ্ঠ উজ্জ্বল দীপালোকে আলোকিত। মূল্যবান আসবাবের কোন বাহুল্য নেই। গৃহের অভ্যন্তরে দেওয়ালে নানা বর্ণের চিত্রাংকন যা লংকার রাক্ষসকুলের সুরুচির পরিচায়ক।

বিভীষণ কিছু বলার আগেই সাময়িক ভাবপ্রবণতায় আক্রান্ত হন। স্বামীর দেহের ও মুখের উত্তেজিত ভাবটি সরমাকে চঞ্চল করে। অল্প সময়ের মধ্যেই বিভীষণ নিজেকে সংযত করেন।

সরমার কোমল করপল্লবদুটি হৃদয়ের আবেগে স্পর্শ করে মৃদু স্বরে বিভীষণ বললেন, 'প্রিয়ে, তুমি বুঝতেই পারছো যে লংকার উপর কি ভীষণ বিপদ ঘনিয়ে আসছে। সরমা, আমার মন বলছে যে এবার রক্ষপতির আর রক্ষা নেই। আমার মনে হয়,

আর্যশ্রেষ্ঠ রামই বোধহয় রাবণের নিয়তি। একথা রাবণ নিজেও উত্তমরূপেই জানেন। এখনও পর্যন্ত সীতার দেহকে কলঙ্কিত করার স্পর্ধা রাক্ষসরাজের হয় নি, হবে বলে মনেও হয় না। অথচ, সীতাকে ভোগ করার নির্লজ্জ লালসায় তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ। রামের সঙ্গে শত্রুতা করার চরম বাসনাই লঙ্কেশ্বরকে এই ঘৃণ্য ও নীচ উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য করেছে। আমরা না চাইলেও, এই অন্যায়ের প্রতিফল তিনি পাবেনই, এই আমার স্থির বিশ্বাস। হয়তো নিজের জীবন দিয়েই রাবণকে এই ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে!'

সরমা বিভীষণের মুখের উপর নিজের ডান হাতটি ধরে রেখে আর্ত কণ্ঠে বললেন, 'এমন অকল্যাণকর ও অলক্ষণের কথা উচ্চারণ করবেন না, প্রভু। রক্ষপতি না থাকলে রাক্ষসকুলের কি গতি হবে! মহারাজ্ঞী মন্দোদরীর অদৃষ্ট কি এতোই মন্দ হবে, নাথ।'

—'কেন সরমা, রাবণ তো অমর নন যে মৃত্যুকে চিরদিন জয় করবেন। কিন্তু তা বলে রাক্ষসকুলকে ধ্বংস করার অধিকার তাঁকে কেউ দেয় নি। তিনি আমার উপদেশ অবজ্ঞা করে ফেলে দিতেও পারছেন না, অথচ উপদেশ মতো কাজও করছেন না। আমি শেষ চেষ্টা করবো সরমা, তুমি কিছুমাত্র শঙ্কিত হয়ো না! আমি আমার মাতৃভূমিকে, আমার স্বদেশবাসীকে কারোর চেয়ে কম ভালোবাসি না।'

—'তা আমি জানি প্রভু। কিন্তু রাক্ষসরাজ যদি এখনও সীতার প্রতি সুবিচার না করেন, তবে রামের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হবেই। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে রাম সীতাকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করবেনই। এত দুঃখের মধ্যেও সীতা আমাকে এই কথাই বলেন। আমি তাঁর হৃদয়ের একনিষ্ঠ পতিপ্রেম এবং পতির শক্তির উপর গভীর প্রত্যয় দেখে বিস্মিত না হয়ে পারি না।'

সরমার কথায় উৎসাহিত বোধ করে বিভীষণ বলেন, 'সরমা, রাবণের ভবিতব্য আমি আমার দূরদৃষ্টির সাহায্যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। জানো তুমি, আমার মনে মাঝে মাঝে সংশয় হয় যে শেষ পর্যন্ত আমি লঙ্কায় রাবণের সংসর্গে স্থায়ীভাবে থাকতে পারবো কি না! যদি অন্যায় এবং অধর্ম অপ্রতিহত গতিতে লঙ্কাকে অধিকার করে, যদি লঙ্কার অধিপতি রাক্ষসদের মঙ্গলকে উপেক্ষা করে সেই পথেই চলেন, তবে আমি কেমন করে শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বজায় রাখবো?'

সত্যনিষ্ঠ বিভীষণের অকপট উক্তিতে সরমার হৃদয়ে এক অজ্ঞাত আশঙ্কার স্রোত প্রবাহিত হয়। সরমা বিভীষণের হাতদুটি আপন বক্ষের উপর স্থাপন করেন। মুখে গভীর উদ্বেগের চিহ্ন বিকশিত হয় সরমার।

বিভীষণ পত্নীর মুখের ভাববৈচিত্র্য লক্ষ্য করে সান্ত্বনার সুরে বলেন, 'সরমে, তুমি এখনই এতো বিচলিত হয়ো না। তুমি নিশ্চয় জানবে যে তোমার স্বামী নিজের ভালোর জন্য দেশের রাজাকে ও দেশকে ত্যাগ কখনই করবে না। কিন্তু যেখানে নীতির প্রশ্ন থাকে, সেখানে নীরবে ও বিনা প্রতিবাদে অন্যায়কে মেনে নেওয়া যায় না। রামের সঙ্গে রাবণের বিরোধে, রামের জয় অবধারিত বলেই আমার ধারণা। আর্যদের অগ্রগতি কেউই রোধ করতে পারবে না। আর, রাম মানুষ এবং এই মানুষ রামের হাতেই হয়তো রাবণের মৃত্যু হবে। রাবণ এখন না জানলেও ক্রমশঃই বুঝতে পারবেন যে রাম মনুষ্যরূপী হলেও সাধারণ মানুষ নন।

—'প্রভু, তবে কি হবে শেষ পর্যন্ত? আমার মন আপনার কথার মতোই রাক্ষসদের অশুভ পরিণামের বিষয় চিন্তা করে বিষণ্ন হচ্ছে। প্রভু, আপনি আমাদের ত্যাগ করবেন

না। আপনি পাশে না থাকলে রক্ষপতিকে কেউই সংযত করতে পারবে না। রাক্ষসদের আত্মবিশ্বাসের আধিক্য এবং দম্ভই তাদের পতন ঘটাবে।'

সরমার মুখের করুণ ভাবটি বিভীষণের হৃদয়ে অনুকম্পার সঞ্চার করে। বিভীষণ পত্নীকে আশ্বস্ত করতে দয়ার্দ্র চিত্তে বলেন, 'প্রিয়তমে, তোমাদের ত্যাগ করার মতো দুর্দিন উপস্থিত হলে, আমার হৃদয়ও কি বিদীর্ণ হবে না! আমার প্রাণাধিক প্রিয় তরণী তার মাতৃভুমির জনাই উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। তুমি জানো কিনা আমি জানি না, তরণী ভীষণভাবে রামের গুণমুগ্ধ। রামের মতো স্বেচ্ছায় এত দুঃখ, এত ক্লেশ কে বরণ করে নিয়েছে! ক্ষাত্রিয় রাজসন্তান হয়েও এত বড় আত্মত্যাগ কে করেছে? আর রামের মতো পৃথিবীতে আর কেই বা এমন অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে! জনস্থানে রাক্ষসদের নিধন রাম প্রায় এককভাবেই করেছেন, লক্ষ্মণের সাহচর্যে। তরণী মনে করে, রাম সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন এবং সফলও হবেন।'

সরমা উত্তমরূপেই পুত্রের মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত আছেন। অবশ্য স্বামী এখন পুত্রের সঙ্গে নিজের মনের কথাটিও ব্যক্ত করতে পারেন। বিষ্ণুর প্রতি স্বামীর অবিচলিত নিষ্ঠা আশ্চর্যজনকভাবে স্বামীর হৃদয়কে রামের নিকটে নিয়ে আসছে। রামের প্রতি বিশেষ নৈকট্য অনুভব না করলে, স্বামী রক্ষপতিকে ত্যাগ করার কথা কল্পনাই করতে পারতেন না। স্বদেশ ও স্বজনকে ভালো না বাসলে, লংকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এত উদ্বিগ্ন হতেন না!

সরমার এই নূতন ভাবনা বিভীষণের পরবর্তী ভাষণের প্রভাবে ব্যাহত হলো। বিভীষণ সরমার মাথায় হাত রেখে আবেগময় কণ্ঠে বললেন, 'সরমা, প্রিয়তমে, যদি জীবনে কখনও কোন সুদিন আসে, তা আসবে অনেক বাধা ও বিপত্তি পেরিয়ে, অনেক শোকের সাগর সাঁতার দিয়ে। আমি লংকায় রবেণের নিঃস্বপত্ন আধিপত্যই কামনা করি। মহাজ্ঞানী, মহাবীর রাবণ রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নেই। তাই তো আমি এখনও আশা করছি যে রাবণ সীতাকে সসম্মানে রামকে প্রত্যর্পণ করে আর্য সংস্কৃতির প্রতীক রামের সঙ্গে সখ্যের সম্পর্ক রচনা করবেন। শেষ পর্যন্ত আর্য ও রাক্ষসদের মধ্যে মিলনের সেতু রচিত হবে।'

সরমা পতির মনের আবেগকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবে নত মুখে অপেক্ষা করলেন। বিভীষণও স্তব্ধ হয়ে গবাক্ষপথে তারকাখচিত মেঘহীন অম্বরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য এসে প্রশস্ত মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করলো। বিভীষণ পাশে উপবিষ্ট সরমার সুষমাপূর্ণ দেহলতাটিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে, ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ কোরে সোপান শ্রেণীর অভিমুখে অগ্রসর হলেন।

* * * *

ত্রিকুট পর্বতে অবস্থিত কণকময় লংকাপুরীতে রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ অপরাহ্ন-বেলায় প্রাসাদশীর্ষে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের বেলাভূমির দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন। সমুদ্রের তীর সম্পূর্ণভাবে নির্জন ও পরিত্যক্ত নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য তরী মৎস্যজীব, সুক্তি আহরণকারী এবং পণ্যবাহী বণিকদের বহন করে লংকার কুলে উপনীত হচ্ছে; পুনরায় সাগরের মধ্যে অদৃশ্য হচ্ছে। ঐশ্বর্য এবং প্রতিপত্তির সৌধচূড়া থেকে যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ এই সাধারণ রাক্ষসদের জীবনের দুঃখ ও দৈন্যের সংবাদ রাখতেন না।

লংকাদ্বীপে সকলেই ধনী নয়। রক্ষরাজ রাবণের অগণিত প্রজাবৃন্দ প্রাসাদ-

দুর্গের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে বাস করতো। সেই কারণে সাগরকূল থেকে পর্বতের সানুদেশ পর্যন্ত সমতল ভূভাগে অসংখ্য রাক্ষসের বাসের উপযুক্ত সাধারণ আবাসভবন নির্মিত হয়েছিল। প্রশস্ত রাজপথে সারিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণী, পুষ্পে ও ফলে শোভিত। চারটি প্রধান রাজপথ এসে পর্বতস্থ প্রাসাদের চারটি প্রান্তীয় মুখ্য দ্বারে মিলিত হয়েছিল।

রাজপুত্র ইন্দ্রজিতের মনে এখন অন্য চিন্তা। সুন্দরী পত্নী নবীনা প্রমীলাকে কেমন-ভাবে সন্তুষ্ট করবেন, কেমনভাবে বিদুষী ও বুদ্ধিমতী প্রমীলার মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করবেন। যুবরাজের মনের মধ্যে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রবল আলোড়ন!

প্রমীলা শান্ত পদে কখন এসে পশ্চাতে দাঁড়িয়েছেন, ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্য করেন নি। প্রমীলা কৌতুক করার এই সুযোগটি নষ্ট করলেন না।

স্বামীর দেহটিকে দুই বাহুতে বেষ্টন করে প্রমীলা মধুর কণ্ঠে বললেন, 'প্রিয়তম, তুমি এখন আমার বন্দী। আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ না করলে তোমার মুক্তি নেই।'

প্রমীলার কোমল হাতের স্পর্শে ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে ইন্দ্রজিতের দেহ রোমাঞ্চিত হলো। ইন্দ্রজিৎ তৎক্ষণাৎ দিক পরিবর্তন করে প্রমীলাকে নিজের দুই সবল বাহুতে বন্ধ করলেন। প্রমীলা মুহূর্তের মধ্যে বীর ললনার দৃঢ় মনোভাব পরিত্যাগ করে সহাস্যে নিজেকে পতির নিকট সমর্পণ করলেন।

ইন্দ্রজিতের নয়ন দুটিতে মোহব আবেশ। ইন্দ্রজিৎ দয়িতার সুকুমার দেহলতাটি নিজের বক্ষের উপর আবর্ষণ করে উদাস কণ্ঠে বললেন, 'প্রমীলা, এখন তুমি আমার বন্দী না আমি তোমায় বন্দী? এখন তুমি আমার প্রেমের নিগড়ে বাধা পড়েছো। মুক্তি পেতে গেলে এখন তোমাকে উচ্চ মূল্য দিতে হবে।'

ইন্দ্রজিতের সরস আচরণের প্রভাবে প্রমীলার যৌবনদৃপ্ত অঙ্গে এক অদ্ভুত শিহরণ। স্বামীর আলিঙ্গনকে সর্বতোভাবে উপভোগ করে প্রমীলা আবেগময় কণ্ঠে বললেন, 'উচ্চ মূল্যের ধরনটা কি, তাতো বললে না, যুবরাজ? যদি ব্যক্ত করো, তবে ভেবে দেখতে পারি যে সেই মূল্য দেওয়া আমার সাধ্যের মধ্যে কিনা।'

এক অপূর্ব হাস্য লাস্যময়ী প্রমীলার চোখে ও মুখে পরিব্যাপ্ত হলো। সে হাসিতে তীব্রতা নেই, আছে নিজেকে আরও আকর্ষণীয় ও লোভনীয় করার কৌশল। প্রমীলা স্বামীর মনের অভীপ্সার কথা ভালোভাবেই জানেন।

ইন্দ্রজিৎ নিজেকে শৌর্যে এবং বীর্যে অতুলনীয় মনে করেন। তাঁর দেহগত সৌষ্ঠবে এবং বাহুদুটির শক্তির মহিমায় প্রমীলাও বিশেষভাবে অভিভূত। এমন কি, স্বামীর রূপ, গুণ ও বীরত্বের গর্বে প্রমীলা বেশ গর্বিত। ইন্দ্রজিতের দিক থেকে কি উত্তর আসতে পারে, এখন প্রমীলা মনে মনে তাই চিন্তা করেন।

প্রমীলার মনোহর আকৃতিটি ইন্দ্রজিতের চোখে দ্বিগুণভাবে এক মোহ ও আবেশের সঞ্চার করে। ইন্দ্রজিৎ প্রমীলার শিথিল দেহটি আপন প্রশস্ত বক্ষে নিষ্পেষণ করে, অজস্র চুম্বনে প্রমীলাকে আদর করে আবেগময় কণ্ঠে বললেন, 'প্রমীলা, তোমার দেহের কাছে আমায় নতুন করে চাইবার কিছু নেই। কিন্তু তোমার মনের নাগাল এখনও পেয়েছি বলে মনে হয় না। তাই তোমার কাছে যে উচ্চ মূল্য চেয়েছি তা এই মনের একনিষ্ঠ আসক্তি, যা অবশ্য চাইলেই পাওয়া যায় না।'

—'প্রাণনাথ, তুমি আমার প্রেমকে সন্দেহ করো মনে হচ্ছে! তোমাদের এই রক্ষপুরীতে তোমার তুল্য রূপবান, তোমার তুল্য বীর্যবান কে আছে? তবে, আমি

ওই অশোকবনে সীতার মতোও হতে চাই না। সর্বস্ব খুইয়ে অন্যের হাতে পড়েও এখনও কেবল পতির ধ্যান ও জ্ঞানে আকুল হয়ে আছে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। মানুষগুলো এই সামান্য কথাটাও যে কেন বুঝতে পারে না!'

—'তার মানে, আমার চেয়ে কোন যোগ্যতর ব্যক্তি যদি তোমাকে আমাদের সীমানার বাইরে অন্য কোথায়ও নিয়ে চলে যায়, তুমি তা হলে সেই ব্যক্তিরই ভজনা করবে?'

—'এ'কথা আমি কল্পনাই করতে পারি না। তুমি আমাকে সন্দেহ করলেও, আমি পারি না। আমি চিরদিন তোমার বুকের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে চাই। কিন্তু লংকায় এই সীতা আসার পর থেকেই একটা উত্তেজনার ঢেউ সকলের মনের মধ্যে। কি জানি, এর মধ্যে কি অশান্তির বীজ লুকিয়ে আছে!'

প্রমীলার কথায় আশ্বস্ত বোধ করে এবং প্রমীলার ভাবপ্রবণতায় বিস্মিত না হয়ে ধীরভাবে বললেন, ইন্দ্রজিৎ, 'প্রমীলা, অনর্থক উদ্বিগ্ন হয়ো না। আমার বীর ও বিচক্ষণ পিতা অনায়াসেই এই সমস্যার সমাধান করবেন। আমাদের রাক্ষসদের সমাজে এই সব ব্যাপার কিছুই নতুন নয়, এই সব সাময়িক উত্তেজনাও কিছু বিচিত্র নয়। আমাদের জীবনের পূর্ণতাই আনন্দ উপভোগের মধ্যে এবং বীরত্ব প্রকাশে। তুমি দেখে নিও, এতে আমাদের কোন ক্ষতিই হবে না।'

ইন্দ্রজিৎ স্তব্ধ হয়ে হঠাৎ নিজের মনেই বলে উঠলেন, 'রাক্ষসেরা কনিষ্ঠতাত বিভীষণের সাত্ত্বিক আচরণকে ঘৃণা ও বিদ্রুপের চোখে দেখে।'

ইন্দ্রজিতের এই অস্ফুট উক্তি সরমার শ্রুতিগোচর হয় নি। সরমা সেই মুহূর্তে অন্য চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন বোধ হয়। সীতার নিগ্রহে প্রমীলাও মনে মনে অখুসী। কিন্তু প্রমীলার ধারণায় সীতা এক আত্ম-বিসর্জন ব্যতীত এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন না। কিন্তু রাক্ষস মানসিকতায় এই আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার বিষয়টি-আত্মসুখের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য। সুতরাং প্রমীলার নারীহৃদয়ও সম্পূর্ণভাবে সীতার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারে না।

প্রমীলা পতির এবং শ্বশুরের গুণ, গরিমা এবং বীরত্বের প্রতি অতিশয় প্রত্যয়পূর্ণ। রাবণ প্রমীলার চোখে এক বিরাট শক্তিমান ও জ্ঞানবান পুরুষসূর্য। রাবণের পরনারীর প্রতি লোলুপতা রাক্ষসচরিত্রের এক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য মাত্র, যদিও লংকার রাক্ষসকুলের রাজবংশীয় পুরুষেরা কেউই নারী হরণে লিপ্ত হন নি। কিন্তু এক বিভীষণ ব্যতীত বোধ হয় অন্য সকলেই পরনারীর দেহ উপভোগে সিদ্ধহস্ত। প্রমীলা এও জানেন যে তাঁর পতিদেবতা পিতৃব্য বিভীষণের সাত্ত্বিকতার নির্মম সমালোচক।

প্রমীলা ইন্দ্রজিতের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সহজভাবে বললেন, 'প্রাণেশ্বর, তুমি যা বলেছ, তাইই যেন হয়। সেই অযোধ্যার নির্বাসিত রাজপুত্র, ভিখারী রাম, কোনদিনই তার স্ত্রীকে ফিরে পাবে না। সুতরাং সীতাকে শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্যকে মেনে নিতেই হবে। সীতাকে তোমার পিতা অগ্রমহিষীর পদ দেবেন বলে প্রলোভন দেখিয়েছেন। তুমি কি মনে করো সত্যই সীতা রূপে ও গুণে অগ্রমহিষী হবার উপযুক্ত?'

প্রমীলার প্রশ্নে ইন্দ্রজিৎ ঈষৎ সংকুচিত বোধ করেন। পিতার এই জাতীয় কার্য-কলাপ সম্বন্ধে কোন আলোচনা তাঁর অভিপ্রেত নয়। পিতা রাবণ তাঁর নিকট বীর হিসেবে এবং রাজা হিসেবে এক আদর্শ পুরুষ।

প্রমীলাকে নিরুৎসাহিত করতে ইন্দ্রজিৎ তৎক্ষণাৎ উত্তর করেন, 'প্রমীলা, প্রিয়তমে,

তোমার কি আমার শৌর্য ও বীর্যের সম্বন্ধে মনে কোন সন্দেহ আছে! তা যদি না থাকে, তবে এক সামান্যা মানবীর সম্বন্ধে আমাদের এত চিন্তার কি আছে। তবে তুমি এও জেনো যে মাতা মন্দোদরী বেঁচে থাকতে, এই সামান্যা নারী, তার যত রূপ এবং গুণই থাক না, কোনদিনও লংকার প্রধানা মহিষীর পদ পাবে না। এক মানবী এই রাক্ষসপুরীতে কোনদিনই আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না।'

ইন্দ্রজিতের শেষ কথাগুলি প্রমীলা মনে মনে বিবেচনা করে স্বামীর যুক্তির গভীরতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেন। সমুদ্র থেকে উত্থিত নিরন্তর বায়ুপ্রবাহ প্রমীলার কেশ ও বস্ত্রকে সঞ্চালিত করে, ইন্দ্রজিতের চোখে তাঁকে আরও লোভনীয় করে তুলছিল। প্রমীলার সৌষ্ঠবপূর্ণ গঠন, চটুল দৃষ্টি, আকর্ষণীয় অঙ্গভঙ্গী এই উন্মত্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে ইন্দ্রজিতের চোখে এক স্বপ্নজাল বিস্তার করছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে স্বর্ণলংকার লক্ষ লক্ষ গৃহে দীপালোক প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। দূরে প্রাসাদ-উদ্যানের দেবমন্দির থেকে আরতির ঘণ্টা ধ্বনিত হচ্ছে। ইন্দ্রজিৎ প্রমীলার নিকটে নিজের প্রেমবিহ্বল হৃদয়টি উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যে করদুটি প্রসারিত করলেন। প্রমীলা ধীরে ধীরে স্বামীর দেহসংলগ্ন হয়ে নিজের মস্তকটি তাঁর বক্ষে স্থাপন করলেন। ইন্দ্রজিৎ গভীর আসক্তিতে প্রমীলার চোখে, মুখে, কপালে হস্ত সঞ্চালন করলেন। প্রমীলা আঁখি দুটি নিমীলিত করে, হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগে স্বামীর ওষ্ঠে চুম্বন অংকিত করলেন।

এই নিভৃত মিলনের মধ্যে দুজনেই তাঁদের মানসিক দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে যেন এক কল্পলোকে বিহার করতে লাগলেন। লংকাপুরীর মধ্যে এই দুটি তরুণ ও সতেজ হৃদয়ের মধ্যে কোন বিপদের আশংকা উদিত হয় নি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বালীর বিধবা পত্নী তারার অভিশাপ অহরহঃ রামের কর্ণের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—'সীতাকে পেয়েও তুমি তাকে হারাবে, অবশিষ্ট জীবন সমগ্র বান্ধবদের মধ্যে থেকেও তোমার একাকীত্ব ঘুচবে না।'

এই নির্দয় অভিসম্পাতের পরিণাম চিন্তা করে রাম মনে মনে শিহরিত হন। সীতাকে হারানোর যে বেদনা এখন তিনি সহ্য করছেন, সীতাকে উদ্ধার করবেন, এই আশায়; সেই বেদনা যে শতগুণে বর্ধিত হয়ে অসহনীয় মর্মযন্ত্রণায় পরিণত হবে সীতার অকাল প্রয়াণে! এই অবাঞ্ছিত দৃশ্য যেন রাম মানস চক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। এই তিক্ত চিন্তা রামের বিরহ জ্বালাকে বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণায় রূপান্তরিত করে।

ক্ষণকাল পরে আত্মস্থ হয়ে রাম ভাবেন যে দৈবই সর্বদা প্রবল। তবুও আগে রাবণের কবল থেকে সীতাকে মুক্ত করে আনতে হবে।

সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপিত হবার পরে প্রায় দু'মাস অতীত হয়েছে। রাম, লক্ষ্মণকে নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যার নিকটে প্রস্রবণ পর্বতে বর্ষা অতিবাহিত করতে মনস্থ করেছিলেন। বৃক্ষ এবং লতা-গুল্মে আবৃত এক স্থানে একটি গুহায় তাঁরা অবস্থান

করছিলেন। রামের দুঃখ ও কষ্টের প্রতি সুগ্রীবের ঔদাসীন্যে লক্ষ্মণ অত্যন্ত রুষ্ট হন। রামের সম্মুখে সুগ্রীবকে অকৃতজ্ঞ, অসভ্য, অনার্য প্রভৃতি বলে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

রাম নিঃশব্দে রোদন করেন। তারার অভিশাপের রূঢ়তায় জর্জরিত হয়ে নিজের অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই চিন্তা করেন অভিশাপ যাই হোক, সে তো অনিশ্চিত। অভিশাপ যে সত্যই রামের জীবনে সত্য হয়ে উঠবে, এমন না হতেও পারে। কিন্তু সীতাকে দুষ্ট রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করতে না পারলে জীবনই বৃথা।

বর্ষা প্রায় অতিক্রান্ত হতে চলেছে। কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীব এখনও নীরব। তিনি যে রামের উদ্দেশ্য সাধনের পথে এক পদও অগ্রসর হয়েছেন, এমন কোন সংকেত অথবা চিহ্নও রাম ও লক্ষ্মণের শ্রুতিগোচর অথবা দৃষ্টিগোচর হলো না!

সুগ্রীবের অবোধ্য নীরবতায় অধীর হয়ে রাম লক্ষ্মণকে কিষ্কিন্ধ্যায় যাত্রা করতে আদেশ দিলেন। লক্ষ্মণের ইতিপূর্বেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। এই চার মাসে সুগ্রীব রামের কুশল সংবাদও গ্রহণ করেন নি।

অঙ্গদের সঙ্গে কিষ্কিন্ধ্যার গুহার মধ্যে প্রবেশ করে লক্ষ্মণ দ্বারদেশে কৃতাঞ্জলি মহাকায় বানরদের অতিক্রম করে সুগ্রীবের রাজধানীর বিশাল হর্মমালা এবং চারদিকে বিক্ষিপ্ত পুষ্পিত কানন, মনোরম সরোবর দেখলেন। বানরদের এই আবাসভূমিতে দেব, গন্ধর্ব, প্রভৃতি বানর ব্যতীত বহুবিধ অন্য প্রাণীর অস্তিত্বও তিনি লক্ষ্য করলেন।

সুগ্রীবের প্রাসাদের অভিমুখে অগ্রসর হবার সময়ে অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গয়, গবাক্ষ, হনুমান, নল, নীল, সুষেণ, তার, জাম্ববান, প্রভৃতি বানর নায়কদের শ্রীসম্পন্ন বাসভবনগুলি লক্ষ্মণের দৃষ্টিগোচর হলো। বানরদের জীবনযাত্রার কাহিনীর প্রথম পৃষ্ঠা যেন লক্ষ্মণের নিকট উন্মোচিত হলো।

অন্যান্য সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করে লক্ষ্মণ সুগ্রীবের অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপনীত হলেন। ক্রোধে লক্ষ্মণের সমস্ত শরীর কম্পিত হচ্ছে। এখনও সুগ্রীবের কোন চিহ্নই নেই। লক্ষ্মণ প্রচণ্ড ক্রোধ ও বিদ্বেষে প্রজ্বলিত হয়ে তাঁর ধনুকের জ্যা আকর্ষণ করে এক ভীষণ টংকার দিলেন।

টংকারের ভয়ংকর শব্দে আকৃষ্ট হয়ে প্রথমেই সুরাপানে প্রমত্ত অবস্থায় তারা উপস্থিত হলেন। লক্ষ্মণের মনের অবস্থা উপলব্ধি করে সুগ্রীবের আদেশে তারা বিচক্ষণতার সঙ্গে বললেন, 'হে মহাবাহু, তুমি অতি নির্মলচরিত্র। তুমি এসো, সুগ্রীবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করো। তুমি কামতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নও। তাই সুগ্রীবের উপর বিরক্ত হয়েছ! সুগ্রীব কামের বশবর্তী হয়ে আমার সঙ্গে এবং তাঁর আগের পত্নী রুমার সঙ্গে আনন্দে কালযাপন করছেন।'

লক্ষ্মণ তারার মিষ্টবাক্যে বশীভূত না হয়ে উষ্মার সঙ্গে বললেন, 'বন্ধু সুগ্রীব রামের উপকারের কথা ভুলে গিয়ে এখন নির্লজ্জভাবে নিজের আমোদ প্রমোদে মত্ত আছেন। বর্ষা অতিক্রান্তপ্রায়। জানকীকে উদ্ধারের কোন চেষ্টাই কিষ্কিন্ধ্যাপতি করেন নি। তিনি এমন অকৃতজ্ঞ তা আমরা ধারণাই করতে পারি নি।'

সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণের রূঢ় অভিযোগ বুদ্ধিমতী তারা খণ্ডন করতে সচেষ্ট হলেন। তারা লক্ষ্মণের রক্তিম আননের প্রতি করুণভাবে দৃষ্টিপাত করে বললেন,— 'হে ক্ষত্রিয়প্রবর, তোমাদের এমন অভিযোগ করার কোন হেতু নেই। সুগ্রীব নিজের

কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। তিনি ইতিমধ্যে তোমাদের কার্য সম্পন্ন করার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহের আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং তুমি সুগ্রীবকে কঠোর বাক্য বলো না।'

তারা লক্ষ্মণকে সৈন্য সংগ্রহের সংবাদ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে, লক্ষ্মণ সুগ্রীবের কক্ষে প্রবেশ করলেন। সুগ্রীব তখন রুমাকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় ছিলেন। লক্ষ্মণ প্রবেশ করতেই সুগ্রীব নিজের সিংহাসন পরিত্যাগ করে এসে কৃতাঞ্জলি হয়ে লক্ষ্মণের সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

লক্ষ্মণ কিছু বলার আগেই সুগ্রীব লক্ষ্মণকে বললেন, 'রাজপুত্র, আমি রামের আজ্ঞাবহ। তিনি আমার যে মহৎ উপকার সাধন করেছেন, তার জন্য আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আমি যদি আমার প্রতি উপকারের আংশিক প্রতিদানও দিতে পারি, তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো। যদি আমি রামের প্রতি কোন অপরাধ করে থাকি তবে আমাকে ক্ষমা করো। আমি মনে করি যে রাম একাই নিজের বল ও বীর্যের সাহায্যে রাবণকে পরাজিত করে সীতাকে উদ্ধার করার পক্ষে যথেষ্ট।'

সুগ্রীবের আন্তরিকতায় লক্ষ্মণের ক্রোধ শান্ত হলো। লক্ষ্মণ প্রীত হয়ে বললেন, 'বন্ধু, তুমি তোমার যোগ্য কথাই বলেছ। কিন্তু তোমরাই এখন আমাদের সহায় এবং সম্বল। তোমাদের সাহায্যেই রাম শত্রুকে বধ করবেন। আমরা দৈবের কৃপাতেই তোমাকে পেয়েছি এবং তুমিই বলে ও বিক্রমে রামের বন্ধু হবার যোগ্য। এখন চলো, রামকে সান্ত্বনা দাও। আমিও যে তোমার প্রতি কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা করো।'

সুগ্রীব লক্ষ্মণকে প্রীতি সহকারে আলিঙ্গন করলেন। উপস্থিত সকলের এবং বিশেষভাবে হনুমানের মুখে এক উদার হাসি বিকশিত হলো।

সুগ্রীব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্মণকে বললেন, 'সুহৃদ্বর, আমি সৈন্য সংগ্রহে ইতিপূর্বেই মনোনিবেশ করেছি। এবার বর্ষা শেষ হলেই সীতাকে অন্বেষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আমার বিশ্বাস যে আমার অনুচরেরা চার দিকে সীতার অনুসন্ধান করে রাবণের সঠিক সংবাদ নিয়ে আসবেই।'

ইতিমধ্যে তারা কখন অগ্রসর হয়ে সুগ্রীবের পাশে দাঁড়িয়েছেন কেউ লক্ষ্য করেন নি। তারা লক্ষ্মণের মুখের পরিবর্তন উত্তমরূপেই লক্ষ্য করেছিলেন।

সুগ্রীবকে তারা ইতিমধ্যেই তাঁর হৃদয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুগ্রীব তারার পুত্র অঙ্গদের প্রতি অপত্য স্নেহের স্বাক্ষরই প্রদান করেছেন। কিন্তু অঙ্গদ যুবরাজ হলেও মনে মনে সগ্রীবের প্রতি সন্তুষ্ট নন। অঙ্গদ বোধহয় তাঁর মাতার আচরণকেও আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন না।

* * * *

সুগ্রীব লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাজকীয় শিবিকায় আরোহণ করে তাঁর সৈন্যবাহিনী-সমেত রামের সন্নিধানে উপস্থিত হলেন। রাম প্রীত হয়ে সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করলেন। রামের মুখে ক্ষোভ ও দুঃখের কোন চিহ্নই নেই।

সুগ্রীব রামের সৌম্য শান্ত মূর্তি দেখে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে বললেন, 'হে সুহৃদ্বর, তুমি দেবতুল্য সৌন্দর্যের ও বীরত্বের অধিকারী। তোমার অনুগ্রহেই আমি রাজ্য পেয়েছি, স্ত্রীকে ফিরে পেয়েছি, তুমি আমার মহান উপকারক। আমিও অধার্মিক নই, আমি তোমার কাজে যথাসাধ্য সহায়তা করবো।'

রাম সুগ্রীবের কথায় বিব্রত ও ব্যথিত হলেন। তিনি সুগ্রীবের প্রতি স্নিগ্ধ দৃষ্টি

নিক্ষেপ করে মধুর কণ্ঠে বললেন, 'সখা সুগ্রীব, তুমি আমাদের পরম হিতৈষী ও সহযোগী। আমি জানি তোমার উদ্যমে ও আন্তরিকতায় কোন ফাঁক নেই।'

রামের প্রশংসাসূচক বচনে সুগ্রীব মনে মনে গভীর হর্ষ অনুভব করলেন। নিজের এবং বানরদের সীতা উদ্ধারের চিন্তায় এখন পর্যন্ত যে কর্মধারা রচিত হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনি রামকে প্রদান করতে আগ্রহী হলেন।

সুগ্রীব উৎসাহের সঙ্গে বললেন—'আমার সঙ্গে যে বানর দলপতিরা এসেছেন, তাঁরা অসংখ্য বানর, ভল্লুক ও গোলাঙ্গুল বীরদের আহ্বান করে এনেছেন। এখনই অন্যান্য নায়কেরা তাঁদের অগণিত অনুচরবৃন্দ নিয়ে উপস্থিত হবেন। বন্ধু, এরা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবে। রাবণবধে সাহায্য করে সীতাকে উদ্ধার করবে।'

সুগ্রীবের এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধূলির ঝড় আরম্ভ হলো। আকাশ যেন সহসা মেঘে আবৃত হয়ে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো। চার দিকে শৈল, বন, উপবন কম্পিত হলো। নানা বর্ণের বিভিন্ন আকৃতির লক্ষ কোটি বানর সৈন্য যেন অজস্র বৃষ্টিধারার মতো নীলাকাশ ভেদ করে ধরণীতে আশ্রয় নিল। কিষ্কিন্ধ্যার সীমা পর্যন্ত সমস্ত অরণ্যভূমি, প্রান্তর ও কাননে, কেবল বানর আর বানর!

লক্ষ্মণ, রামের উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে অপূর্ব সম্প্রীতি ও প্রত্যয়ের এক মিশ্রিত অভিব্যক্তি আবিষ্কার করেন। লক্ষ্মণ অনুমান করেন যে বানররাজ সুগ্রীবের সাময়িক কর্তব্য-শৈথিল্য রাম তাঁর স্বকীয় মহত্ত্বে ইতিমধ্যেই ক্ষমা করেছেন।

সুগ্রীব করজোড়ে রামের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরে একে একে সমস্ত বানর যূথপতিদের সঙ্গে রামকে পরিচিত করলেন। রামের শৌর্য, বীর্য ও বংশগৌরবের স্তুতি কোরে সুগ্রীব তাঁর প্রতি রামের অনুগ্রহ ও উপকারের বিষয় ব্যক্ত করলেন। রাম যে শুধু একজন বিপন্ন ও সম্মানিত অতিথিই নন, রাম যে একজন শ্রেষ্ঠ আর্যক্ষত্রিয় এবং আর্য ও অনার্য সকলেরই প্রশংসা ও অনুকরণের যোগ্য, এই কথাটিও দলনায়কদের জোর দিয়ে বললেন।

সুগ্রীবের বাসনা এই যে বানরেরা যেন রাম ও লক্ষ্মণের সঙ্গে একাত্ম হয়েই রাবণের শত্রুতা করে এবং রামকে তাঁর অভীষ্টসাধনে সহায়তা করে।

এইভাবে রাম ও লক্ষ্মণের সঙ্গে মহবলী সুষেণ, নল, নীল, গবয়, গয়, গবাক্ষ, জাম্ববান, অঙ্গদ প্রভৃতির সঙ্গে অকৃত্রিম সৌহার্দ্য স্থাপিত হলো। সকলের সঙ্গেই বানর সেনা। সকলেই সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে রামের সেবায় নিজেদের নিযুক্ত করতে প্রতিশ্রুত হলেন। রাম তাঁদের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে সকলের কুশল প্রশ্ন করলেন। লক্ষ্মণও বানর নায়কদের আলিঙ্গন করে সৌজন্য বিনিময় করলেন।

হনুমান অল্প দূরে দাঁড়িয়ে এই সমগ্র পরিস্থিতিটি লক্ষ্য করছিলেন। হনুমান রামের আবেগকম্পিত ও শিষ্টাচারসম্পন্ন ভাষণে বিচলিত হয়ে রামের সম্মুখে এসে নতজানু হলেন। হনুমানের মুখে এক স্বর্গীয় কান্তি যা রামের দৃষ্টি অতিক্রম করে নি। হনুমান যেন রামের কৃপাভিক্ষু, যেন রামের কোন উপকার করতে পারলে হনুমানের জীবন সার্থক হবে।

রাম শান্ত পদে অগ্রসর হয়ে হনুমানকে দুই বাহুতে আবদ্ধ করলেন। লক্ষ্য করলেন, হনুমানের আঁখিদুটিতে যেন ভক্ত ও সেবকের গভীর মিনতি। যেন রামের যে কোন আদেশ উচ্চারণ করা মাত্র পালন করতে হনুমানের ক্ষণিকের বিলম্বও হবে না।

রামের বক্ষে এক অপ্রত্যাশিত বল ও বিশ্বাসের সমন্বিত স্পন্দন। হনুমান যেন

সুগ্রীবের অন্য বানর নায়কদের থেকে স্বতন্ত্র—যার সঙ্গে রামের হৃদয়ের মধ্যে এক অদৃশ্য গ্রন্থি সেই মুহূর্তেই রচিত হলো। হনুমানও যেন এই আকস্মিক বন্ধনের গ্রন্থিটির প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করলেন। রাম ও লক্ষ্মণ দুজনেই লক্ষ্য করলেন যে হনুমানের বিশাল নয়নদুটি থেকে বিন্দু বিন্দু অশ্রু নির্গত হয়ে ভূমিতে ঝরে পড়লো।

এই অপূর্ব দৃশ্যটি উপস্থিত সকলেই উপভোগ করলেন। বানরদের যূথপতিরা সকলেই সৈন্যগণকে ইচ্ছামত আহার বিহার ও বলনির্ধারণের আদেশ প্রদান করলেন।

সুগ্রীব আগের দোষ স্খালনের উদ্দেশ্যে ধীরভাবে বললেন, 'সখা লক্ষ্মণ, তুমি আমার কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শনের জন্য উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলে। অবশ্য আমি কয়েক মাস তোমাদের সংবাদ নিতে পারি নি। কিন্তু বানরসুলভ কামপ্রবৃত্তিতে মগ্ন থাকলেও, নায়কগণকে সৈন্য সংগ্রহের আদেশ দিয়েছিলাম। বর্ষার সময়ে আমাদের কিছু করারও উপায় ছিল না। এখন আমি আমার এই দলপতিদের চারটি ক্ষুদ্র দলে ভাগ করে চার দিকে পাঠিয়ে দেব। তাদের প্রথম কাজ হবে, সীতাকে খুঁজে বার করা। অর্থাৎ, রাবণ কোথায় সীতাকে নিয়ে গেছে, সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া। তারপর এই চারটি দলের অনুসন্ধানের ফলাফলের উপর নির্ভর করে, আমরা পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করবো।'

রাম ও লক্ষ্মণ দুজনেই সুগ্রীবের যুক্তি উপেক্ষা করতে পারলেন না। দুজনের মনে সুগ্রীবের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কণাও নেই।

সুগ্রীব হনুমানের উদ্দেশে অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন, 'হনুমান, তুমি পরাক্রমশালী, দেশকালকোবিদ এবং নীতিজ্ঞ। তোমার যেমন শক্তি, তেমন বুদ্ধি। সুতরাং সীতাকে উদ্ধারের প্রকৃষ্ট উপায় তুমিই চিন্তা করো।'

সুগ্রীবের হনুমান-প্রশস্তিতে এবং হনুমানের প্রতি উপায় উদ্ভাবনের দায়িত্ব অর্পণে, রাম অতিশয় প্রীত হলেন। রাম উপলব্ধি করলেন যে হনুমানের বিচক্ষণতার উপর সুগ্রীবের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। রামও সুগ্রীবের সঙ্গে একমত যে হনুমানের যোগ্যতা অপরিসীম। রামের দৃঢ় ধারণা যে সীতার উদ্ধারে হনুমানের ভূমিকা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

* * * *

রাম ও লক্ষ্মণের মতো সুগ্রীবেরও এই বিশ্বাস যে রাবণ সীতাকে নিয়ে দক্ষিণেই গেছে। সুগ্রীব, পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র হয়ে পশ্চিমসমুদ্র পর্যন্ত, পূর্বে প্রাগ-জ্যোতিষপুর পার হয়ে সুমেরু পর্বত পর্যন্ত, উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত এবং দক্ষিণে মহাসাগর পর্যন্ত সীতার অনুসন্ধানের নির্দেশ দিলেন। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিমের প্রত্যেক দলকেই এক মাস সময় দেওয়া হলো। বিলম্ব হলে শাস্তি বধদণ্ড।

হনুমান, যখনই দেখা হয়, তখনই রামের প্রতি আকুল নয়নে দৃষ্টিপাত করেন। যেন যতই দেখেন রামকে, ততোই এই অলৌকিক সৌন্দর্য ও অসামান্য বীরত্বের প্রতিমূর্তি ও দেবপ্রতিম পুরুষসূর্যকে দেখবার আগ্রহ ক্রমেই বেড়ে চলে। হনুমান নিজেকে বিস্মৃত হয়ে এই অপূর্ব নরকলেবরধারীর প্রতি নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকেন। এ যেন কণ্ঠের তৃষ্ণা নেত্রের ব্যাকুলতার মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে হৃদয়ের আর্তির আকারে ভক্তিভাজনের চরণে গিয়ে উপনীত হচ্ছে! হনুমান মনে মনে রামের একান্ত ভক্ত।

হনুমানের সঙ্গে বিশেষ নৈকট্য অনুভব করে রামও স্তব্ধ বিস্ময়ে হনুমানের বিশাল দেহের প্রশান্ত ভাবটি নিরীক্ষণ করেন। লক্ষ্মণ রামের মনের অবস্থা উপলব্ধি করে সুগ্রীব ও হনুমানের উদ্দেশে বললেন, 'রাবণ জানকীকে নিয়ে দক্ষিণে গিয়েছে, এই সংকেত আমরা নানা ভাবেই পেয়েছি। রাবণ লঙ্কার রাজা-এ কথাও শুনেছি। কিন্তু লংকা কোথায় বা কোনদিকে, এ ধারণা আমাদের নেই।'

সুগ্রীব লক্ষ্মণের কথায় উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'বন্ধুবর, কোন ভয় নেই। আমি অবশ্যই অঙ্গদ ও হনুমানকে দক্ষিণের অনুসন্ধান সম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশ দেব, যাতে তাদের পথভ্রম না হয়, যাতে তারা অন্ততঃ সমুদ্র পর্যন্ত গিয়ে সীতাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে পারে।'

এই উক্তির পরে সুগ্রীব সম্ভ্রম সহকারে হনুমানকে বললেন, 'বানরশ্রেষ্ঠ, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সর্বত্রই তোমার অবাধ গতি, কারণ তোমাকে বাধা দেবার সাধ্য কারোরই নেই। তোমরা দক্ষিণে যাবার আগে উৎকল, বিদর্ভ, মৎস্য কলিঙ্গ, দশার্ণ, পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশে অন্বেষণ করে গোদাবরী, কৃষ্ণবেণী প্রভৃতি নদী অতিক্রম করবে। কেরল, মলয় প্রভৃতি দেশে যাবে। তারপরে তাম্রপর্ণী নদী অতিক্রম করে পাণ্ড্য দেশ, তার পরেই সমুদ্র। সমুদ্রের বিপরীত তীরে শত যোজন বিস্তৃত এক দুর্গম দ্বীপ আছে। যতদূর জানি দুরাত্মা রাবণ সেখানে বাস করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি সেইখানেই সীতার সংবাদ পাবে। বালীর সঙ্গে রাবণের একবার সংঘর্ষ হয়েছিল, তাই তার সম্বন্ধে স্বল্প ধারণা আমার আছে। আমি জানি রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ রাবণের প্রতি অনুরক্ত হলেও, রাবণের রাক্ষস নীতির সমর্থক নয়।'

রাম মনোযোগ সহকারে সুগ্রীবের নির্দেশগুলি শুনছিলেন। সুগ্রীবের শেষ মন্তব্যের পরে রাম চিন্তা করলেন মনে মনে যে তবে রাক্ষসদের মধ্যেও অন্য রকম মনোবৃত্তির ব্যক্তি আছে। বিভীষণ নামটিও তাৎপর্যপূর্ণ! তবে কি বিভীষণ রাবণের বিরোধিতায় ভীষণ হয়ে উঠবেন শেষ পর্যন্ত! রাম অত্যন্ত আনন্দিত হলেন মনে মনে। রামের মনে হলো যে সীতাকে উদ্ধারের এই প্রথম পদক্ষেপ শেষ পর্যন্ত তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করবে।

তিনি নিজের নামাংকিত একটি অঙ্গুরীয় হনুমানের হাতে দিয়ে স্নেহাভিষিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'বানরশ্রেষ্ঠ, এই অভিজ্ঞানটি দেখে মৈথিলী তোমাকে আমার প্রেরিত অনুচর বলে বুঝতে পারবেন। তুমি এটি যথাসময়ে ব্যবহার কোরো। আর, রাবণের ভ্রাতা বিভীষণের বিষয়ে কোন বিশেষ সংবাদ আমাকে এনে দেবার চেষ্টা কোরো।'

রামের সুমিষ্ট বচনে অভিভূত হয়ে হনুমান করপুটে অঙ্গুরী গ্রহণ করে সেটি মস্তকে স্পর্শ করলেন। তারপরে রামের চরণে প্রণত হয়ে, ভক্তের মতোই তাঁর ইষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করলেন।

* * * *

অন্য তিন প্রান্তের অনুসন্ধান প্রচেষ্টা এক মাসের মধ্যে নিঃশেষিত হলেও, দক্ষিণের দলটি কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে আসেন নি। উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম এই তিন দিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্বেষণের পরেও সীতার অথবা অপহরণকারী রাবণের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নি। সুগ্রীব চিন্তিত, লক্ষ্মণ বিষাদগ্রস্ত।

রাম নিজের মনকে এই বলে প্রবোধ দেন যে দক্ষিণগামী দল তো নিরাশ হয়ে

কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে আসে নি। সেই দলেই হনুমান আছেন। সুতরাং সম্পূর্ণভাবে আশাহত হবার কোন কারণ নেই। হনুমান, অঙ্গদ, নীল, জাম্ববান, গয়, গবাক্ষ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বানর বীরেরা সকলেই একসঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে না। অবশ্যই তাদের জন্য হৃদয়ে আশা এবং বুকে বল নিয়েই অপেক্ষা করতে হবে। দুরাত্মা রাবণের কবল থেকে জানকীকে উদ্ধার করতেই হবে।

সুগ্রীব রামের মনের আশা ও নৈরাশ্যের দ্বৈত ভাবটি উপলব্ধি করেন। সুগ্রীব নিশ্চিত যে অঙ্গদ বয়সে নবীন হলেও, হনুমান, নীল, জাম্ববান এবং বিশেষভাবে হনুমান, যিনি ইচ্ছামৃত্যু বরের অধিকারী, কখনও নিষ্ফল হবেন না। তাঁদের প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করার জন্য কোন কঠিন উদ্যম থেকে, তা যতই ভয়ংকর হোক না কেন, বিমুখ হবেন না।

সুগ্রীব রামকে আশ্বাস দেন এই বলে, 'বন্ধু, তুমি শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বংশজাত। বীরত্বে আভিজাত্যে, জ্ঞানে, তোমার কোন তুলনা নেই। তুমি অধীর হয়ো না। আমার উপযুক্ত অনুচরেরা সাধ্বী জানকীর সংবাদ আনবেই। তখন তুমি আর তোমার অনুজ লক্ষ্মণ তোমাদের নিজেদের শক্তিতেই তাঁকে রাক্ষসদের কবল থেকে মুক্ত করবে।'

সুগ্রীবের কণ্ঠের আন্তরিকতায় বিচলিত হয়ে রাম বললেন, 'বন্ধুবর, তুমি তোমার যোগ্য কথাই বলেছ। কিন্তু বৈদেহীর দেহের ও মনের পীড়নের আশংকায় আমার হৃদয় মাঝে মাঝে ভেঙ্গে যাচ্ছে। হায়, জনকনন্দিনী যদি বেঁচেই না থাকেন তবে আমাদের সব প্রচেষ্টাই শুধু ব্যর্থতাতেই পর্যবসিত হবে!'

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রামের লাবণ্যময় কান্তিতে বিষাদের ছায়া প্রতিফলিত হলো। রামের আয়ত নেত্রদুটি ক্রমে অশ্রুসজল হলো।

লক্ষ্মণ রামের পাশে এসে মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'কেন আপনি বার বার চরম অমঙ্গলের কথা চিন্তা করছেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস রাবণ মৈথিলীর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। তাঁর দেহের শুচিতা নষ্ট করার মতো নৈতিক বল সেই নিকৃষ্ট রাক্ষসের কখনই হবে না। আমরা অপেক্ষা করবো এই আশায় যে সখা সুগ্রীবের সুযোগ্য সহচরেরা শীঘ্রই সেই পাপিষ্ঠ রাবণের নিবাসের খোঁজ নিয়ে আসবে। তারপরে যত দুঃসাধ্য প্রচেষ্টারই প্রয়োজন হোক না কেন জানকীর উদ্ধারের জন্য, আমরা কেউই সেই কাজ সম্পন্ন করতে পরাঙ্মুখ হবো না। অতএব আপনি শোক পরিহার করুন এবং ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন।'

লক্ষ্মণের উৎসাহব্যঞ্জক আশ্বাসে রাম শান্ত হলেন। মনে মনে সুগ্রীব ও লক্ষ্মণকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। আকস্মিকভাবে রাম কল্পনার নয়নে সীতাকে দেখতে পেলেন। বিবর্ণা নিরাভরণা সীতা যেন দুঃখের এক প্রতিমূর্তি! সীতার লাঞ্ছনার কথা চিন্তা করে রামের হৃদয়ে এক নিঃশব্দ আর্তনাদ। এ দুঃখ কাউকে বোঝাবার নয়, কারোর সঙ্গে ভাগ করে নেবারও নয়! রাম স্থির হয়ে এক বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করেন।

রামের বক্ষ থেকে এক দীর্ঘশ্বাস মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সুগ্রীব রামের নিকটে এসে উপস্থিত হন। করজোড়ে মিনতি করে সুগ্রীব বলেন, 'ক্ষত্রিয় পুঙ্গব, আপনি আমাদের সকলের চেয়ে সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। আপনার মনের দুঃখ, বেদনা সব আমাদের মনেও সঞ্চারিত হয়েছে। দুঃখ ত্যাগ করুন। আপনার ধর্মপত্নী সীতা আমাদের শ্রদ্ধা, সম্মান এবং ভালোবাসার পাত্রী। তাঁকে যেমন করেই হোক রাবণের কবল থেকে আমরা মুক্ত করবোই। আপনি চৌদ্দ বৎসরের বনবাসের শেষে আবার অযোধ্যায় ফিরে যাবেন।

সেখানে রাজপদে অভিষিক্ত হবেন। আমরা সকলে মৈত্রীর বন্ধনে আবন্ধ হয়ে আপনার কাছ থেকে আর্যদের শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান ভক্তি গ্রহণ করে বিধাতার আশীর্বাদ লাভ করবো। আমার নিজস্ব ধারণা এই যে লংকায় রাবণ আপনার শত্রুতা করবেই। কিন্তু রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ হয়তো আর্যদের অগ্রগতিকে স্বাগতই জানাবে। তবে তাহলেও আমাদের সকলের সম্বন্ধে সতর্ক থাকবে হবে, যাতে আমরা প্রতারিত না হই। রাক্ষসদের মায়ার কৌশল অকল্পনীয়।'

তারপরে ক্ষণকাল নীরব থেকে, সুগ্রীব আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'আর্যাবর্ত এবং এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যে এক প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধন রচিত হবে এবং দেশের দু' প্রান্তের ধর্ম, রীতি, নীতি, ভাষা সবের মধ্যে এক সামঞ্জস্য সাধিত হবে! এক সূক্ষ্ম মিলনের সূত্র সমগ্র দেশকে এক এবং অনন্য করে তুলবে!'

সুগ্রীবের আবেগময় উক্তি রাম ও লক্ষ্মণ দুজনকেই বিস্মিত করে। এই অনার্য বানরগোষ্ঠী আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সার্থকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সচেতন! সেই কারণেই সব বিষয়ে প্রগতিশীল আর্যদের কাছ থেকে নূতন ভাবধারা শিক্ষা করে তাদের জীবন ধারণের প্রণালীকে উন্নত করতে এবং আর্যাবর্তের সঙ্গে একাত্ম হতে এরা এতো ব্যাকুল!

সুগ্রীবকে সস্নেহে আলিঙ্গন করেন রাম।

রামের মুখে এক স্বর্গীয় জ্যোতি, চোখে এক দিব্য দৃষ্টি। রামের এই মুহূর্তে মনে হয় যে সীতার উদ্ধারের আগেই তাঁদের এক নৈতিক জয় হয়েছে। শক্তিশালী বানরগোষ্ঠী যদি আর্য ক্ষাত্রিয়দের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে, তবে হয়তো রাক্ষসেরাও একদিন আর্যদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রত্যাহার করে মৈত্রীর বন্ধনে আবন্ধ হবে। কিন্তু আপাততঃ রাক্ষসাধিপতি রাবণ রামের বিষম শত্রু। একে নিধন না করতে পারলে, রামের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত কোন লাভই হবে না।

* * * *

অঙ্গদের নেতৃত্বে বানর দল দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরিতে উপনীত হয়ে দগ্ধপক্ষ, জরাগ্রস্ত সম্পাতিকে সাক্ষাৎ করলেন। ইনি গৃধ্ররাজ জটায়ুর জ্যেষ্ঠ। অতীতে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার বাসনায় আকাশমার্গে কনিষ্ঠকে সঙ্গে নিয়ে যাবার সময়ে, সূর্যের কিরণে তাঁর পক্ষদুটি বিনষ্ট হয়। কিন্তু সম্পাতি জটায়ুকে জ্বলন্ত অনলের মতো সূর্যের কর থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন।

অঙ্গদ সম্পাতিকে রামের বনে আগমনের এবং রাবণের সীতা হরণের কাহিনী বিবৃত করলেন। জটায়ুর মৃত্যুর সংবাদে সম্পাতি শোকগ্রস্ত হলেন। রামের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হলেও, সম্পাতি সীতাকে উদ্ধারের কাজে নিজের কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার অক্ষমতা জানালেন, অঙ্গদ ও হনুমানকে।

তাঁর কাছ থেকেই সংবাদ পাওয়া গেলো যে বিশ্রবার পুত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা রাবণ সমুদ্রের বিপরীত উপকুলে শতযোজন দূরে এক দ্বীপের অধিপতি। বিশ্বকর্মা সেখানে লংকাপুরী নির্মাণ করেছেন এবং সীতা রাক্ষসী পরিবেষ্টিত হয়ে লংকার প্রাসাদের প্রাচীরের অভ্যন্তরে অবস্থান করছেন।

সম্পাতি তাঁদের আরও জানালেন যে আকাশমার্গে রাবণ কর্তৃক অপহৃত অবস্থায় এক রূপবতী এবং রত্নাভরণবিভূষিতা রমণীরত্নকে 'হা রাম, হা লক্ষ্মণ' বলে বিলাপরতা অবস্থায় দেখেছেন। সেই সুন্দরী নারী ক্রন্দন করছিলেন, এবং অঙ্গ থেকে ভূষণগুলি

খুলে দূরে নিক্ষেপ করছিলেন। সেই রমণীর মুখে রামের নাম শুনে তাঁর মনে হয়েছিল যে রাক্ষসরাজ দুশ্চরিত্র রাবণ বোধহয় রামের ভার্যা সীতাকেই অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন।

সম্পাতি বললেন যে এই বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণেই মহাসমুদ্র এবং শতযোজন দূরে লংকাদ্বীপ। সীতাকে উদ্ধার করতে হলে লংকায় পৌঁছাতে হবেই।

ইতিমধ্যে একমাস সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অঙ্গদ নিশ্চিত যে খুল্লতাত সুগ্রীব তাঁকে আদৌ ক্ষমা করবেন না। বরং প্রথম সুযোগেই অঙ্গদের প্রাণদণ্ডের আদেশ ঘোষণা করবেন। তবে হনুমান সঙ্গে আছেন, এই যা ভরসা।

অনিশ্চিত আশংকায় সকলের হৃদয় জর্জরিত হয়। নবীন অঙ্গদ বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হন। বার বার জাম্ববান এবং হনুমানকে বাঁচবার উপায় উদ্ভাবন করতে অনুরোধ করেন। হায়, সাগর লঙ্ঘন করার সামর্থ্য কারোরই নেই! অঙ্গদ নিজে হয়তো শতযোজন লম্ফ দিয়ে লংকায় পৌঁছাতে পারবেন। কিন্তু আর ফিরে আসার ক্ষমতা তাঁর থাকবে না।

অঙ্গদকে আশ্বস্ত করে প্রবীণ জাম্ববান বললেন, 'অঙ্গদ, তুমি এত চিন্তা করছো কেন? সুগ্রীব কখনই এত নিষ্ঠুর হবেন না। তবে সুগ্রীবকে সন্তুষ্ট করতে আমাদের কাজের কাজ করতেই হবে।'

অতঃপর জাম্ববান ধীরভাবে বললেন, 'যুবরাজ, চঞ্চল হ'য়ো না। উপায় উদ্ভাবন আমাদের করতেই হবে যাতে আমরা সাগর অতিক্রম করতে পারি। আপাততঃ অন্ততঃ আমাদের মধ্যে একজন কেউ গিয়ে সীতার অবস্থা, লংকার রক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি জেনে আসুক। তারপরে সেই খবর নিয়ে আমরা কিষ্কিন্ধ্যাপতির সামনে গিয়ে দাঁড়াবো। তখন আর তিনি আমাদের বিলম্বের জন্য অপরাধ নেবেন না!'

হনুমান নির্বাক বিস্ময়ে জাম্ববানের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। উপস্থিত বুদ্ধিতে হনুমানের তুলনা নেই। তিনি বেশ উপলব্ধি করলেন যে জাম্ববান কাকে দিয়ে এই দৌত্যকর্ম করাতে চান। কিন্তু হনুমান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু না বলাই স্থির করলেন।

অঙ্গদ জাম্ববানের উদ্দেশে বললেন, 'হে শ্রদ্ধেয় বীর, আপনি কেমনভাবে এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করবেন বলে আশা করেন! কেইই বা লংকায় যাবার ক্ষমতা রাখে, আমি তো জানি না। বৈদেহীর সংবাদ না নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরলে, আমাদের সকলের মৃত্যু অবধারিত।'

জাম্ববানের মুখে হাসি। জাম্ববান প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'যুবরাজ অঙ্গদ, এত অধীর হয়ো না। লংকায় যিনি যেতে পারেন, তেমন ব্যক্তিকেই আমি এখনই অনুরোধ জানাচ্ছি। তুমি নিরাশ হয়ো না। আমাদের রামের ভার্যা সীতার অন্বেষণে কৃতকার্য হয়েই কিষ্কিন্ধ্যাপতির নিকটে যেতে হবে, তার আগে নয়।'

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে জাম্ববান শ্রদ্ধার সঙ্গে হনুমানের উদ্দেশে বললেন, 'হে সর্বজ্ঞ মহাবীর হনুমান, তুমি কি জন্য নীরব রয়েছ? তুমি অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা অঞ্জনার গর্ভে বায়ুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছ। তোমার তুল্য ক্ষমতাশালী পৃথিবীতে কেউই নেই। তুমি শৈশবে নবোদিত সূর্যকে ফল মনে করে ধরবার চেষ্টা করেছিলে। কিন্তু ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে বজ্র নিক্ষেপ করে তোমার বাম হনু ভেঙ্গে দেন। সেই থেকে তুমি হনুমান বলে পরিচিত। তোমার বায়ুর মত বীর্য ও বেগ, এবং

ব্রহ্মার বরে তুমি অস্ত্রে অবধ্য। সুতরাং তুমি মহাবলশালী এবং সর্বগুণান্বিত। তুমি এই বার তোমার বিক্রম দেখাও, নচেৎ আমরা কেমন করে সীতাকে উদ্ধার করে রঘুশ্রেষ্ঠ রামের কার্য সাধন করবো! বানরাধিপতি কিভাবে রামের উপকারের প্রত্যুপকার করবেন, এবং কেমন ভাবেই বা একমাসকাল কেটে গেলেও আমরা এখন আমাদের প্রাণ রক্ষা করবো?'

হনুমান কোন উত্তেজনা প্রকাশ না করে ধীরে ধীরে তাঁর মস্তকটি আন্দোলিত করলেন। এটি বোধ হয় সম্মতিজ্ঞাপনের চিহ্ন। তারপরে তিনি তাঁর লাঙ্গুলটি তুলে ঊর্ধমুখে আকাশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। হনুমানের মুখে ও চোখে এক প্রচণ্ড পরিবর্তন সূচিত হলো।

হনুমানের মুখের অভুতপর্ব জ্যোতির্ময় ভাবটি লক্ষ্য করে জাম্ববান বললেন, 'বানরশ্রেষ্ঠ, ওঠ, তোমার শক্তির পরিচয় দাও। এই কাজ তোমার, আর কারোর নয়। কারণ, হে বেগময়, এ কাজ আর কারোর পক্ষে সম্ভবও নয়। তুমি অদূরে অটল মহেন্দ্রপর্বতের শিখরদেশ থেকে লম্ফ প্রদান করো।'

বানরেরা ইতিমধ্যেই সাগরের তীরে উপস্থিত হয়ে বেলাভূমিতে বালুকারাশির মধ্যে লঙ্গুল ঘর্ষণ করছিলেন। সকলেই বিস্মিত নেত্রে মহাসমুদ্রের গর্জনমুখর ঊর্মিমালার অবিরত নৃত্য লক্ষ্য করছিলেন। অনন্তনীল মহাকাশের নীচে এই অন্তহীন নীল জলধি সকলের হৃদয়ের মধ্যেই এক বৈরাগ্যের ভাব জাগরিত করছিল। পুনরায়, সারি সারি নারিকেল ও কদলী বৃক্ষের সুপক্ক ফলগুলিও তাদের বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করছিল।

কেমনভাবে এই বিশাল জলরাশি অতিক্রম করা যাবে, সেই চিন্তায় সকলে মগ্ন। বিপরীত তীরে কুলের কোন চিহ্ন নেই। শুধু জল আর জল, ঢেউ আর ঢেউ। দূরে সাগরের নীল অম্বু যেন নীল অম্বরে মিলিত হয়ে জল, স্থল, অন্তরীক্ষ একত্রিত করে দিয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

লঙ্কেশ্বরের নিদ্রা হরণ করলো বৃদ্ধা রাক্ষসী ত্রিজটার স্বপ্নের বৃত্তান্ত। রাবণ সীতাকে আর দুমাস সময় দিয়েছিলেন যাতে সীতা রামের আশা ত্যাগ করে রাবণকেই তাঁর ভবিতব্য হিসেবে হৃদয় বরণ করে নেন। কিন্তু রামের প্রেয়সী জনকনন্দিনীর নিকটে এই দু মাসই যে প্রায় দু যুগ।

ত্রিজটা সকলকে বুঝিয়ে বললেন যে দশরথ রাজার পুত্রবধূ সীতাকে আর রাবণ অথবা রাক্ষসদের ভক্ষণ করার প্রয়োজন নেই। রাক্ষসেরা নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন যে রাবণের শত্রু, অযোধ্যাপতি রাম পুষ্পক রথে আরোহণ করে উত্তর দিকে লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে ভেসে চলেছেন, আর রাবণ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গর্দভে আরোহণ করে দক্ষিণ মুখে যাচ্ছেন।

প্রবীণা ত্রিজটার এই স্বপ্নের তাৎপর্য রাক্ষসরাজের নিকট পরিষ্কার হলেও, তিনি

মনের মধ্যে কোন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলেন না। সীতাকে তাঁর চাইই। সীতা ভয়ে, ভক্তিতে অথবা মোহে শেষ পর্যন্ত রাবণকে স্বীকার করে নেবেই, এইই রাক্ষসরাজের বিশ্বাস।

কিন্তু লংকাধিপতির স্বপ্নেরও অগোচর ছিল যে ইতিমধ্যে হনুমান সমুদ্র লংঘন করে স্বর্ণলংকার অন্তঃপুরে সকলের অজ্ঞাতসারে এসে উপস্থিত হয়েছে। আর হনুমান লংকাতে এলেও যে রাবণ অথবা রাক্ষসদের কোন ক্ষতি করতে পারবে অথবা সীতাকে আবিষ্কার করতে পারবে, এই সম্ভাবনা রাবণের কল্পনাতেও উদয় হয় নি।

রাক্ষসাধিপতি রাবণ বহুবিধ রত্নাভরণ এবং হীরকখচিত স্বর্ণমুকুটে শোভিত হয়ে লংকার আড়ম্বরপূর্ণ রাজসভায় মহা গৌরবে সমাসীন। রাবণের সিংহাসন স্ফটিক ও রত্নমণ্ডিত এবং উত্তম আস্তরণে আচ্ছাদিত। রাবণের উন্নত দেহ ও বিশাল বক্ষ মদগর্বে স্ফীত এবং নীলাঞ্জনবর্ণ ভয়ঙ্কর মুখটি দুটি উজ্জ্বল আয়ত নেত্র এবং বৃহৎ ওষ্ঠ ও দীর্ঘ দন্ত দ্বারা সুরক্ষিত। একটা ভীষণ রক্ত ও মাংসের মূর্তি যেন আপন শৌর্যও বীর্যের প্রখর জ্যোতিকে বহন করে রাজসভাটিকে আলোকিত করেছে।

রাজার চারদিকে সালংকারা রাক্ষসী প্রহরিণীগণ চামর বীজন করছে। রাবণের দেহ রক্তচন্দনে বিভূষিত। রাবণের পরিধানে মহামূল্য রত্নখচিত পরিচ্ছদ যা তাঁর ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্যের যথার্থ পরিচায়ক।

রাবণের চার মন্ত্রী দুর্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব ও নিকুম্ভ তাঁর নিকটেই সুদৃশ্য আসনে উপবিষ্ট। মনে তাদের উত্তেজনা ও অশান্তির চিহ্ন। রক্ষরাজ ও তাঁর অগণিত অনুচর ও প্রজার হৃদয়ে আতংকের সঞ্চার করে ইতিমধ্যেই লংকাপুরীতে এক অদ্ভুত জীবের আবির্ভাব হয়েছে। সেই জীব এক শাখামৃগ, আকৃতিতে বানর।

রাক্ষসদের হৃদয়ে ত্রাস ও রোষ দুইই সৃষ্টি করে এই বিশাল বানররূপী দৈত্য অশোকবন ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। সীতার রাক্ষসী প্রহরাকে উপেক্ষা করে এই বানর তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। এই সংবাদে রাবণ এবং তাঁর মন্ত্রী ও সেনাপতিদের ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল। কে এই অবাঞ্ছিত ও কুৎসিত জীব যে সুরক্ষিত লংকাপুরীতে এসে সীতার নিকট উপস্থিত হয়েছে! এ নিশ্চয় সেই নরকুলাঙ্গার রামের চর।

রাবণের আদেশে ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্রের সাহায্যে হনুমানকে বন্ধন করলেন। বানর শ্রেষ্ঠ হনুমান ভেবেছিলেন যে তিনি মায়ামন্ত্রে নিজের আকৃতির পরিবর্তন করবেন এবং অনায়াসেই রাক্ষসদের ফাঁকি দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে সীতার অন্বেষণ করে রামের ও সুগ্রীবের নিকট ফিরে যাবেন। হয়তো নিজের দৈবী শক্তির উপর হনুমানের আস্থা ছিল অপ্রমেয়। অশোকবনে সীতাকে দেখার পর হনুমান রামের বৈরী রাবণ তথা রাক্ষসদের যথাসাধ্য ক্ষতিসাধনে তৎপর হলেন। রাবণের অসংখ্য ঘোরদর্শন ও বলশালী অনুচরদের প্রতি-আক্রমণকে উপেক্ষা করে হনুমান তোরণের একটি প্রকাণ্ড লৌহময় অর্গলকে মুক্ত করলেন এবং তার আঘাতে তাদের বিনষ্ট করলেন।

* * * *

ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধনজালে ধৃত হয়ে হনুমান লংকার রাজসভায় নীত হলেন। এর আগেই হনুমানের অত্যাচারের অনেক বর্ণনা ও অভিযোগ লংকাধিপতির কর্ণ-গোচর হয়েছিল। বিভীষণও এই বানরের আবির্ভাবের সম্বন্ধে জেনেছিলেন। অশোকবনে রঘুশ্রেষ্ঠ রামের ভার্যার সকাশে হনুমানের উপস্থিতি বিভীষণের নিকট বিশেষ রহস্যজনক বোধ হয়েছিল।

রোষকম্পিত কণ্ঠে রাবণ বললেন, 'মন্ত্রীগণ, এই অসমসাহসী ও ঘৃণ্য জীবটি যে কে তা তোমরা জানবার চেষ্টা করো। এর নিষ্ঠুর কার্যকলাপ অতি কঠিন শাস্তির যোগ্য। কোন সাহসে এই মূর্খ লংকাপুরীর অন্তঃপুরে এসেছে? হয় এই বানর নিতান্ত বুদ্ধিহীন, অথবা অত্যন্ত ক্রূর ও দুরভিসন্ধিসম্পন্ন এবং মায়াবেশধারী কোন জীব।'

রাবণের দ্যুতিময় ও অলৌকিক আকৃতি এবং ভীষণ আননশোভা লক্ষ্য করে হনুমানের হৃদয়ে এক বিস্ময় ও ত্রাসের সঞ্চার হলো। এই সুরক্ষিত লংকাপুরী প্রায় দুর্ভেদ্য, অগণিত সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত এবং এই অশেষ বল ও বীর্যসম্পন্ন রাবণ কর্তৃক পরিচালিত। হনুমান মনে মনে নিজেদের সমস্যার দুরতিক্রম্যতার সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হলেন। কিভাবে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাম এই শত্রুপুরীতে উপনীত হয়ে এই মহাবিক্রমশালী রাবণের কবল থেকে সীতাকে উদ্ধার করবেন!

রাবণের আদেশে প্রহস্ত হনুমানের উদ্দেশে বললেন, 'বানর, তোমার প্রাণে কি বিন্দুমাত্রও ভয় নেই? তুমি কে? তুমি কি ইন্দ্র, অথবা কুবের অথবা যম অথবা বরুণ, কারোর প্রেরিত দূত? সত্য বল, তোমার পরিচয় কি, তবেই তুমি মুক্তি লাভ করবে। অন্যথায় তোমার প্রাণদণ্ড হবে।'

হনুমান রাবণের প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রাক্ষসরাজের উদ্দেশে বললেন, 'ত্রিভুবনে আমাকে কেউ বন্ধন অথবা বধ করতে পারে না। আমি স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছি যাতে আমি রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখতে পাই। আর আমি ইন্দ্র, কুবের, যম এমন কি বিষ্ণুরও দূত নই। তবে আমি রঘুকুলসূর্য রামের দূত। তিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য ভার্য্যা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ দণ্ডকারণ্যে বনবাস করতে এসেছিলেন। সেইখানে জনস্থানে জনকতনয়া সীতা অপহৃত হন। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণে ঋষ্যমূক পর্বতে এসে বালীকে বধ করে তাঁর ভ্রাতা সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার অধীশ্বর করেছেন। অসংখ্য বানর সুগ্রীবের আদেশে সীতার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়েছে। আমি মারুতের ঔরসজাত পুত্র হনুমান, শত যোজন সাগর লংঘন করে লংকায় এসেছি এবং এখানে বিদেহ রাজকন্যাকে দেখেছি।'

হনুমানের মার্জিত ভাষণে রাবণের ক্রোধ প্রশমিত হলো না। হনুমানের লংকায় আগমন নিশ্চয়ই রাবণের অভিপ্রেত নয়। রাবণ উদ্বিগ্ন বোধ করলেন যে হনুমান শত-যোজন সমুদ্র লম্ফ দিয়ে অতিক্রম করেছে, এবং সে সেইভাবেই স্বস্থানে ফিরে যাবে। সীতা কোথায় আছে, এই সংবাদ অচিরেই রাম এবং বানরাধিপতি সুগ্রীবের নিকট পেঁছাবে। বালী জীবিত থাকলে হয়তো রাবণের সঙ্গে শত্রুতায় প্রবৃত্ত হোতো না। রাবণ একবার বালীর নিকট পরাজিত হয়ে বালীর সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। কিন্তু সুগ্রীব ইতিমধ্যেই রাবণের শত্রু রামকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে।

অতএব, হনুমান সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হতে হবে। রাবণ গম্ভীর রোষে প্রহস্তের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'মন্ত্রীপ্রবর, তুমি এই অসভ্য বর্বর দূতকে জিজ্ঞাসা করো যে সে কি বলতে চায়। আমার পুত্র অক্ষকে এই দুর্বৃত্ত হত্যা করেছে, অনেক রাক্ষসকে ইতিমধ্যেই সে বধ করেছে। এই বানরের লংকায় অনধিকার প্রবেশ অবশ্যই কঠিন শাস্তির যোগ্য। একে সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে।'

হনুমান লক্ষ্য করলেন যে রাবণের গম্ভীর ও ভীষণ আকৃতিতে অসামান্য বল ও বীর্যের স্বাক্ষর। রাবণের কণ্ঠস্বরে শক্তি, দর্প ও ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা। রাবণের বিশাল

মুখমণ্ডলে প্রচণ্ড সাহস, আত্মপ্রত্যয় এবং ভোগ ও কামনার ছবি অঙ্কিত। এই বিরাট পুরুষকে শান্ত ও মধুর বাক্যে বশীভূত করা সম্ভব নয়।

হনুমান প্রহস্তের প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা না করে অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'রাক্ষসরাজ, দশরথতনয় রাম মানুষ না নররূপে নারায়ণ অথবা বিষ্ণুর অংশ সে কালেই প্রমাণিত হবে। আমি এই সম্বন্ধে কিছুই বলতে চাই না। তবে রামের বীরত্বের কাহিনী নিশ্চয়ই আপনার জনস্থানের অনুচরেরা আপনাকে জানিয়েছে। তা ছাড়া, আপনি রামের ভার্যা সীতাকে আপনার প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে বন্দী করে রেখেছেন। আপনার মতো ধর্মজ্ঞ, বেদবিদ, পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে পরস্ত্রীকে অপহরণের মতো অসভ্য ও অনার্য আচরণ শোভা পায় না। আপনি অনুগ্রহ করে জনকনন্দিনীকে সসম্মানে রামের নিকট প্রত্যর্পণ করুন। এতে অপেনার এবং রাক্ষসদের মঙ্গল হবে। আমি জানি রামকে পরাস্ত করতে পৃথিবীর কোন শক্তিই সক্ষম হবে না। অতএব, আমি যেমন বলছি তেমন করে আপনার প্রজাদের অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান।'

বিভীষণ দূরে এক রত্নখচিত আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি নির্বাক বিস্ময়ে হনুমানের বিচক্ষণতাপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত কথাগুলি শুনছিলেন। বিভীষণ হনুমানের বিনীত ও যুক্তিপূর্ণ বচনের জন্য মনে মনে হনুমানের প্রশংসা করছিলেন। তিনি হনুমানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হনুমান যাঁর চর, সেই রামের বলবীর্যশালী সৌম্য আকৃতিটি মনে মনে কল্পনা করছিলেন।

বিভীষণ চিন্তাকুল নয়নে রাবণের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করলেন। রামের সঙ্গে সৌহার্দ্য রচনার এই হয়তো শেষ সুযোগ! রাবণ হয়তো এই সুযোগ হারাবেন না।

কিন্তু, হায়! রাবণের মুখ্য মন্ত্রীরা কেউই রাবণকে মৈত্রী ও সন্ধির পথে যাবার পরামর্শ দিলেন না। সুতরাং বিভীষণের মনে হলো যে এক বিরাট সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল!

হনুমানের যুক্তিপ্রসূত উপদেশ রাক্ষসাধিপতির মর্মে প্রবেশ করলো না। পরস্ত্রী হরণ ও সম্ভোগ রাক্ষস ঐতিহ্যের পরিপন্থী নয়। তায় রাম রাবণের শত্রু। সুতরাং রামের ধর্মপত্নীকে অপহরণ করা অন্যায় নয়। রাম রাক্ষসদের রাজ্যে প্রবেশ করে রাক্ষসদের বিনাশ করেছে।

কিন্তু এই মহাবলী ভীমকায় হনুমান রক্ষকুলতিলক রাবণের হৃদয়ে এক গভীর সংশয়ের উৎপাদন করেছে। এই শক্তিমান প্রাণী শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করে লংকা-পুরীতে প্রবেশ করেছে এবং রাক্ষসদের সঙ্গে সংঘর্ষে অভাবনীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। সে নিশ্চয়ই সামান্য নয়! ব্রহ্মনিষ্ঠ, বিচক্ষণ ও শিক্ষিত রাবণের হৃদয়ে সত্যের আলোক প্রতিফলিত হয়। দূরদর্শী রাবণ হনুমানের লংকায় উপস্থিতির মধ্যে নিজের নিয়তির অগ্রসরণকে লক্ষ্য করেন।

কিন্তু প্রকাশ্যে রাবণ রাক্ষসাধিপতির দর্পিত, উদ্ধত ও উগ্র মনোবৃত্তির পরিচয়ই শুধু দেন। রাবণ নিশ্চয়ই অপরিণামদর্শী নন। রাবণ রাক্ষস, রাক্ষসদের মুখপাত্র, রাক্ষসদের অধিপতি। মানুষ রামের সঙ্গে চরম শত্রুতা রাবণ রাক্ষসপ্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশের মধ্য দিয়েই সম্পন্ন করবেন। সীতাকে উপভোগ করতে না পারলেও, সীতাকে হাতে রেখেই রামকে শেষ করবেন। হনুমান যাতে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে গিয়ে রাম ও সুগ্রীবকে লংকায় সীতাকে আবিষ্কারের কাহিনী বিবৃত করতে না পারে, সেই ব্যবস্থাই রাবণ করবেন।

রাবণকে দীর্ঘক্ষণ নিরন্তর লক্ষ্য করে হনুমানের মনে এক আশার ক্ষীণ আলোক প্রজ্বলিত হয়। বিভীষণও গভীর আগ্রহের সঙ্গে রাবণের গম্ভীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। রাবণের সঙ্গে বিভীষণের দৃষ্টি বিনিময়ও হয়। রাবণ লক্ষ্য করলেন যে বিভীষণের মিনতিপূর্ণ আঁখিদুটিতে দয়া-ধর্ম পালনের অনুরোধ অংকিত আছে। কিন্তু দয়া প্রকাশ করা, রাক্ষসদের বৈশিষ্ট্য নয়।

মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করেন রাবণ। কঠিন দৃষ্টিতে হনুমানকে লক্ষ্য করে গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'রে মূর্খ দূত, তুই আমাকে রামের মহিমার কথা শোনাচ্ছিস! রাম বালীকে অন্যায় যুদ্ধে বধ করেছে, তার জন্য আবার রামের বীরত্বের প্রশংসা করছিস। সম্মুখ সমরে রাম কোনদিনই বালীকে হারাতে পারতো না। বালী ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুগ্রীব তার জ্যেষ্ঠ বালীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং এখন রামের সাহায্যে অনৈতিকভাবে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য আত্মসাৎ করেছে। সুতরাং রামের মতো সুগ্রীবও আমার শত্রু। অতএব শত্রুর চরকে আমি ক্ষমা করবো না। লংকায় এসে তুই আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিস। চুরি করে সীতার সঙ্গে দেখা করেছিস। তুই ঘোর পাপী। অতএব তোকে বধ করাই একমাত্র পথ।'

রাবণের ক্রুদ্ধ বাক্যে হনুমানের সপ্রতিভ আননে এক আনন্দের হিল্লোল। হনুমান জানেন যে ব্রহ্মার বরে কোন অস্ত্রই তাঁর দেহকে ভেদ করতে পারবে না। হনুমান নির্বিকার চিত্তে পরিস্থিতিটি উপভোগ করেন।

হনুমানের অকম্পিত নেত্র এবং অবিচলিত দেহ বিভীষণের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উৎপাদন করে। জ্যেষ্ঠের তথা রাক্ষসরাজের গর্হিত মনোবৃত্তিকে সংযত করতে বিভীষণ আসন ত্যাগ করে রাবণের পাশে এসে উপস্থিত হন।

জোড় করে অত্যন্ত নম্রভাবে বিভীষণ রাজার উদ্দেশে বলেন, 'রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, আপনি শান্ত হোন। আমার কথায় কর্ণপাত করুন। আপনি জ্ঞানী এবং ধার্মিক। রাজধর্ম দূতকে বধ করার নির্দেশ দেয় না। দূতকে বধ করা নিয়মবিরুদ্ধ, এবং ধর্মবিরুদ্ধ তো বটেই। আপনার শাস্ত্রজ্ঞান অপরিসীম এবং আপনার রাজনৈতিক বিচক্ষণতাও অসীম। সুতরাং আপনি ভালোভাবে চিন্তা করে এবং পরিস্থিতিগতভাবে বিচার কোরে এই অপরাধীকে অন্য এবং উপযুক্ত শাস্তি দিন।'

বিভীষণের যুক্তিজালে বশীভুত হয়ে রাবণ বললেন, 'বিভীষণ, দূত যে অবধ্য এ কথা আমার অজানা নয়। কিন্তু বুঝে দেখ, এই হীন বানর এক ঘোর পাপী। অন্যায়ভাবে লংকায় প্রবেশ করে আমাদের প্রভুত ক্ষতি করেছে। কোন দূত পররাজ্যে এসে দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে হিংসায় লিপ্ত হয় না। কিন্তু এই দুষ্ট বানর তাই করেছে এবং তাই সে রাক্ষসদের চোখে পাপকাজের অপরাধে অপরাধী। সে ক্ষমার অযোগ্য। সুতরাং এই অসভ্য বানরকে বধ করাই উচিত।'

এই অবসরে হনুমান স্থির দৃষ্টিতে বিভীষণকে লক্ষ্য করেছিলেন। বিভীষণের চক্ষু দুটিও হনুমানের প্রতি নিবদ্ধ।

রাবণকে ন্যায় ও ধর্মের পথে চালিত করার কঠিন প্রয়াসে বিভীষণ সংযত চিত্তে ও শান্ত কণ্ঠে বললেন—'হে রাক্ষসাধিপতি, আপনার মতো লোকব্যবহার এবং শাস্ত্র-নিরূপণ, কার পক্ষে সম্ভব! আমি না বললেও আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে এই বানর নিজের কথা বলছে না, যারা তাকে এখানে পাঠিয়েছে, তাদের কথাই বলছে। ও লংকায় এসে যে অনাচার ও উৎপাত করেছে তাও সেই পরের উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই,

নিজের জন্য নয়। অতএব এই দূতকে প্রাণে বধ না করে, যারা তাকে এই সুকঠিন দৌত্যকার্যে পাঠিয়েছে, তাদেরই আপনার শাস্তি দেওয়া উচিত। দূত অবধ্য, এই অনার্য বানররূপী দূতকে বধ করলে রাজধর্ম পালনে বিচ্যুতির জন্য চিরদিন রাজা হিসেবে আপনার নাম কলঙ্কিত হবে।'

বিভীষণের নির্ভীক উক্তিতে বিচলিত হয়ে রাবণ চিন্তায় মগ্ন হলেন। রাবণের অন্যতম মুখ্যমন্ত্রী নিকুম্ভ এই সুযোগে ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে বললেন, 'রাক্ষসেন্দ্র, মার্জনা করবেন। রাজভ্রাতা বিভীষণ এই বানরকে বধ না করার স্বপক্ষে যা যুক্তি দেখিয়েছেন, তা সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। রাম এবং সুগ্রীব দুজনেই রাক্ষসদের শত্রু। আর তাদের প্রতিনিধি হনুমান এসে ইতিমধ্যেই আমাদের চরম শত্রুতা করেছে। এখন সে অক্ষত অবস্থায় এখান থেকে ফিরে গেলে, লঙ্কার অনেক গুপ্ত রহস্যই শত্রুর নিকট প্রকাশিত হবে। ওকে দূত বলে গণনা করার কোন হেতুই নেই।'

কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভ রাবণের বিশেষ প্রিয়। নিকুম্ভ বিক্রমশালী বীর, বুদ্ধিমান এবং কর্মক্ষম। নিকুম্ভের মন্ত্রণাকে রাবণ সহজে উপেক্ষা করতে পারেন না। কিন্তু এখন রাবণ ইঙ্গিতে নিকুম্ভকে স্তব্ধ হতে অনুজ্ঞা করলেন। রাবণের দৃষ্টি এখন বিভীষণের দিকে।

স্থিতপ্রজ্ঞ ও বিচক্ষণ বিভীষণ মনে মনে উপলব্ধি করেন যে রামের দূতকে রক্ষা করতে এবং রাক্ষসদের সম্মান ও আত্মম্ভরিতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁকে একটি কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

মুহূর্তের মধ্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে বিভীষণ ধীরভাবে বললেন, 'রাক্ষসরাজ, এই বানরকে হত্যা করলে, কে ফিরে গিয়ে সেই রাম ও লক্ষ্মণ দুই রাজপুত্রকে যুদ্ধে প্ররোচিত করবে। আসলে সেই দুই রাজপুত্রই রাক্ষসদের চোখে অপরাধী, এই বানর নিমিত্ত মাত্র। আপনার সুশিক্ষিত, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী এবং বীর সেনা-নায়কগণ রাক্ষসদের মর্যাদাহানির জন্য প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় প্রবলভাবে উত্তেজিত হয়েছে। আপনার উপযুক্ত সেনাপতিদের রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, প্রভৃতিকে বেঁধে নিয়ে আসতে আদেশ দিন! তাহলে তারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে এবং রাক্ষস সামরিক বাহিনী তাদের যুদ্ধের তৃষ্ণাকে নিবারণ করার সুযোগ পাবে। অতএব আপনার শস্ত্রবিশারদ ও কোপনস্বভাব সেনানায়কদের আপনি যথোচিত আজ্ঞা প্রদান করুন।'

রাক্ষসাধিপতি রাবণ ভ্রাতা বিভীষণের বিজ্ঞতাপূর্ণ এবং কূটনৈতিক বচনে প্রীত হয়ে বললেন, 'বিভীষণ, তোমার উপদেশ নিঃসন্দেহে দেশকালোচিত এবং তোমার অনু-মোদিত পথ রাক্ষসদের পক্ষে শ্লাঘনীয়। আমি সেই ব্যবস্থাই করবো। এই দূতকে বধ করা উচিত নয়। কিন্তু একে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে বিদায় করতে হবে। এর দীর্ঘ লাঙ্গুলটি দগ্ধ করা হোক যাতে এর নিগ্রহ ও দুর্দশা দেখে এর আত্মীয়স্বজন শিক্ষা লাভ করে। এর লাঙ্গুলে অগ্নি দিয়ে একে নিয়ে লঙ্কা নগরীর সর্বত্র ঘোরানো হোক।'

রাবণের এই নিষ্ঠুর আদেশে মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্র মিত্র সকলের আনন্দের কলরবে সভাগৃহ মুখরিত হলো। বিভীষণ দূতের অবধ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখতে কৃতকার্য হয়ে এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। রাবণ তাঁর বিশাল দুটি পদ প্রসারিত করে বাহিরে যেতে উদ্যত হলে, রাক্ষসদের সমবেত কণ্ঠের 'জয় লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণের জয়', এই চিৎকারে যেন আকাশ বিদীর্ণ হলো!

রাবণের প্রহরীরা হনুমানের চারিদিকে এক বেষ্টনী রচনা করে রাক্ষসোচিত

পৈশাচিক আনন্দে নৃত্য করতে আরম্ভ করলো। হনুমান রাজাদেশের নৃশংসতায় বিচলিত হয়ে কাতর দৃষ্টিতে বিভীষণের মুখের ভাব বুঝতে চেষ্টা করে, চার দিক নিরীক্ষণ করলেন। হনুমানের মনে একটিই চিন্তা—কেমন করে রাক্ষসপুরী লঙ্কার অধিকতর ক্ষতি করে তিনি সাগরপারে গিয়ে নিজের স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হবেন। কতক্ষণে তিনি জনকনন্দিনী মাতৃসমা সীতার সংবাদ নিয়ে রামের পাদপদ্মে নিবেদন করবেন!

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই হনুমানের ম্রিয়মাণ আননে এক স্বর্গীয় জ্যোতি বিকশিত হলো।

* * * *

জ্বলন্ত লাঙ্গুলের সাহায্যে স্বর্ণলংকার সৌধশ্রেণীতে ধ্বংসের তাণ্ডব লীলার সূচনা করে, লংকা ত্যাগ করবার আগে হনুমান অশোকবনে সীতার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। লংকেশ্বরের মণিমানিক্যখচিত পর্বতোপম বাস ভবনটিতে অগ্নি সংযোজন করার পরে একে একে প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, বজ্রদংষ্ট্র, শুক, সারণ, ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ সকলের বাসভবনই ভস্মীভূত হয়েছিল। অক্ষত ছিল শুধু বিভীষণের আবাস।

রাক্ষসপুরী লংকার কাঞ্চনময় গাত্রে অনেক কলংকের ছাপ অংকিত করে হনুমানের মনে আত্মতৃপ্তির সীমা নেই। মনের আনন্দে পুনরায় সমুদ্র লংঘন করে সমুদ্রের উত্তর তীরে এসে, হনুমান নিজের দলের সঙ্গে মিলিত হলেন।

হনুমানের মুখে তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে যুবরাজ অঙ্গদ, জাম্ববান, নল প্রভৃতি আনন্দিত চিত্তে হনুমানকে আলিঙ্গন করলেন। হনুমানের সামর্থ্য ও পরাক্রম সম্বন্ধে প্রবীণ জাম্ববান নিশ্চিত ছিলেন এবং সেই কারণেই হনুমানকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

সকলে বায়ুযোগে প্রস্রবণ গিরিতে উপনীত হলেন। হনুমান ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে রামের পদমূলে প্রণত হলেন। সীতা রামের যোগ্য সহধর্মিনী এবং দুজনেই যে দুজনের পরিপূরক, এই ধারণা সীতাকে দেখার পর থেকেই হনুমানের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছিল। হনুমানের পরিশীলিত অন্তরে একটি প্রশ্নই বার বার উদয় হয়েছে—এঁরা কি মর্তের মানুষ না শাপভ্রষ্ট দেবতা!

হনুমান কিছু বলার আগেই প্রথমে সীতাপ্রদত্ত অভিজ্ঞান-কাঞ্চনাবদ্ধ উজ্জ্বল মণি, রামের হাতে দিলেন। রাম হনুমানকে আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করলেন। সীতার স্পর্শজড়িত মণি বুকে নিয়ে রাম আনন্দে ও দুঃখে রোদন করলেন।

রাম ভাবাবেগ সংযত করে হনুমানকে সীতার কথা বলতে অনুরোধ করলেন।

হনুমান উপলব্ধি করলেন যে রামের হৃদয়ের শূন্যতা পূরণ করতে হলে তাঁকে লংকার বৃত্তান্ত সবিস্তারেই নিবেদন করতে হবে।

হনুমান রামের অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উপর দুটি আঁখি নিবদ্ধ করে বিনম্রভাবে বললেন, 'হে রাঘব, আমি রাবণকে আপনার দূত বলেই আমার পরিচয় দিয়েছি। রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ দূত অবধ্য বলে বোঝাতে, রাবণ আমার প্রাণ-সংহার থেকে নিরস্ত হয়। এই দীন সেবক তাই এখন থেকে আপনারই দাস। মহাত্মা সুগ্রীব নিশ্চয়ই আমার এই নতুন সত্তাকে অভিনন্দন জানাবেন।'

হনুমানের বিজ্ঞজনোচিত বাক্যে অভিভূত হয়ে সুগ্রীব হনুমানের সঙ্গে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন। সুগ্রীব হৃদ্যতাপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'বীর ও মহাজ্ঞানী

পবননন্দন, তুমি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রামের দূত বলে তোমার পরিচয় দিয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করেছো। এই কাজ তোমারই যোগ্য হয়েছে। মহানুভব ও মহাবীর্যশালী রাম সুযোগ্য ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে লংকায় উপনীত হয়ে রাবণকে পরাজিত করে সীতাকে উদ্ধার করবেন এবং সুদূর লংকাদ্বীপ পর্যন্ত আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারে সহায়ক হবেন। আমরা বানরেরা ইতিমধ্যেই আর্য-ক্ষত্রিয়দের প্রেরণায় তাঁদের উন্নত জীবন-ধারণ প্রণালী, কৃষি, শিল্প, জ্ঞান ও বিজ্ঞান গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছি। তুমি বানর-শ্রেষ্ঠ, তুমি নিজেকে রামের সেবক মনে করায়, আমরা বানর হিসেবে সকলেই গর্ব অনুভব করছি।'

উপস্থিত বানরনায়কদের এবং সৈন্যদের মুখে এবং চোখে সুগ্রীবের উক্তির প্রতি এক বিশাল সমর্থন সূচিত হলো। এই সময়ে হনুমান রামের পদতলে নতজানু হয়ে অস্ফুটস্বরে 'জয় রামসীতার জয়' উচ্চারণ করে প্রথমে রাম এবং পরে লক্ষ্মণের ভাব-গম্ভীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

বানরদের কলকোলাহল স্তব্ধ হতেই হনুমান আগ্রহসহকারে বললেন, 'মাতা জানকী আমাকে জানাতে আদেশ করেছেন যে রাম লক্ষ্মণ যেন অচিরে সসৈন্যে লংকায় উপনীত হয়ে রাক্ষসদের কবল থেকে তাঁকে মুক্ত করেন। তবেই রাক্ষসাধিপতি রাবণের গর্হিত ও নিষ্ঠুর আচরণের যোগ্য উত্তর দেওয়া হবে।'

হনুমানের উক্তিতে উৎসাহিত হয়ে সুগ্রীব বললেন, 'হনুমান, জনকনন্দিনী সীতা ক্ষত্রিয়া রমণীর উপযুক্ত কথাই বলেছেন। তার উপরে রামের মতো অতুলনীয় বীর্য এবং লক্ষ্মণের মতো অসামান্য পরাক্রমের অধিকারী যথাক্রমে তাঁর পতি এবং দেবর। আমরা বানরেরা সর্বান্তঃকরণে এঁদের কাজই নিজেদের কাজ বলে সম্পন্ন করবো।'

হনুমান, সুগ্রীব এবং সমগ্র বানরকুলের মনের কথা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে রামের হৃদয়ে পুলকে চঞ্চল হলো। রামের অনুপম বদনমণ্ডলে বিষাদ ও হর্ষের এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

* * * *

এইবার নীরবতা ভঙ্গ করে রাম আবেগের সঙ্গে বললেন, 'বৎস হনুমান, আমাদের ভীষণ শত্রু রাবণকে কেমন দেখলে? কেমন দেখলে লংকাপুরীকে? কি করেই বা সীতার সন্ধান পেলে? একটু সবিস্তারে বলো। আমি সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করার চেষ্টা করি। এখন আমাদের কাজের পরিকল্পনা করতে হবে।'

লক্ষ্মণ উপলব্ধি করলেন যে রামও ভবিষ্যতের অদৃশ্য হাতের সংকেত যথাযথভাবেই পাঠ করেছেন। তাই শত্রুর সম্বন্ধে রামের আগ্রহ এত অধিক! কোন শত্রুর শক্তিকে অবজ্ঞা করা রামের স্বভাববিরুদ্ধ। তার উপর সমুদ্র অতিক্রম করার সমস্যা তো আছেই।

হনুমান রামের প্রশ্নের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করে বিনীতভাবে বললেন,—'প্রভু, স্বর্ণলংকার ঐশ্বর্য, আড়ম্বর ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বর্ণনা ভাষায় সম্ভব নয়। রাবণের প্রাসাদে আমি গভীর রাত্রিতে প্রবেশ করেছিলাম। বৃহৎ ও রত্নশোভিত স্তম্ভের উপর বিন্যস্ত বিশাল কক্ষগুলি যেন ইন্দ্রপুরীর আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করে! বিলাস ব্যসনের চিহ্ন সর্বত্র বিরাজিত। রাবণকে প্রথমে আমি নিদ্রিত অবস্থায় দেখেছি। সেই বিরাট দেহের অধিকারী রাবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, সকলেই তার ভয়ংকর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হবেই। আমি যখন ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে পাশবদ্ধ হয়ে লংকার রাজসভায়

নীত হয়েছিলাম, তখন জাগ্রত রাবণকে দেখে তার সুপ্ত অবস্থার ভয়ংকরত্বই আমার মনে বারবার উদয় হয়েছে। রাবণ যে অসীম শক্তির আধার সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।'

হনুমানের বিবরণ সকলেই অভিনিবেশ সহকারে শুনছিলেন। সময়ে সময়ে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্ববান, নীল, নল প্রভৃতির মুখের ভাব পরিবর্তিত হচ্ছিল। হনুমান এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মুখের প্রতি লক্ষ্য করে সরস কণ্ঠে বললেন, 'রাবণের নিদ্রিত পুরীতে প্রবেশ করে আমি রাক্ষসরাজের এবং রাক্ষসীদের কাম ও সম্ভোগ চরিতার্থ করার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত হয়েছি। আবার কোন কোন প্রকোষ্ঠে ব্রহ্ম-রাক্ষসদের মুখনিঃসৃত বেদমন্ত্র উচ্চারণের ধ্বনিও আমার কর্ণে প্রবেশ করেছে। এ এক অদ্ভূত জগত, যেখানে কাম প্রবৃত্তির বিকাশ এবং জ্ঞানের সাধনা যেন হাত ধরাধরি করে চলেছে।'

হনুমান এই পর্যন্ত বলে নীরব হলেন। রামের মনে হলো হনুমান রাবণের সম্বন্ধে নিজস্ব কিছু ধারণা ব্যক্ত করতে ইচ্ছুক, কিন্তু সাময়িক সংকোচ হয়তো তাকে স্তব্ধ করেছে। রামের ইঙ্গিতে উপস্থিত সকলে হনুমানের পরবর্তী উক্তির জন্য অপেক্ষা করেন।

হনুমান কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত। অতঃপর নীরবতা ভঙ্গ করে উদাস কণ্ঠে হনুমান বললেন, 'রাবণের ভ্রাতা বিভীষণকে অত্যন্ত বিজ্ঞ এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতির বলে মনে হলো। বিভীষণ রাবণকে সকল সময়েই সুদপদেশ দেন। বিভীষণই আমার ত্রাণকর্তা, কারণ তিনি 'দূত অবধ্য' এই কথা মনে করিয়ে দেওয়ায় রাবণ আমাকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। শুধু আমার লাঙ্গুলটি রাবণ অগ্নিদগ্ধ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। আমিও লংকাকে অগ্নিদগ্ধ করে প্রতিশোধ নিয়েছি।'

কিছুক্ষণ নীরবে সকলের মনের প্রতিক্রিয়া বুঝবার চেষ্টা করে হনুমান পুনরায় বললেন 'লংকায় নিয়ে গিয়ে রাবণ এখনও জানকীকে স্পর্শ করেন নি। কিন্তু তাঁকে রামের নিকট ফিরিয়ে দিতেও রাবণ আগ্রহী হন নি। রাবণের রাক্ষস সহচরেরাই তাঁকে এই রকম পরামর্শ দিয়েছে, বোধ হয়। তারা একেবারেই বিভীষণের মতো সাধুচরিত্র এবং ন্যায়নিষ্ঠ বলে মনে হলো না। কিন্তু রাবণ নিজে ধর্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ এবং সুপণ্ডিত। রাবণ, রামকে রাক্ষসদের ভীষণ শত্রু বলে মনে করে রামের প্রতি বিদ্বেষে এবং অবজ্ঞায় পরিপূর্ণ। জনস্থানে রামের রাক্ষস নিধনের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যই রাবণ সীতাকে বন্দী করে রেখেছেন, এই আমার ধারণা। রাক্ষসদের রীতি, নীতি ও মানসিকতার দিক থেকে এতে কোন অপরাধ নেই। কিন্তু বিভীষণের 'দূত অবধ্য', এই যুক্তি রাবণ অনায়াসেই মেনে নিয়েছিলেন। রাবণের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে অনেক বৈপরীত্যের সূত্র লুকিয়ে আছে, বলেই আমার বিশ্বাস।'

হনুমান অতঃপর লংকাপুরীর বিশদ বর্ণনা দিয়ে সকলের ঔৎসুক্য নিরসন করলেন। হনুমান লংকার চারটি প্রবেশ পথের উল্লেখ করে বললেন, 'এক দুর্লঙ্ঘ প্রাচীরের দ্বারা পুরী বেষ্টিত এবং অসংখ্য রাক্ষস এই প্রবেশ দ্বারগুলির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত। পর্বতের শীর্ষে নানারূপ বৃক্ষের সমারোহ। বহুবিধ ফলদায়ী তরুরাজী বাহিরের এবং অভ্যন্তরের উদ্যানকে সমৃদ্ধ করেছে। রাবণের প্রাসাদ পরিক্রম করে রাত্রির শেষে আমি অশোকবনে একটি নারিকেল বৃক্ষের শাখায় গিয়ে বিশ্রাম করলাম। কিছু ফলমূল আহার করে আমি মনে মনে প্রভু রামের সংকল্পের কথা চিন্তা করলাম —জানকীকে উদ্ধার করতেই হবে।'

রাম হনুমানের ভাবপ্রবণতায় বিচলিত হয়ে নীরবে অশ্রুপাত করছিলেন। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের এই কাতরতাকে দূর করার জন্য প্রশ্ন করলেন, 'বীর হনুমান, তোমার বল, বিক্রম, বুদ্ধি ও কৌশল, সবই তুলনাহীন। তুমি নিশ্চয়ই অবিলম্বেই বৈদেহীকে অশোকবনেই দেখতে পেয়েছিলে?'

—'হ্যাঁ রামানুজ, আপনার অনুমান নিভুল। অশোকবনে গিয়ে চার দিকে তাকিয়ে একদিকে প্রকৃতির অজস্র সৌন্দর্য ও অন্যদিকে রাক্ষসদের শিল্প ও রুচিজ্ঞানের সমন্বয় দেখে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। হয়তো ক্ষণিকের জন্য নিজেকেই ভুলেছিলাম আমি। এমন মনোরম স্থান, এমন মনোহর উদ্যান আমি আর কোথায়ও দিখি নি। পুষ্প, পত্র ও ফলে পরিপূর্ণ বৃক্ষের শাখায় পক্ষীর গুঞ্জন, উদ্যানে বিচিত্রবর্ণের মৃগসমূহের বিচরণ, ময়ূরের নৃত্য—এই সব নয়নলোভন শব্দ ও দৃশ্য আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। দূরে স্বচ্ছ জলের সরোবর, একে নদী বলেই ভ্রম হয়। এইবার আমার ধৈর্যের পুরস্কার আমি পেলাম। উদ্যানে এক বৃক্ষ থেকে অপর বৃক্ষে লম্ফ প্রদান করতে করতে সকলের অগোচরে আমি একটি শিংশপা বৃক্ষের নীচে বেদীর উপর অপরূপ সুন্দরী এক নারীরত্নকে বিষাদে ম্রিয়মাণ হয়ে উপবিষ্ট দেখলাম।'

হনুমানের অশোকবনের বর্ণনায় সকলে এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে হনুমান নীরব হবার পরেও কেউ কোন প্রশ্ন করলেন না। হনুমান গভীর সহৃদয়তার সঙ্গে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের মুখের প্রতি লক্ষ্য করলেন। এঁরা প্রত্যেকেই স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলেন যে হনুমানের মুখ এক স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে।

অন্য কেউ কিছু মন্তব্য করার আগেই হনুমান বললেন, 'আমার চিনতে ভুল হয় নি। রাক্ষসীদের নিরন্তর রাবণপ্রশস্তিতে বোধহয় সীতার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। আর রাবণের প্রতি বার বার অবহেলা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করে সীতাও বোধহয় সেই বিকৃতবদনা কুটিলনয়না রাক্ষসীদের বিরক্তি উৎপাদন করেছিলেন। অতি প্রত্যূষে রাক্ষসরাজ নিজে এসে দেবী জানকীর সম্মুখে একখন্ড তৃণ স্থাপন করে নানারূপ অনুনয় ও বিনয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু দেবী রাম ভিন্ন দ্বিতীয় পুরুষকে কোন মতেই হৃদয়ে গ্রহণ করবেন না। রাবণ নিরাশ হয়ে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হন। কিন্তু তথাপি একটি শালীনতাবোধ রাবণকে সীতার উৎপীড়ন থেকে নিবৃত্ত করে। নতশিরে রাবণ প্রস্থান করলে, আমি সেই অপূর্ব লাবণ্যময়ী ও মাতৃস্বরূপিনী রমণীকে সীতা মনে করে তাঁর নিকটে গিয়ে বৃক্ষ শাখা থেকে রামের গুণকীর্তন করতে আরম্ভ করলাম। তারপরে ধীরে ধীরে তাঁর বিশ্বাস উৎপাদন করে আমি তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। সেই শোকগ্রস্ত রমণীই যে সীতা তাঁর মুখ থেকে এই কথা জেনে আমিও মহাত্মা রামের প্রদত্ত অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় তাঁর হাতে দিলাম। তিনি আমার উপস্থিতিতে বিস্ময় প্রকাশ করলেও অবশেষে আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হলেন। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর উদ্ধারের প্রচেষ্টার কথা জানালাম। তিনি রাম লক্ষ্মণ দুজনের কুশল সংবাদে আনন্দিত হয়ে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। তিনি বললেন যে রাম ও লক্ষ্মণ যেন অবিলম্বে লঙ্কায় এসে তাঁকে পরিত্রাণ করে, অন্যথায় তাঁর পক্ষে দীর্ঘদিন জীবিত থাকা সম্ভব হবে না। তিনি আরও জানালেন যে বিভীষণের পত্নী সরমা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছেন। আমি তাঁকে সত্বর উদ্ধারের আশ্বাস দিয়ে, তাঁকে প্রণাম করে এবং তার সঙ্গে দেখা হবার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর শিরভুষণ, দিব্য মণিটি অভিজ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করলাম।'

হনুমানের দীর্ঘ বিবরণে কেউ ক্লান্তি অনুভব করেন নি। রাম হনুমানের নিকট অন্য কিছু সংবাদও আশা করেছেন।

হনুমান যেন রামের মনের ভাবটি পাঠ করে বললেন, 'লংকায় অগ্নি দহনের আগে রাক্ষসদের সঙ্গে আমার কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধও হয়েছিল, এবং তারা তীর ধনুক ছাড়াও নানা প্রকারের অস্ত্র যথা পরিঘ, পট্টিশ, ভল্ল, গদা, শূল প্রভৃতি ব্যবহার করেছিল। রাবণের যোগ্য পুত্র ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে আমাকে বন্ধন করেছিল। আমি তখনই রাবণের সভাগৃহে তাঁর মন্ত্রীবর্গ, সেনাপতিগণ ও ভ্রাতা বিভীষণকে দেখলাম।'

হনুমান যেন নিজেই এবার ক্লান্ত হয়েছেন। কিষ্কিন্ধ্যারাজ সুগ্রীব অগ্রসর হয়ে এই মহাবীরকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'আমরা বানরেরা মহাপ্রাজ্ঞ এবং শূরশ্রেষ্ঠ হনুমানের নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি না থাকলে লংকায় গিয়ে সীতার খোঁজই কেউই আনতে পারতো না। এখন আর ভয় নেই। রাম ও লক্ষ্মণ এবার আমাদের সাহচর্যে লংকায় উপস্থিত হয়ে রাক্ষসকুলকে সমূলে ধ্বংস করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জানকীকে উদ্ধার করবেন। এখন আমরা একদিন বিশ্রাম করি। তারপরেই আমরা যুদ্ধে যাত্রা করবো এবং সমুদ্র লঙ্ঘনের উপায় উদ্ভাবন করবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা কৃতকার্য হবোই।'

এইবার বানরসেনা রাম, লক্ষণ, সুগ্রীব এবং হনুমানের প্রতি জয়ধ্বনি প্রদান করলো। সমগ্র পর্বতশৃঙ্গ এই বিশাল সেনাবাহিনীর কলরবে এবং অঙ্গভঙ্গীতে অসংখ্য লহরীসমন্বিত সমুদ্রের মতো উত্তাল হলো।

নবম পরিচ্ছেদ

সাক্ষাৎ কালান্তক যমের আকৃতি হনুমানের হাত থেকে বিপন্ন লংকা শেষ পর্যন্ত নিষ্কৃতি লাভ করলেও লংকেশ্বর রাবণের মনে শান্তি নেই। এক সামান্য বানর এসে লংকার ক্ষতি করলো, বহু রাক্ষস বধ করলো, সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো এবং নিজেকে রামের দূত বলে পরিচয় দিয়ে অযাচিতভাবে সীতাকে রামের নিকট প্রত্যর্পণ করার উপদেশ দিয়ে গেলো! হনুমানের দাপটে রাবণ মনে মনে লজ্জিত, অপমানিত, শঙ্কিতও বটে।

মন্ত্রণা সভায় উপস্থিত হয়ে রাবণ বললেন, 'অসংখ্য বানর সৈন্য নিয়ে রাম লংকা আক্রমণ করতে আসছে। তোমরা তার কি প্রতিবিধান করতে পারো, সকলে একমত হয়ে স্থির করো।'

রাক্ষসগণ বিপক্ষের শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং নীতিজ্ঞান বর্জিত। রাবণের মন্ত্রী ও সেনাপতিরা সেই আগের পরামর্শেরই পুনরুক্তি করলেন।

তাঁরা রাবণের জয়ের দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ করে বললেন, 'মহারাজ, আপনি পাতালে নাগদের নির্যাতিত করেছেন, কৈলাসশিখরবাসী কুবেরকে পরাজিত করে তাঁর পুষ্পক রথ অধিকার করেছেন, বরুণের পুত্রগণকেও পরাস্ত করেছেন। দানবরাজ ময় তাঁর কন্যা মন্দোদরীকে আপনার হাতে সম্প্রদান কোরে আপনার সঙ্গে সন্ধি

করেছেন। ইন্দ্রের মতো শক্তিশালী বহু ক্ষত্রিয় বীরকে আপনি বধ করেছেন। আপনার সৈন্যবল প্রচুর এবং অস্ত্রসম্ভার অকল্পনীয়। আপনি অস্ত্রশস্ত্রহীন সামান্য বানরদের ভয়ে ভীত হচ্ছেন কেন?'

প্রহস্ত জোড়হস্তে রাবণের প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করে দর্পিতভাবে বললেন,—'রাক্ষসরাজ, দেব, দানব, গন্ধর্ব সকলকেই আমি অনায়াসেই পরাজিত করতে পারি, রাম লক্ষ্মণ তো তুচ্ছ। আমাদের সাময়িক দৌর্বল্যের সুযোগ নিয়ে হনুমান আমাদের বঞ্চনা করেছে। কেউই আমরা তাকে শত্রুর চর বলে সন্দেহ করি নি। আপনি নির্ভয়ে থাকুন, এবার হনুমান এলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।'

প্রহস্তের বাক্যে রাবণের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। ক্রমে দুর্মুখ, বজ্রদংষ্ট্র, নিকুম্ভ, মহাকায়, বজ্রহনু, ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত সকলেই রাবণকে এই বলে আশ্বাস দিলেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা সমগ্র বানর সৈন্য সমেত রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতি সকলকেই ধ্বংস করবো। লংকার মাটিতে পা দিলে, আর তারা কেউই প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।'

সভা ভঙ্গ করে রাবণ নিজের প্রাসাদে গেলেন। মন্দোদরী রাবণের চিন্তাগ্রস্ত আননে এক অস্বস্তির চিহ্ন লক্ষ্য করে মনে মনে শংকিত হলেন। হনুমানের ভয়াবহ স্মৃতি রাজ্ঞী মন্দোদরীর স্মৃতিপটে সজীব ছিল। হনুমানের বিক্রমের কথা চিন্তা করে রাবণের মতো মন্দোদরীর চিত্তও শংকাকুল। কিন্তু মন্দোদরীর শত অনুরোধ সত্ত্বেও রাবণ সীতাকে ত্যাগ করবেন না।

* * * *

পরের দিন প্রভাতকালে শুচিস্নাতা মন্দোদরী আপন বিলাসবহুল প্রকোষ্ঠ থেকে বিভীষণকে রাবণের নিকটে আসতে লক্ষ্য করলেন। রাণী মন্দোদরী আশংকা করলেন যে নিশ্চয় অন্য কোন বিপদের সূচনা হয়েছে, যে জন্য দেবর বিভীষণ রাক্ষসপতির নিকট আসছেন। মন্দোদরী অলিন্দে এসে বিভীষণের সঙ্গে মিলিত হলেন।

বিভীষণ রাবণের নিকট এসেছিলেন, মধ্যে মন্দোদরীর সাক্ষাৎ পেয়ে মনে মনে পুলকিত হলেন। কিন্তু বিভীষণের বাহ্যিক আকৃতিতে এই হর্ষের ভাব প্রকাশিত হলো না।

বিভীষণই প্রথমে কথা বললেন, 'রাজ্ঞী মন্দোদরী, রাক্ষসরাজের সুনিদ্রা হয়েছে তো? তিনি কি উদ্যান-মন্দির থেকে পূজা, হোম প্রভৃতি শেষ করে ফিরে এসেছেন?'

শুষ্ক বদনে মন্দোদরী বললেন, 'কেন দেবর বিভীষণ, প্রত্যুষেই রাজার খোঁজ করছ কেন? আবার কোন বিপত্তি ঘটে নি তো!'

রাণীর সুকুমার দেহলতাটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিভীষণ প্রকোষ্ঠের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ইঙ্গিত করলেন। মন্দোদরী মনে ভাবলেন যে বিভীষণ তাঁকে প্রকোষ্ঠের ভিতর যেতে অনুরোধ করছেন। হয়তো কোন গোপন কথা বলবেন। তিনি ইঙ্গিতে দেবরকে অনুসরণ করতে বলে প্রকোষ্ঠের দিকে অগ্রসর হলেন।

কিন্তু বিভীষণ কিঞ্চিৎ নিরাশ হলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে রাবণ প্রকোষ্ঠে আছেন কিনা। রাবণের সঙ্গে মিলিত হবার আগে তিনি লংকেশ্বরীকে দু' একটি কথা একান্তে বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বোঝার ভুলে তা আর হলো না।

বিভীষণ রাবণের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে স্তব্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে রাবণ চিন্তিত

আননে পালঙ্কের উপর বিশ্রাম করছেন। রাবণের দেহে এখনও পূজার বেশ, রাজবেশ ধারণ এখনও করেন নি তিনি। বিভীষণ ইঙ্গিতে মন্দোদরীকে থাকতে বললেন।

ক্ষণিক অপেক্ষার পরে রাবণ চক্ষু উন্মীলিত করলেন। প্রথমেই লক্ষ্য করলেন যে মন্দোদরী আনত বদনে কক্ষের মধ্যস্থলে অপেক্ষা করছেন।

অন্য কিছু উপলব্ধি করার আগেই শিয়রে অপেক্ষামান বিভীষণ বিরস বদনে বললেন, 'মহারাজ, আপনি আমার কথায় গুরুত্ব না দিলেও, আমি এই অসময়ে আপনার নিকটে না এসে পারলাম না। হনুমান লংকায় এসে বিভীষিকা সৃষ্টি করার পরে অনেকের মনেই ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। পুনরায় অনেক দুর্লক্ষণও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আপনি আমার হিতবাক্য শুনুন। অবিলম্বে সীতাকে রামের হাতে সমর্পণ করুন, এবং আর্যদের সঙ্গে সন্ধি করুন। নচেৎ রাক্ষসদের সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে।'

রাবণ ইতিমধ্যে পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট হয়ে রোষকষায়িত নয়নে বিভীষণের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। বারবার কনিষ্ঠ বিভীষণ একই কথা বলে। কিন্তু কি কোরে তা সম্ভব! রাক্ষসদের মান, মর্যাদা, আত্মপ্রত্যয়, যুদ্ধনৈপুণ্য সবই কি বৃথা! সামান্য এক মানবীর জন্য কেন রাবণ এত হীনতা স্বীকার করবেন। বিভীষণের দুশ্চিন্তা অমূলক।

অত্যন্ত রুক্ষ স্বরে রাবণ বললেন, 'হনুমানের উপস্থিতি যে কজনের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছে, তার মধ্যে তুমি নিশ্চয় একজন। তুমি ধর্মভীরু আমি জানি, কিন্তু তুমি যে কাপুরুষ তা আমি জানতাম না। বিভীষণ, তুমি তো নিজের কানেই শুনেছ যে আমার মন্ত্রীরা এবং সেনাপতিরা সকলেই এক বাক্যে বলেছে যে আমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। রাম, লক্ষণ, সুগ্রীব, হনুমান যত বানর সৈন্য নিয়েই এখানে আসুক না কেন, আমাদের উন্নত রণ-নৈপুণ্যের সামনে সকলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বিভীষণ, সত্য বলতো, তুমিও কি নিজেও তাই মনে করো না?'

রাবণের আত্মম্ভরিতায় মনে মনে দুঃখিত হন রাণী মন্দোদরী। দেবরের প্রতি স্বামীর এই বিতর্কিত প্রশ্নের মধ্যে তাঁর কিছু বলা সঙ্গত নয় জেনেও মন্দোদরী মন্থর গতিতে রাবণের সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'রাক্ষসরাজ, আপনি আপনার শ্রেষ্ঠ হিতৈষী দেবর বিভীষণের কথায় কর্ণপাত করছেন না কেন? হায়, আপনি মন্ত্রীদের কুপরামর্শে নিজে মজবেন, লংকাকেও মজাবেন! হনুমানের আকস্মিক আগমন কি আপনাদের চোখ ফোটায় নি? কেন এক সামান্যা মানবীর জন্য, সে যত লাবণ্যময়ী হোক, আপমার সোনার লংকাকে আপনি ছারেখারে দেবেন? মহারাজ আপনি এখনও দেবর বিভীষণের পরামর্শ গ্রহণ করুন, সীতাকে ফিরিয়ে দিন। তা হলে রাম আর লংকা আক্রমণ করবেন না।'

মন্দোদরীর বলিষ্ঠ বচনে বিভীষণ অনুপ্রাণিত বোধ করেন। জ্যেষ্ঠ রাবণ তাঁকে কাপুরুষ বলে অভিহিত করলেও, মন্দোদরীর নৈতিক ভর্ৎসনা রাবণের প্রতি তাঁর মনের ক্ষোভকে মুহূর্তের মধ্যে মন্দীভূত করে। লংকার ভবিষ্যৎ ও রাক্ষসদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাই অগ্রগণ্য।

মন্দোদরীর তীব্র বাক্যে রাবণের গম্ভীর মুখমণ্ডলে এক ভয়ংকর প্রতিহিংসার চিহ্ন প্রস্ফুটিত হয়। রাবণের অঞ্জনবর্ণ আননটি অপমানে স্ফীত হয়। রাবণের কর্ণমূল আরক্ত, চক্ষে কুটিল দৃষ্টি।

রাবণ বিভীষণকে উপেক্ষা করে মন্দোদরীর সুন্দর আননের উপর তীব্র দৃষ্টি

নিক্ষেপ করে কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'ছিঃছিঃ রাণী মন্দোদরী। তোমাকে শত ধিক। তুমি কি তোমার পতিকে তোমার দেবর বিভীষণের মতোই কাপুরুষ মনে করো নাকি!'

রাবণের কণ্ঠে তীক্ষ্ণ ও নির্দয় শ্লেষ। বিভীষণ রাবণের এই বার বার কাপুরুষ সম্বোধনে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেন। ক্ষোভে, দুঃখে বিভীষণের হৃদয় জর্জরিত হয়। কত অপমান তিনি সহ্য করবেন! কিন্তু বিভীষণ জ্যেষ্ঠের হিতকামী। রাবণ তো সকলের সম্মুখে এখনও তাঁকে অপদস্থ ও বিদ্রূপ করেন নি। কিন্তু রাবণ সীতাকে কোন মতেই ত্যাগ করবেন বলে মনে হয় না। দেখা যাক, রাজ্ঞী মন্দোদরীর তিরস্কারে জ্যেষ্ঠের চৈতন্যোদয় হয় কিনা।

মন্দোদরীর মধুর বচনে বিভীষণ সম্বিত লাভ করলেন। বিভীষণ ইতিমধ্যে রক্ষরাজের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

বিভীষণ শুনলেন মন্দোদরী রাবণকে বলছেন, 'মহারাজ, মার্জনা করবেন এই অভাগিনী মন্দোদরীকে। পরনারীকে চোরের মতো অপহরণ করা কি কাপুরুষতার পরিচায়ক নয়? আপনি আবার দেবর বিভীষণকে কাপুরুষ বলছেন! আপনার যে সমস্ত অপদার্থ মন্ত্রী ও সেনাপতিরা আপনার এই চৌর্যবৃত্তিকে সমর্থন করছেন, আপনাকে অভয় দিচ্ছেন, আমি বলবো তাঁরা নিজেরাও কাপুরুষ। এক সামান্য বানর এসে লঙ্কায় প্রলয় ঘটিয়ে দিল, তাকেও তাঁরা শায়েস্তা করতে পারেন নি! আপনি অনুগ্রহ কোরে আপনার নিজের ও দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করুন।'

মন্দোদরীর তির্যক বাক্যে এবং মন্ত্রীদের উপদেশ সম্বন্ধে রাণীর তীব্র সমালোচনায় রাবণ সাময়িকভাবে শান্ত হন। বিভীষণ মন্দোদরীর সত্যভাষণে মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে রাবণের উদ্দেশে বিনীতভাবে বললেন, 'মহারাজ, সভাকক্ষে সকলেই চাটুকারিতার দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে। আপনি এই অজ্ঞ ও অপরিণামদর্শীদের কথায় চালিত হবেন না। আমাকে কাপুরুষ বললে আমার কিছুই এসে যায় না। কিন্তু স্বদেশ এবং স্বজনদের মঙ্গলের কথা না ভাবলে আপনার কিছুতেই চলবে না। আমিও আপনাকে ক্ষমা করতে পারবো না। মহারাজ, রাজ্ঞী মন্দোদরী অত্যন্ত কঠোর সত্য কথাই বলেছেন। আপনি ধর্মজ্ঞ, শাস্ত্রবিশারদ, নীতিজ্ঞানসম্পন্ন, আপনি রাজনীতি, কুটনীতি সবই ভালোভাবেই জানেন। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে আপনার কি কর্তব্য, তা আপনার নিজেরই স্থির করা উচিত। অবিবেচক এবং স্বার্থপর মন্ত্রীদের উপর নির্ভর করা উচিত নয়।'

বিভীষণের সংযত ও যুক্তিপূর্ণ বচনে স্তম্ভিত হন রাবণ। [illegible] মনে আর একবার এই ধার্মিক, সত্যনিষ্ঠ কনিষ্ঠের প্রশংসা না করে পারেন না। কিন্তু উপায় নেই। বিভীষণের নির্দিষ্ট পথে যাওয়া অসম্ভব। রাক্ষসদের নির্দেশ, রাক্ষসদের পরামর্শ, রাক্ষসদের প্রতিশ্রুতির প্রতি রাক্ষসরাজ রাবণকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেই হবে। তিনি মহাবীর রাবণ, রাম তো কোন ছার!

বিভীষণ নীরবে অপেক্ষা করছেন। রাবণ মুখে সহনশীলতার ভাব প্রকাশ করে বললেন, 'ঠিক আছে, বিভীষণ। আগামীকাল কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হবে। আমি মন্ত্রণা সভা আহ্বান করে সকলের মতামত গ্রহণ করবো। তুমিও সেই সভায় উপস্থিত থেকো। দেখা যাক সকলে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।'

এই বলে রাবণ স্তব্ধ হলেন। কিন্তু রাণী মন্দোদরীকে দেবার মতো কোন উত্তর রাক্ষসরাজের নেই।

বিভীষণ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে মন্দোদরীর স্নেহরক্তিম সুন্দর মুখের দিকে লক্ষ্য করেন। রাণীও বিভীষণের প্রতি অনুমোদনসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। দু'জনের চক্ষেই পরস্পরের প্রতি প্রেম ও নির্ভরতার দৃষ্টি!

রাবণ পালঙ্কে উপবেশন কোরে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হন। বিভীষণ ধীরে ধীরে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। মন্দোদরী এসে স্বামীর বিশাল স্কন্ধের উপর হাতদুটি ন্যস্ত করেন।

* * * *

একবার মাত্র মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিজলীর ঝিলিকের মতো রাবণের সংশয়ক্লিষ্ট হৃদয়ে মন্দোদরী এবং বিভীষণের চিন্তার অভিন্নতার কথা উদয় হয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই অন্য চিন্তার অশান্ত স্রোত এসে আগের চিন্তাকে বিলুপ্ত করে।

রাবণ বিভীষণের অভিমত একাধিকবার শুনেছেন। মনে মনে বিচার বিবেচনা করে বিভীষণের উপদেশের সততা এবং আন্তরিকতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছেন।

কিন্তু বিভীষণের মনোবৃত্তি রাক্ষসোচিত নয়। কিশোর তরণীসেন রাবণের বিশেষ অনুগত। রাবণ অনুভব করেন, তরণীসেনও যেন এই সীতার অপহরণের জন্য মনে মনে সন্তুষ্ট নয়। ইন্দ্রজিৎ এবং রাবণের অন্য পুত্রেরা কিন্তু নিঃসংকোচে পিতার কাজকে সমর্থন করেছেন। মানুষ রামের প্রতি তাদের গভীর অবজ্ঞা। এরা সকলেই নিশাচর ও মায়াবী রাক্ষসের মনের প্রতিচ্ছবি।

কনিষ্ঠ বিভীষণই এই রাক্ষসকুলে এক অসামান্য ব্যতিক্রম! রাক্ষসের তামসিকতার অস্তিত্ব বিভীষণের মধ্যে নেই। ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ মনে প্রাণে, আহারে বিহারে, প্রকৃত রাক্ষস। তার অভিমত এখন রাবণের নিকট ভীষণভাবে অভিপ্রেত।

কুম্ভকর্ণ সহায় থাকলে তিনি কাউকেই গ্রাহ্য করেন না। কুম্ভকর্ণ একাই লক্ষ লক্ষ বানর সেনাকে বধ করতে সক্ষম। হনুমানের দৌত্য রামের সঙ্গে রাবণের আসন্ন যুদ্ধের সংকেত মাত্র। সেই যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ রাক্ষসদের প্রধান ভরসা।

মন্ত্রণাসভায় রাবণ স্বীকার করলেন তাঁর সীতার প্রতি দৌর্বল্যকে এই বলে, 'এই অসামান্য রূপবতী নারীকে ভোগ করার জন্য আমি দৃঢ়সংকল্প। এই মানবী রাক্ষসদের পরম শত্রু রামের ভার্যা। কিন্তু এখনও আমি সীতার দেহ ভোগ করার সম্মতি লাভ করি নি। ইতিমধ্যে হনুমান এসে যুদ্ধের হুংকার দিয়ে গেছে এবং লঙ্কার অবর্ণনীয় ক্ষতি করে গেছে।'

কিছুক্ষণ বিরতির পরে সভাগৃহের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে রাবণ পুনরায় গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'রাম ও তার মিত্রসেনা দুস্তর সাগর পার হয়ে আসবে কিভাবে জানি না। কিন্তু এক সামান্য বানর তো তাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করে গেছে। এখন তোমরা বলো, কেমনভাবে রাক্ষসদের মান, সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে। তোমরাই উপায় নির্ণয় করো, যাতে সীতাকে প্রত্যর্পণ না করতে হয়, এবং এই দুই ক্ষত্রিয় রাজপুত্র, রাম ও লক্ষ্মণ আমাদের হাতে নিহত হয়।'

রাবণের ভাষণের সমাপ্তিতে পুনরায় স্বর্ণলঙ্কার মণিমুক্তায় আচ্ছাদিত ও কারুকার্য-খচিত মন্ত্রণাগৃহে নীরবতা বিরাজ করলো। বিভীষণ উৎসুক নয়নে কুম্ভকর্ণের প্রতি লক্ষ্য করছিলেন। এক অশান্ত গাম্ভীর্য দৈত্যাকৃতি কুম্ভকর্ণের বিশাল আননটি আচ্ছন্ন করেছিল।

রাবণের অপ্রমত্ত দৃষ্টি কুম্ভকর্ণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হলো। রাবণের

ভাষণে কুম্ভকর্ণ আদৌ প্রসন্ন হন নি। কুম্ভকর্ণের হৃদয়ে রাম ও সীতার ঐশী শক্তির সম্বন্ধে এক ক্ষীণ বিশ্বাস। এ'কথা রাক্ষসরাজ রাবণকে স্পষ্টভাবে বলা যায় না।

কুম্ভকর্ণ জ্ঞানী ও তপস্যাপরায়ণ। দীর্ঘ নিদ্রাই কুম্ভকর্ণকে নিষ্ক্রিয় করেছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা রাবণকে রাজকার্যের পরিচালনায় প্রায় স্বৈরতন্ত্রের পথে যেতে পরোক্ষ-ভাবে সাহায্য করেছে।

মন্ত্রণাগৃহের নিস্তব্ধতা ভেদ করে কুম্ভকর্ণের বজ্রকণ্ঠ নিনাদিত হলো। তাঁর মুখে ক্রোধের চিহ্ন।

কণ্ঠে অল্প বিদ্রূপের সুর মিশিয়ে কুম্ভকর্ণ দৃঢ় কণ্ঠে রাবণকে বললেন, 'তুমি কামার্ত হয়ে বল প্রয়োগ করে রামের পত্নীকে হরণ করে এনেছ। কিন্তু এই কাজ তোমার উপযুক্ত হয় নি। তুমি সীতাকে অপহরণ করার আগে আমাদের জানালে, আমরা অন্যভাবে রামের অন্যায়ের প্রতিবিধান করতাম। কিন্তু মহারাজ, তুমি অগ্র ও পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই এই অসঙ্গত কাজে লিপ্ত হয়েছো। তোমাকে এর ফল ভোগ করতে হবেই। তোমার বিষম শত্রু রাম যে এখনও তোমাকে বিনাশ করেন নি, এই তোমার ভাগ্য।'

কুম্ভকর্ণের তিরস্কারে রাবণ মনে মনে ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু অপরিসীম দৈহিক ক্ষমতার অধিকারী এই ভ্রাতা রাক্ষস শক্তির এক বিরাট স্তম্ভ। তার প্রতি কোন তিক্ত মন্তব্য করতে রাবণ ইচ্ছুক নন।

সভায় এক গভীর উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হয়। উপস্থিত মন্ত্রী, সেনাপতি ও বিশিষ্ট রাক্ষস নায়কদের মনে কুম্ভকর্ণের তির্যক উক্তিতে এক চাঞ্চল্যকর প্রতিক্রিয়া। মাংসভোজী শোণিতপায়ী কুম্ভকর্ণ লংকাধিপতির রাক্ষসোচিত আচরণের এমন কঠোর সমালোচনা করবেন, কেউ কল্পনাও করেন নি। এমন কি বিভীষণও কুম্ভকর্ণের তির্যক উক্তিতে বিস্মিত হন।

রাবণ কুম্ভকর্ণের কটূক্তি নীরবে সহ্য করেন। উপযুক্ত ভ্রাতার বক্তব্যকে যথাযথ গুরুত্ব নিশ্চয়ই দিতে হবে। তবে জ্যেষ্ঠানুগত ভ্রাতৃবৎসল কুম্ভকর্ণ অবশ্যই শেষ পর্যন্ত রাক্ষসনীতিরই সমর্থন করবেন, সন্দেহ নেই।

রাবণের চিন্তাকে সত্য প্রতিপন্ন করে কুম্ভকর্ণ অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'যাই হোক, রাক্ষসরাজ তুমি রামের সঙ্গে যুদ্ধ করার যে দুর্জয় বাসনা প্রকাশ করেছ, আমি তার মর্যাদা রাখবোই। তোমার কোন চিন্তা নেই। রাম তার অমোঘ বাণ নিক্ষেপ করার আগেই, আমি রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভাইয়ের শোণিত পান করে তাদের যমালয়ে পাঠিয়ে দেব। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে জীবন উপভোগ করো। রাম মৃত্যুমুখে পতিত হলেই সীতা তোমার বশীভূত হবে।'

রাবণ কুম্ভকর্ণের সরল দম্ভোক্তিতে আশ্বস্ত বোধ করেন। কুম্ভকর্ণের আস্ফালনকে অবিশ্বাস করার কোন হেতু নেই। মহাবীর কুম্ভকর্ণ একাই একশো।

কুম্ভকর্ণের শেষের উক্তি রাক্ষসদের প্রশংসা ও অনুমোদন লাভ করে। সভাস্থ সকলেরই মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়। শুধুমাত্র বিভীষণকেই ম্রিয়মাণ মনে হয়।

এই সুযোগে মহাপার্শ্ব রাবণকে সমর্থন করার লোভ সংবরণ করতে সমর্থ না হয়ে ধীর ভাবে বললেন, 'মহারাজ, লংকায় আপনিই সকলের প্রভু। আপনি কেন সীতাকে ভোগ করছেন না! আপনি নির্ভয়ে আপনার কামনা চরিতার্থ করুন। কুম্ভকর্ণ

এবং ইন্দ্রজিৎ এই দু'জন পৃথিবীর সব শত্রুকেই নিধন করতে পারেন। আমরা রাক্ষসেরা মনে করি যে সীতাকে ফিরিয়ে দেবার কোন প্রশ্নই নেই। আপনি সর্বতোভাবে রামকে চরম দণ্ড দিতে প্রস্তুত হোন। সমগ্র রাক্ষসকুলই আপনার পিছনে আছে।'

রাবণ মহাপার্শ্বের কথায় অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন, 'ব্রহ্মার একটি অভিশাপের ভয়ে ভীত হয়ে আমি সীতার প্রতি বলপ্রয়োগ করছি না। সীতাকে আমি ইতিমধ্যে তাঁর মনস্থির করার জন্য এক বৎসর সময় দিয়েছি। সীতা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে নি। এখন রামকে নিধন করেই সীতাকে জয় করতে হবে।'

বিভীষণ উপলব্ধি করলেন যে আর তিনি রাবণের সঙ্গে এক নৌকার যাত্রী হতে পারবেন না। রাক্ষসদের প্ররোচনায় এবং কুম্ভকর্ণের নৈতিক সমর্থনে রাবণ সীতাকে অর্পণ না করে রামের সঙ্গে ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হবেন। রাবণ তো সবংশে নিহত হবেনই, সমস্ত রাক্ষসকুল সমূলে বিধ্বস্ত হবে। কনকলংকার গৌরব চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে।

এই চিন্তা বিভীষণের অসহ্য বোধ হয়। বিভীষণ দেহের মধ্যে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করেন।

রাবণের দর্পিত ও স্পর্ধিত বাক্যে ক্ষোভে আত্মহারা হয়ে নিমজ্জিত ব্যক্তির তৃণখণ্ড অবলম্বনে আত্মরক্ষার মতোই বিভীষণ রাবণকে ধর্মের পথে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে শেষ চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হলেন। রাবণের প্রতি ব্যাকুল নয়নে দৃষ্টিপাত করলেন বিভীষণ, কিন্তু রাবণের চক্ষুদুটিতে স্নিগ্ধতার লেশ মাত্র নেই।

অতঃপর ব্যর্থ আর্তনাদের সঙ্গে বিভীষণ বললেন, 'রাক্ষসরাজ, রাম বানরসৈন্য নিয়ে লংকা আক্রমণের আগেই সীতাকে ফিরিয়ে দিন। এ'কথা আমি বার বার আপনাকে বলছি। রামের বল ও বিক্রমের সম্মুখে কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ কেউই দাঁড়াতে পারবে না। ইন্দ্র বা যম, আকাশ অথবা পাতাল কেউই আশ্রয় দিয়ে আপনাকে রামের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। মহারাজ, আপনি আর্যশ্রেষ্ঠ রামের মহাশক্তিকে উপেক্ষা করবেন না।'

প্রহস্ত বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বিভীষণকে বললেন, 'আমরা রাক্ষসেরা দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব কাউকেই ভয় করি না, তবে রামকেই বা অযথা ভয় করবো কেন?'

বিভীষণ উগ্রকণ্ঠে বললেন, 'প্রহস্ত, রামের বাণ যে কত তীক্ষ্ণ এবং রামের সন্ধান যে কত অব্যর্থ তোমাদের সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই। তার উপরে বিশাল বানর, ভল্লুক সৈন্য তাঁর সহায়। তোমরা সকলেই রাক্ষসরাজের শত্রু। তাই তাঁকে সদুপদেশ না দিয়ে মূর্খের মতো ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছ। আমি এখনও লংকেশ্বর এবং রাক্ষসদের মঙ্গলের জন্য সীতাকে রামের হাতে প্রত্যর্পণ করতে বলছি। তোমরা যদি রাজার ও রাজ্যের হিত চাও, তবে রক্ষপতি রাবণকে আমার প্রস্তাব মতো আর্যদের সঙ্গে সন্ধি করাও। বিপক্ষের শক্তি ও সামর্থ্যের যথার্থ বিশ্লেষণ করে যিনি উপদেশ দেন, তিনিই প্রকৃত মন্ত্রী।'

বিভীষণের তেজোদ্দীপ্ত সত্য ভাষণে সভায় কারোরই বাঙনিষ্পত্তি হলো না। এমন কি রক্ষরাজ নিজেও চিন্তাকুল নয়নে ইন্দ্রজিতের মুখের প্রতি লক্ষ্য করছেন।

ইন্দ্রজিৎ রাবণের নৈতিক সমর্থন লাভ করে পরুষকণ্ঠে বললেন, 'কনিষ্ঠতাত, এই রাক্ষসকুলে একমাত্র আপনিই ভীত এবং বলবীর্যরহিত। আপনার না আছে শরীরে তেজ, না আছে হৃদয়ে ধৈর্য। আপনি রাম ও লক্ষ্মণের ভয়ে অনর্থক ভীত হচ্ছেন।

তাদের যে কোন রাক্ষসই বধ করতে পারে। আমি অরিন্দম ইন্দ্রকে পরাজিত করেছি, আমি সেই দুই সামান্য রাজপুত্রকে ভয় করবো কেন?'

ইন্দ্রজিতের নির্বুদ্ধিতায় উত্তেজিত হয়ে বিভীষণ তিরস্কারের সুরে বললেন, 'ইন্দ্রজিৎ, তুমি এখনও বালক এবং অপরিণত বুদ্ধি। তাই তোমার অর্থহীন বাক্য প্রলাপের মতোই শোনাচ্ছে। তুমি তোমার পিতার প্রকৃত হিতৈষীও নও। তাই তাঁকে এই আত্ম-বিনাশকারী হঠকারিতা থেকে নিবৃত্ত করতে পারছো না। বরং তাঁকে মহাপাপে লিপ্ত করে ভয়ঙ্কর পরিণামের পথে পাঠিয়ে দিচ্ছ। এই মন্ত্রণাসভায় এসে মতামত প্রকাশ করার মতো বয়স বা বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা তোমার কোনটিই নেই। যে মূর্খ তোমাকে এখানে এনেছে, সেও তোমার সঙ্গেই নিহত হবে।'

বিভীষণের ভর্ৎসনায় ক্রুদ্ধ ও বিদ্বিষ্ট ইন্দ্রজিৎ, রাবণ ও কুম্ভকর্ণের সঙ্গে দৃ… বিনিময় কোরে অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ কনিষ্ঠতাত, আপনি রাক্ষসকু… অযোগ্য। আপনি রাক্ষসদের মান, সম্ভ্রম সমস্তই নষ্ট করার পক্ষে। আপনি… দেশের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করছেন! আপনার কথায় এবং ব্যবহারে আমরা রাক্ষ… গভীর লজ্জা অনুভব করছি। আপনি কোন সাহসিকতার পরিচয়ই দিচ্ছেন না, … আপনার মনোবৃত্তিতে কাপুরুষতার ছাপই রয়েছে।'

ইন্দ্রজিতের স্পর্ধায় বিভীষণ স্তম্ভিত হন। রাক্ষসরাজের সম্মুখে তাঁরই অপ… বয়স্ক পুত্র পিতৃব্যের অপমান করছেন, সভাকক্ষে, সকলের সমক্ষে! ইন্দ্রজিতের দুর্বিনীত আচরণের এবং রাবণের নীরব প্রশ্রয়ের রূঢ়তায় বিভীষণের হৃদয়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। রাবণের মতো কুম্ভকর্ণও নীরব, নীরব রাবণের মুখ্য মন্ত্রীরা। কেবল ইন্দ্রজিৎ উদ্ধত দৃষ্টিতে যেন বিভীষণকে দগ্ধ করতে বদ্ধপরিকর।

বিভীষণের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে শেষ বাণটি বিদ্ধ করলেন রাবণ নিজে। বিভীষণের শেষ উক্তি রাবণের হৃদয়ে ক্রোধের অগ্নি প্রজ্বলিত করেছে।

রাবণ নিজেকে সংযত করতে অক্ষম হয়ে হৃদয়ের ঘৃণা ও বিদ্বেষের হলাহলে রসনাকে সিক্ত কোরে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'মিত্রের ভেকধারী শত্রুর সঙ্গে এক গৃহে বাস করা সম্ভব নয়। বরং শত্রুকে শত্রু জেনে, এমনকি বিষধর সাপকে নিয়েও একসঙ্গে বাস করা যায়। বিভীষণ প্রমাণ করেছে যে সে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা নয়, সে আমার দুষ্ট জ্ঞাতি, যার কাজ হলো অপর জ্ঞাতির সর্বনাশ সাধন করা।'

অতঃপর বিভীষণকে সম্বোধন করে, রাবণ অত্যন্ত কর্কশভাবে বললেন, 'বিভীষণ, তুমি অত্যন্ত নীচ ও ঈর্ষাপরায়ণ। আমার যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য কিছুই তোমার সহ্য হচ্ছে না। তুমি ভ্রাতৃস্নেহহীন, অনার্য। তোমার সৌহার্দের ছলনা অতি ভয়ঙ্কর। তুমি রাক্ষসকুলের কুলাঙ্গার। তুমি যা বলেছ অন্য কেউ সে কথা উচ্চারণ করলে তার প্রাণ যেত তখনই।'

রাক্ষসরাজ রাবণের মিথ্যা দম্ভোক্তি এবং নির্দয় তিরস্কার বিভীষণের সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করেছে। বিভীষণের মানস চক্ষে তাঁর অনেকদিন আগের দেখা অদৃশ্য পথরেখাটি দৃশ্যমান হলো। বিভীষণের হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার যেন সহসা খুলে গেলো। নিমেষের মধ্যে বিভীষণ তাঁর কর্তব্য স্থির করলেন।

নির্বাক বিভীষণকে লক্ষ্য করে তীব্র বিদ্রূপের সুরে রাবণ বললেন, 'বিভীষণ, তুমি শুধু রাজদ্রোহী নও, তুমি দেশদ্রোহী। তুমি এখনই লঙ্কাপুরী ত্যাগ করো। না হলে, আমি তোমাকে নির্বাসন দণ্ড দিতে বাধ্য হবো।'

আর বিভীষণের মনে কোন দ্বিধাই নেই। বিভীষণের বিবেক, বিভীষণের বুদ্ধি তাঁকে রাবণের সাহচর্য থেকে মুক্তি দিল।

বিভীষণ রাবণের প্রতি ক্ষুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'মহারাজ, আপনি আমার জ্যেষ্ঠ, পিতৃতুল্য এবং মাননীয়। কিন্তু আপনি আজ পথভ্রষ্ট এবং ধর্মচ্যুত। রাক্ষসদের আচরণবিধি এবং রাজধর্মের দোহাই দিয়ে আপনি অধর্মের পঙ্কিল পথে বিচরণ করতে দৃঢ়সংকল্প। আমি আপনার এবং আপনার প্রজাদের হিতৈষী তাই পাপের বিরুদ্ধে, অধর্মের বিরুদ্ধে আপনাকে বারবার সতর্ক করেছি। কিন্তু হায়, যার পতন অবশ্যম্ভাবী, সে কোন হিতোপদেশে কখনই কর্ণপাত করে না! আপনি আমার গুরুজন, আপনার শুভকামনায় যা বলেছি তাতে যদি আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি রাক্ষসদের নিয়ে এই লংকাপুরী রক্ষা করুন। আমি আপনার চক্ষুশূল, আমি বিদায় নিচ্ছি। আপনি সুখী হোন।'

রাবণের মন্ত্রণাসভা নিথর ও নিষ্কম্প। বিভীষণের বিদায়ে সকলের হৃদয়ই দ্রবীভূত। রাবণের ও কুম্ভকর্ণের মুখমণ্ডল বিবর্ণ। কেবল ইন্দ্রজিতই ব্যতিক্রম।

বিভীষণ রাবণের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে গদা হাতে নিয়ে তাঁর চারজন বিশ্বস্ত অনুচরের সঙ্গে সভাগৃহ থেকে নির্গত হলেন। অতঃপর সকলেই অন্তরীক্ষে উঠলেন এবং শীঘ্রই লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তর্হিত হলেন। বিভীষণের হৃদয়ের মুকুরে সরমা ও তরণীসেনের সরল ও নিষ্পাপ মুখ দুটি প্রতিবিম্বিত হলো।

দশম পরিচ্ছেদ

রাবণ ও তাঁর রাক্ষসকুল যা স্বপ্নেও ভাবেন নি, তাইই কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটলো। অবশ্য এই অচিন্তিতপূর্ব সংঘটন তাঁদের গোচরীভূত হলো বেশ কিছুদিন পরে। বিভীষণ যে তাঁর স্ত্রী-পুত্রের কথা চিন্তা না করে নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করলেন, এইটাই সকলের কাছে এক প্রকাণ্ড বিস্ময়। বিভীষণের প্রস্থান যে অদৃশ্য নিয়তিরই ইঙ্গিত, এই কথাই রাক্ষসরাজের চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বারবার ধ্বনিত হলো।

এই নিয়তি সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত ধীরে ধীরে রাবণের মনের মধ্যে উন্মেষিত হচ্ছিল। রাবণের রাক্ষসসত্তা ভেদ করে যে জ্ঞানীর সত্তা, সেই সত্তাতেই যেন স্বতঃই এক অবোধ্য আলোড়নের সৃষ্টি হচ্ছিল। এই দ্বৈত সত্তার অন্তরালে আরও একটি সত্তার অস্তিত্ব হয়তো রাবণ ইতিমধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন। তপস্বী রাবণের মন এই জগৎজোড়া মায়ার আবরণ সরিয়ে সেই অনন্ত ব্রহ্মের প্রতি অনির্বচনীয় আকুলতায় ধাবিত হচ্ছিল বোধ হয়!

এক বিক্ষিপ্ত চিন্তা এবং অস্থির বিশ্লেষণ রাবণের মানসিক স্থৈর্যকে বিঘ্নিত করছিল। রাম রাবণের শত্রু, সুতরাং রামই ছদ্মবেশে রাবণের নিয়তি, এই পর্যন্ত রাবণ অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। যদি নিয়তিই না হবে, তবে এক সামান্য বানর, অসামান্য তার শক্তি হলেও, কেমন করে শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র অতিক্রম করে লংকাপুরীর অকল্পনীয় ক্ষতি করবে, রামের ভার্যা সীতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করবে এবং নিজেকে রামের দূত বলে পরিচয় দেবে!

রাবণের আত্মচিন্তা ক্রমশঃ আরো ঘনীভূত হয়। রাবণ সীতাকে লংকায় নিয়ে আসার পরে তাকে স্পর্শ অবধি করতে সক্ষম হন নি। কেন? সীতা যেন প্রকৃতি-স্বরূপা, অম্লান ও অক্ষত মায়া, যা যেন পুরুষকে ত্যাগ করে এসে সৃষ্টির গতিবেগকে মন্দীভূত করে দিয়েছে!

রাবণ নিজের মনেই বিভ্রান্ত হন, সত্যই কি তাইই এই সীতা! না, না, সীতা তো দেবভোগ্য, এক মানবী, এক দুর্লভ রমণীরত্ন। রাবণের হৃদয়ের দ্বিধা এক দ্বন্দ্বে পরিণত হয় যেন। সীতা যদি কাম চরিতার্থ করার উপযোগী নারী, তবে কেন রাবণ নিজের দেহস্থ কামনার আগ্নেয়গিরিতে সীতাকে আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হন নি!

এই দুরতিক্রম্য ভাবনাজালের যেন শেষ নেই। কেন রাবণের সিংহের মতো দুর্জয় হৃদয় শশকের ভীরু অন্তঃকরণে পর্যবসিত হয়ে সীতাকে নিজের প্রাসাদের কলুষিত পরিবেশে স্থাপন না করে পবিত্র অশোকবনে অস্পর্শণীয় ও অটুট করে রেখেছে! রাবণের মন্ত্রীরা পর্যন্ত রাক্ষসসুলভ ভোগ-প্রবণতায় রাক্ষসরাজকে দৈহিকভাবে সীতাকে অধিকার করার পূর্ণ সম্মতি দিয়েছে। তবে কোন সংশয়, কোন সংস্কার রাবণকে এই শক্তি প্রয়োগে বাধা দিচ্ছে?

তবে কি সেই ভিতরের সুপ্ত তৃতীয় সত্তাটা জ্ঞানের পর্বতপ্রমাণ বাধাকেও দূর করে সীতারূপী মহামায়ার পশ্চাতে সেই মায়ায় আবৃত পূর্ণ ব্রহ্মকে ভক্তিপ্রণত চিত্তে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে! তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে, অনাগত বিপর্যয়ের পূর্ববোধকে রাক্ষসরাজের হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ করছে!

রাবণের হৃদয় এক সুখস্পর্শহীন অথচ অমোঘ পরিণতির উপলব্ধিতে আলোকিত হয়ে উঠছে।

*　　*　　*　　*

বিভীষণ কোথায় গেল, এই প্রশ্ন অপেক্ষা বিভীষণ হয়তো জন্মের মতো চলে গেল, এই মানসিক অস্বস্তি ও ক্লেশ লংকেশ্বর রাবণের ভিতরের গ্লানি ও অতৃপ্তিকে বর্দ্ধিত করে। রাক্ষসদের নিকটে না হলেও বিভীষণের স্ত্রী ও পুত্রের নিকট নিজেকে অপরাধী মনে হয়। ভ্রাতৃবধূর হৃদয়ের শোক ও দুঃখ একমাত্র রাজ্ঞী মন্দোদরীর নিকট জানা যাবে।

মন্ত্রণাসভার পরে রাবণ আপন কক্ষে তরণীসেনকে আহ্বান করেন। কিশোর তরণীসেন পিতার দেশত্যাগের তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি না করলেও, পিতার অনুপস্থিতিতে অত্যন্ত কাতর। একি নির্বাসন না বিতাড়ন না অন্য কিছু, এই প্রশ্নগুলিও তাঁর তরুণ মনকে জর্জরিত করে।

পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত তরণীসেন ব্যাকুল হৃদয়ে জ্যেষ্ঠতাতের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আনত বদনে অপেক্ষা করেন। তাঁর নয়ন অশ্রুপূর্ণ, মুখে বিষদের ছায়া! রাবণ তরণীসেন উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। তরণী সসংকোচে লক্ষ্য করেন যে রাক্ষসরাজের চোখে ও মুখে অপত্যস্নেহের অপূর্ব অভিব্যক্তি। সংকোচ পরিত্যাগ করে তিনি জ্যেষ্ঠতাতের বিস্তৃত বক্ষের নিরাপদ আশ্রয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে নিজেকে সমর্পণ করেন।

কিছুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হবার পরে বিগলিত কণ্ঠে রাবণ বললেন, 'পুত্র তরণী, তোমার পিতা কোথায় গেছেন জানিনে, তবে তিনি তোমাকে লংকায় আমার অধীনেই রেখে গেছেন। বৎস, তুমি এবং তোমার জননী নির্ভয়ে রাজপ্রাসাদে আগের

মতোই বাস করো। তোমাদের মঙ্গলের দায়িত্ব এবং অমঙ্গলের দায় আমার হাতেই থাকবে।'

জ্যেষ্ঠতাতের স্নেহপূর্ণ ভাষণে গভীরভাবে বিচলিত বোধ করেন তরণীসেন। বিলম্ব না করে বিনম্র কণ্ঠে বললেন তরণী, 'জ্যেষ্ঠতাত, পিতা আমার কাছে পরম শ্রদ্ধেয় এবং আপনি তো আমার ধ্যান ও জ্ঞান। পিতার জন্য মন চঞ্চল হলেও, আমি আপনার নির্দেশ মতো কর্তব্য পালন করে যাবো, এবং মাতাকেও আপনার অভয় প্রদানের কথা নিশ্চয়ই জানাবো।

রাবণ তাঁর এই অল্পবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রের বিজ্ঞ ও সপ্রতিভ বচনে আন্তরিক পরিতুষ্টি লাভ করলেন। ধার্মিক বিভীষণের পুত্র যে পিতার মতোই ধর্মজ্ঞ ও কর্তব্যপরায়ণ হবে, এতে রাবণ আশ্চর্য হলেন না।

তরণীসেনকে আরও আশ্বস্ত করতে রাবণ স্নেহজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'পুত্র তরণী, তুমি এই অল্প বয়সেই বুদ্ধিমান এবং ধার্মিক হয়ে উঠেছ। সেই কারণে তোমার উপর আমার তথা দেশবাসীর অনেক প্রত্যাশা। তুমি উত্তমরূপে অস্ত্রশিক্ষায় মনোনিবেশ করো। আমি চাই তুমি বীরত্বে তোমার অন্য ভ্রাতাদের সমকক্ষ হও, তবেই তুমি আমার প্রতি এবং দেশের প্রতি তোমার উপযুক্ত কাজ করতে পারবে।'

রাবণের মুখের প্রশংসায় মনে মনে উৎসাহিত বোধ করে তরণী বললেন, 'জ্যেষ্ঠতাত, আপনি যা উপদেশ দিয়েছেন তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করবো। রাক্ষসদের শত্রু রামের সম্পর্কে আমার মনে যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বই থাকুক না কেন, আমার প্রথম কর্তব্য রাক্ষসাধিপতির প্রতি। পিতা আমাকে বারবার বলেছেন যে স্বদেশ এবং স্বজন অপেক্ষা কোন কিছুই বড় নয়।'

একমাত্র পুত্রকে ভ্রাতা বিভীষণ তার যোগ্য শিক্ষাই দিয়ে গেছে! রাক্ষসরাজের আঁখিতে অশ্রু উদ্বেলিত হবার উপক্রম হয়। তিনি নিজের মনোগত দৌর্বল্যকে আবৃত করার প্রচেষ্টায় নিজেকে প্রাণপণে সংযত করেন, যাতে আবেগ এসে তাঁর রাজকীয় গাম্ভীর্যকে আচ্ছন্ন না করে।

—'ধন্য তুমি তরণীসেন, যে এমন পিতার সন্তান তুমি। পুত্র, তুমি জানবে যে ইন্দ্রজিৎ ও তার অন্য ভ্রাতাদের সঙ্গে সমানভাবেই আমার হৃদয়ে তোমার স্থান। তুমি বীরত্বে ও বিক্রমে রাক্ষসদের উপযুক্ত হও। আমি জানি রাক্ষস প্রবৃত্তির মধ্যে অনেক কিছুর সঙ্গেই তোমার মনের মিল হয় না। সে তোমার নিজস্ব ব্যাপার, কিন্তু দেশ তোমার কাছ থেকে কঠিন কর্তব্যের পরীক্ষাই চাইবে।'

তরণীসেন রাবণের ইঙ্গিতগুলি যত্নের সঙ্গে মনে মনে অনুধাবন করলেন। জ্যেষ্ঠতাতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিমেষের মধ্যেই দ্বিগুণ হলো। এই বিরাট ব্যক্তিত্ব ও বিশাল প্রজ্ঞার অন্তরালে যে দৃঢ় সংকল্পের দ্বৈত স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে এই আদর্শ পুরুষরত্নের হৃদয়ের মধ্যে, তার গভীরতা নিরূপণ করতে তরণীসেন হয়তো পারেন না। কিন্তু তরণীর চক্ষুদুটি আর্দ্র।

রাক্ষরাজের প্রতি তরণীসেনের হৃদয়ের এই দুর্বার গতি অশ্রুধারার মাধুর্যের মধ্যে মহনীয়ভাবে প্রকাশিত হলো। তরণীসেন জ্যেষ্ঠতাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁর পদধূলি শিরে গ্রহণ করলেন।

রাবণের আঁখিদুটিও সিক্ত হলো। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে ভাবপ্রবণতার সঞ্চার অনুভব করলেন তিনি!

তরণীসেনের প্রতি হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহ কণ্ঠের স্বরে প্রকাশ করে রাবণ বললেন, 'তরণী, বিভীষণ যেখানেই গিয়ে থাক, সে অন্যায় ও অসঙ্গত কিছু করবে না, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি আশা করি, শীঘ্রই আমরা তার সংবাদ পাবো। পুত্র, তুমি অস্থির হয়োনা, অথবা মনে দুঃখ পেও না।'

তরণীসেন মুখের বিষণ্নতাকে বিদায় করার প্রচেষ্টায় সম্মতিসূচক হাসির দ্বারা রাক্ষসরাজকে সন্তুষ্ট করলেন। অতঃপর ধীরে ধীরে নত শিরে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করলেন। অদূরে, রাণী মন্দোদরী এই কথপোকথনের মূক সাক্ষী হয়ে নীরবে অশ্রুমোচন করলেন। বিভীষণের স্মৃতি তাঁর হৃদয়ে এক গভীর শোক ও দুঃখের উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করলো। রক্ষরাজ তাঁকে লক্ষ্য করার আগেই তিনি দ্রুতপদে তরণীসেনকে অনুসরণ করলেন।

* * * *

রামের দুর্ধর্ষ বীরত্ব ও বিক্রম বিভীষণের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। রাম বালীকে নিহত করে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে সুগ্রীবকে স্থাপন করেছিলেন। আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তারে আর্যদের উপনিবেশ যে দেশের আরও দক্ষিণে প্রসারিত হবে, এই আশা ভাগবদধর্মী আর্য, অনার্য রাক্ষস, বানর সকলেই পোষণ করেছিলেন। সুদূর লংকায় বসে রাক্ষসরাজ রাবণের অনুজ বিভীষণ রামের তথা আর্যশক্তির অগ্রগতিকে ব্যাকুলভাবে এবং আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন।

বিভীষণ জ্যেষ্ঠ রাবণকে রামের সঙ্গে শত্রুতা ও সংগ্রামে লিপ্ত না হতে বার বার অনুরোধ করেছিলেন। সুতরাং রাবণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিভীষণের যাবার একটি স্থানই ছিল। যে রামের অলৌকিক বীরত্বে তিনি বিস্মিত, যে রামের প্রত্যেক জীবের প্রতি প্রেম ও মৈত্রীর আগ্রহে তিনি মুগ্ধ, যে রামের আর্য সংস্কৃতির প্রসারের ক্ষমতায় তিনি অভিভূত, সেই রামই বিভীষণের একমাত্র আশ্রয় ও গতি।

তাই বিভীষণ তাঁর চারজন অনুচরসহ আকাশ মার্গে বিচরণ করে রাম ও লক্ষ্মণের সান্নিধানে এসে পৌঁছলেন। সভ্রাতা রাম, সুগ্রীব ও তাঁর সৈন্য সামন্তদের নিয়ে সীতার উদ্ধারের পরিকল্পনাতেই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা ইতিমধ্যেই দক্ষিণ সমুদ্রের সমীপবর্তী হয়েছিলেন।

দূর থেকে এই পাঁচটি বলবীর্যসম্পন্ন মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট প্রাণীকে দেখে সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা সংশয়াবিষ্ট হলেন। নিকটে এসে বিভীষণ নির্ভীক অন্তরে গম্ভীর স্বরে বানরদের বললেন, 'আমি সমুদ্রপারের রাক্ষসরাজ রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ। দুর্বৃত্ত রাবণ জটায়ুকে বধ করে সীতাকে লংকায় নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রেখেছেন। বারংবার আমার অনুরোধ ও হিতবাক্য উপেক্ষা করেছেন। রাবণ সীতাকে ফিরিয়ে দিতে সম্মত হন নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের এবং রাক্ষসদের মঙ্গলের জন্য আমি সীতাকে ফিরিয়ে দিতে এবং মহাবল রামের সঙ্গে শত্রুতা না করতে বলা সত্ত্বেও রাবণ আমাকে তিরস্কার করেছেন, সভাকক্ষে সকলের সামনে অপমানিত করেছেন এবং কার্যতঃ লংকা থেকে বিতাড়িত করেছেন। সেই অবস্থায় আমি স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করে লংকা থেকে চলে এসে মহাত্মা রামের শরণাপন্ন হয়েছি। তোমরা শীঘ্র তাঁকে জানাও যে বিভীষণ তাঁর আশ্রয়েই এসেছেন।'

সুগ্রীব বিভীষণের এই অকপট ও সরল উক্তিকে বিশ্বাস করেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর সংশয় এই যে রাক্ষসেরা কামাসক্ত এবং মায়াবী এবং রাক্ষসদের

চর রূপে এরা হয়তো বানরদের মধ্যে ভেদনীতি প্রয়োগ করে হীনবল করতে এসেছে। এরা শত্রু, সুতরাং শত্রুসৈন্যকে গ্রহণ করা উচিত নয়। যে নিজেকে বিভীষণ বলে পরিচয় দিচ্ছে, সেই যে প্রকৃত বিভীষণ, তাইই বা কে জানে!

সুগ্রীব, রাম ও লক্ষ্মণের নিকটে উপস্থিত হয়ে বিভীষণের আগমনের সংবাদ দিলেন এবং রামকে তিনি নিজের অভিমত জানালেন। রামের বদনমণ্ডলে এক অপূর্ব জ্যোতি, এক স্বর্গীয় বৈরাগ্যের স্বাক্ষর। কোন ক্রোধ, বিদ্বেষ ও সন্দেহের ছায়া সেই সুন্দর আননে নেই। সমাগত সকলের বোধ হলো যে রাম সুগ্রীবের মন্তব্যে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। কারণ, মুখে তাঁর মনোমুগ্ধকর হাসি।

রাম মধুর কণ্ঠে হনুমান ও অন্যান্য বানর নায়কদের উদ্দেশে বললেন, 'বানররাজ সুগ্রীবের অভিমত আমি শুনেছি। এইবার তোমরা অভিমত জানাও।'

অঙ্গদ নবীন হলেও চিন্তাশীল। তিনি বিষয়টি ইতিপূর্বেই মনে মনে আলোচনা করেছেন। সুতরাং নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে তাঁর বিলম্ব হলো না।

অঙ্গদ ধীর ভাবে বললেন, 'বিভীষণকে তার গুণ এবং দোষ পরীক্ষা না করেই গ্রহণ করা আমাদের অভিপ্রেত নয়।'

শরভ অঙ্গদকে অনুসরণ করে বললেন, 'বিভীষণকে পরীক্ষা করার জন্য চর প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত।'

জাম্ববানের মতে বিভীষণের আকস্মিক উপস্থিতি সন্দেহেরই উদ্রেক করে। মৈন্দ প্রস্তাব করলেন যে বিভীষণের উদ্দেশ্য সৎ অথবা অনিষ্টকর জানার চেষ্টা করা কর্তব্য।

হনুমান নীরবে মন্ত্রীদের বক্তব্য শুনছিলেন। কোন মন্তব্যই তাঁর হৃদয় স্পর্শ করে নি। এমনকি স্বয়ং কপিরাজের মন্তব্যও নয়।

হনুমান গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বললেন, 'যে ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত, তার কাছে চর পাঠানো নিরর্থক। কারণ, অপরিচিত চরের প্রশ্নে তাঁর মনে শংকা জাগবে এবং তিনি যদি বন্ধুভাবেই এসে থাকেন তবে চরের কথায় তিনি অসন্তুষ্ট হতে পারেন। বিভীষণ অসময়ে অথবা আকস্মিকভাবেও এসে উপস্থিত হন নি। তাঁর কথা থেকেই পরিষ্কারভাবে আমরা জানতে পারছি যে দুরাত্মা রাবণের অনাচারে ও অধার্মিকতায় অসহায় বোধ করে এবং রামের বাহুবলে ও বিক্রমে আকৃষ্ট হয়ে, রাজ্য-কামনায়, সে রামের শরণাপন্ন হয়েছে। তাছাড়া, আমরা বিভীষণের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্যও করি নি। অতএব, আমার অভিমতে এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৃহৎ প্রচেষ্টায় আমাদের বিভীষণকে দলভুক্ত করাই কর্তব্য।'

হনুমানের সুচিন্তিত অভিমত রাম ও লক্ষ্মণ দুজনের হৃদয়েই বিভীষণের প্রতি অনুকূল ভাবের সৃষ্টি করে। তবুও দু'ভ্রাতাই মৌন থাকেন! হয়তো তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের বন্ধু বানরাধিপতি সুগ্রীবের মন এখনও বিভীষণের স্বপক্ষে যায় নি। সুগ্রীব হয়তো এক রাজ্যলিপ্সু রাক্ষসকে বিশ্বাস করার পক্ষপাতী নন।

স্বদেশ ও স্বজনবৎসল সুগ্রীব তাঁর যুক্তিজাল বিস্তার করে বললেন, 'বিভীষণ দুষ্ট অথবা সৎ এসব নির্ণয় করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিভীষণ যে বিপদের সময়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাবণকে ত্যাগ করে এসেছে, এটা স্বদেশদ্রোহিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

সুগ্রীবের উত্তেজিত উক্তিতে বিস্মিত না হয়ে রাম হাস্য সহকারে বললেন, 'শাস্ত্রজ্ঞানী সুগ্রীব বৃদ্ধদের উপদেশ অনুযায়ীই তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে বিভীষণের এই আচরণ স্বজনদ্রোহিতার নিদর্শন। কিন্তু লৌকিক আচরণের

তারতম্যে সূক্ষ্ম কারণে ভ্রাতৃবিরোধ, রাজাদের মধ্যে বিচিত্র নয়। সংকটকালে জ্ঞাতি ও প্রতিবেশী ক্ষতি করার চেষ্টা করে। বিভীষণ আমাদের জ্ঞাতিও নন, প্রতিবেশী দেশের কোন অধিবাসীও নন। হনুমান যা বলেছেন, বিভীষণ যে কোন কারণেই হোক, লংকারাজ্য লাভ করার বাসনাতেই আমাদের কাছে এসেছেন।'

বিভীষণ যে লংকার রাক্ষসনীতির বিরোধী, এ'কথা বন্ধু সুগ্রীব রামকে বলেছিলেন। রাম মনে মনে এই যুক্তির উপর নির্ভর করে সুগ্রীবের সন্দেহ ভঞ্জন করতে সিদ্ধান্ত করলেন।

ক্ষণকাল মৌনতা অবলম্বন করে রাম পুনরায় সপ্রতিভভাবে বললেন, 'তা ছাড়াও, বিভীষণ রাবণের উৎপীড়নের এবং স্বৈরাচারের যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তা থেকে তাঁকে স্বদেশদ্রোহীও বলা চলে না। তিনি লংকার রাজা হলে অন্ততঃ আর্যক্ষত্রিয়দের লাভই হবে। বিভীষণ আর্যদের এবং আমার গুণগ্রাহী না হলে, আমাদের শরণাপন্ন হতেন না।'

রামের জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণেও সুগ্রীবের সন্দেহ ঘুচলো না। পুনরায় উত্তেজিত-ভাবে সুগ্রীব বললেন, 'বিভীষণ যে রাবণের চর, এবং সে যে আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করে, আমাদের হত্যা করবার জন্যই রাবণের পক্ষ থেকেই এসেছে, এ'কথা অবিশ্বাস করার কোন যুক্তি আমি এখনও খুঁজে পাচ্ছি না। অবশ্য আমরা জানি যে রাবণের সঙ্গে বিভীষণের মতের মিল কখনই ছিল না। তবুও, আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে।'

সুগ্রীবের আননে সংশয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে, রাম বিব্রত বোধ করলেন। তিনি প্রথমে অনুজ লক্ষ্মণ এবং পরে হনুমানের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। লক্ষ্মণ ইঙ্গিতে রামকে সমর্থন করলেন। হনুমানের উজ্জ্বল চক্ষুদুটি যেন রামের ধীশক্তি, দূরদৃষ্টি এবং মহানুভবতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, এই কথাই রামের মনে হলো।

মুখে মধুর হাসি প্রস্ফুটিত করে রাম বললেন, 'হে বানররাজ, তুমি অত্যন্ত বিজ্ঞ এবং উদারহৃদয়। তুমি কি স্বীকার করো না যে বিভীষণ কোন দিক দিয়েই আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না! অথচ সে আমাদের দলে এলে আমরা বহুভাবে লাভবান হবো? তা ছাড়া, ভ্রাতঃ সুগ্রীব, মনুষ্যত্বধর্ম আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে শত্রুও যদি আশ্রয় ভিক্ষা করে শরণাপন্ন হয়, তবে তাকে রক্ষা করাই কর্তব্য। অতএব তোমার প্রতি আমার অনুরোধ এই যে বিভীষণকে অভয় দান করে আমাদের নিকটে নিয়ে এসো।'

বিভীষণ রামের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আশ্রয় প্রার্থীর মতো রামের পদতলে পতিত হলেন। রাম, বিভীষণের উন্নত ও বিশাল আকৃতি থেকে বিভীষণের বাহুবলের পরিমাপ অনুমান করলেন। বিভীষণের চারজন সাথীও দৈত্যাকার এবং অত্যন্ত বলশালী বলেই সকলের মনে হলো।

রাম সস্নেহে বিভীষণকে আলিঙ্গন করলেন। রামের অমায়িক আচরণে আশ্বস্ত হয়ে বিভীষণ অবনত বদনে বললেন, 'আমি জ্যেষ্ঠ রাবণ কর্তৃক অত্যন্ত হীনভাবে অপমানিত হয়েছি। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে নির্বাসিত করেছেন। আমি স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ সব পিছনে ফেলে তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। হে ক্ষত্রিয়পুঙ্গব, তুমি আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করো এবং আমাকে তোমার অধীনস্থ বলে বিবেচনা করো।'

বিভীষণের আত্মসমর্পণে রামের হৃদয়ে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার চিত্র প্রস্ফুটিত হলো।

লংকায় উপনীত হয়ে অনেক অদৃশ্য ও অনাগত বাধা ও বিঘ্ন বিভীষণের সহায়তায় অতিক্রম করা যাবে।

* * * *

বিভীষণকে আশ্রিত ও বন্ধু হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে রাম বিভীষণের আত্মসমর্পণের স্বরূপটি নিরূপণ করতে সচেষ্ট হলেন। রাম বিভীষণকে রাক্ষসরাজ রাবণের সামরিক শক্তির একটি নির্ভরশীল মূল্যায়ণ করতে অনুরোধ করলেন। রামের প্রতি বিভীষণের আনুগত্যের গভীরতা বিভীষণের এই প্রশ্নের উত্তর থেকেই বোঝা যাবে। রামের মুখে ও চোখে আগ্রহের চিহ্ন।

বিভীষণ রাবণের প্রতি বিদ্বিষ্ট, অপর পক্ষে রামের আনুগত্য তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। রামও তাঁকে গ্রহণ করেছেন কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি। বিভীষণ ভালোভাবেই জানেন যে রাবণের প্রাণ থাকতে সীতার এবং লংকার মুক্তি সম্ভব নয়। বিভীষণ নিঃসংকোচে রামকে পরিপূর্ণভাবে সাহায্য করতে মনে মনে কৃতসংকল্প হলেন।

রাম অধীর আগ্রহে বিভীষণের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রামের স্বার্থ বিভীষণের নিকট কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা' এইবার জানা যাবে।

বিভীষণ আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে বললেন, 'হে আর্যশ্রেষ্ঠ, আমি তোমাকে প্রথমেই বলে রাখি যে আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লংকেশ্বর রাবণ ব্রহ্মার বরে প্রায় অবধ্য। সুতরাং তিনিই তোমার উপযুক্ত ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী। আরও জেনে রেখো যে তিনি একমাত্র মানুষের হাতেই বধ্য। রাবণ নিহত না হওয়া পর্যন্ত তোমার ভার্যা সীতার উদ্ধার কল্পনা করাও কঠিন। হে রাম, তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমার পত্নী সরমা সর্বদাই সীতার মনে উৎসাহ সঞ্চার করেছেন এবং সীতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন। জ্যেষ্ঠ রাবণ সীতার সম্মতি না পাওয়ার জন্য তাঁকে স্পর্শ অবধি করেন নি। কিন্তু তিনি তোমার সঙ্গে শত্রুতা করবেন বলেই সীতাকে লংকায় আবদ্ধ রেখেছেন।'

বিভীষণের কথায় রামের রক্তিম ওষ্ঠ দুটি এক মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। গভীর আবেগে রামের নয়ন দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হলো। বিভীষণ ও লক্ষ্মণ রামের ভাবপ্রবণতায় বিস্মিত হলেন। হনুমান মনুষ্যরত্ন রামের আননের মহনীয় দীপ্তি লক্ষ্য করে, হৃদয়ের মধ্যে রামের ঐশ্বরিক মহিমার স্পর্শ অনুভব করলেন।

এক উদার হাসিতে রামের স্বর্গীয় মুখমণ্ডল পবিত্র সুষমায় বিভূষিত হলো। মধুর কণ্ঠে রাম বিভীষণের উদ্দেশে বললেন, 'আমাকে 'মানুষ' জেনেও রাবণের আমার সঙ্গে শত্রুতা করার দৃঢ় সংকল্প আমাকে চিন্তান্বিত করেছে। রাবণ হয়তো আমার অথবা আমাদের শক্তিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। যাই হোক, সে যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আগ্রহী হয়, তবে তাইই হবে। বিভীষণ, তুমি রাক্ষসদের শক্তির আরও বিবরণ আমাকে দাও।'

রামের কথার গূঢ় তাৎপর্য বিভীষণ হয়তো উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন না, কিন্তু লক্ষ্মণ ও হনুমানের মুখ সপ্রতিভ হলো। বিভীষণ রামের প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'ক্ষত্রিয়পুঙ্গব রাম, আমার দ্বিতীয় ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে ইন্দ্রের সমকক্ষ। রাবণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রজিৎ অভেদ্য কবচ ধারণ করে ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধের সময়ে অগ্নির বরে অদৃশ্য অবস্থায় শত্রুকে নিহত করেন। সেই কারণে ইন্দ্রজিতের রণকৌশল তাকে প্রায় অজেয় করেছে। এই কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিতই রাবণের শক্তির দুই বিরাট

স্তম্ভ। রাবণের প্রধান সেনাপতি প্রহস্ত অত্যন্ত বিক্রমশালী এবং কৈলাসে এক যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন। রাবণের অধীনে অসংখ্য রথী ও মহারথী আছেন। এ'ছাড়া রাবণের অন্য সেনাপতিরা যথা মহোদর, মহাপার্শ্ব ও অকম্পন—এরা সকলেই বীরত্বে অগ্রগণ্য। রাক্ষসরাজ রাবণের সৈন্যবল সীমাহীন এবং সেই সৈন্যেরা মাংসশোণিত ভক্ষণে অভ্যস্ত এবং কামরূপী রাক্ষস।

বিভীষণের রাক্ষসশক্তির বর্ণনায় বানরদের হৃদয়ে গভীর বিস্ময়, যার মধ্যে কৌতূহলের ভাব থাকলেও হয়তো ভয়ের ভাবও কিছু ছিল। শুধুমাত্র সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, নল ও নীলই ব্যতিক্রম। বিশ্বকর্মার সুযোগ্য পুত্র নল সমুদ্র-লঙ্ঘনের উপায় সম্বন্ধে মানসিক পরিকল্পনায় নিযুক্ত ছিলেন।

লক্ষ্মণের ললাটের রেখা বিভীষণের বর্ণনায় কুঞ্চিত হলো না। লক্ষ্মণ রামের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের অমলিন ও হাস্যসুন্দর মুখটি নিরীক্ষণ করলেন। যে ব্যক্তি সীতার শোকে শিশুর মতো কাতর হয়, সেই ব্যক্তিই কেমনভাবে প্রতিপক্ষের অপ্রমেয় ও অপরিসীম বলবীর্যের বৃত্তান্ত শুনে এমন শান্ত ও সংযত থাকে!

অবিচলিত চিত্তে রাম বিভীষণের হাত দুটি ধরে অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বললেন, 'বিভীষণ, আমি রাক্ষসরাজ রাবণকে সবংশে নিধন করে তোমাকেই লংকায় নৃপতি করবো। দুষ্কৃতকারী রাবণকে বধ করেই আমি আমার নৈতিক কর্তব্য পালন করবো। আমার প্রিয়তমা ভার্যাকে উদ্ধার করবো। তোমাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না যে তুমি লংকার অন্তঃপুরে জানকীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তোমার পত্নীকে নিযুক্ত করেছ। বিভীষণ, তুমি ইতিমধ্যেই আমার প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছ। আমি অঙ্গীকার করছি, রাবণকে শেষ করে আমি তোমার মাধ্যমেই লংকায় আর্য ও রাক্ষস সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করবো, যাতে রাক্ষসেরা কামরূপী হিংস্র বর্বরতার মোহপাশ ছিন্ন করে মানবিক ধর্মের উৎকর্ষকে হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারে। এই মহান ব্রত সফল না করে আমি অযোধ্যাতেও ফিরতে চাই না।'

বিভীষণের হৃদয়ে রামের এই উদার প্রতিশ্রুতির প্রতিটি অক্ষরই অপূর্ব সুরে ঝংকৃত হচ্ছে। হনুমানের হৃদয় রামের মহত্বের নিদর্শনে বিগলিত হয়েছে। সুগ্রীব অঙ্গদ প্রভৃতি বানর বীরেরা হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণার আবেগ অনুভব করছেন। জ্যেষ্ঠের অপার্থিব প্রতিভা ও গুণরাশির বিকাশের সূচনায় রামানুজ লক্ষ্মণের হৃদয় গভীর আনন্দে প্লাবিত।

বিভীষণ কিছু উচ্চারণ করার আগেই রাম লক্ষ্মণকে সমুদ্র থেকে জল এনে মহাজ্ঞানী ও স্বদেশবৎসল বিভীষণের অভিষেক সম্পন্ন করতে অনুজ্ঞা করলেন। উপস্থিত সকলেই রামের প্রশংসায় মুখরিত হলেন। বানরসৈন্যগণ রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও বিভীষণের জয়ধ্বনি প্রদান করলো। বেলাভূমির বালুকারাশির মধ্যে বানরদের অঙ্গভঙ্গীসহ সহর্ষ নৃত্য এবং কোলাহল সমুদ্রের তরঙ্গের অভঙ্গ গর্জনকেও ম্লান করলো।

পরিশেষে এই কোলাহলের পরিসমাপ্তিতে রাম, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান ও অন্যান্যদের আলিঙ্গন দান করে আপ্যায়িত করলেন। অপরাহ্নের প্রখরতাহীন সূর্যের অনুগ্র আলোকে এই বিশাল প্রাণীসমাবেশের বাহ্যিক চাঞ্চল্য ও আনন্দের ঔজ্জ্বল্য যেন আসন্ন অন্ধকারের আগমনকে বিলম্বিত করলো!

সকলেই মুগ্ধ বিস্ময়ে সমুদ্রের অসংবদ্ধ ও অসংযত ঊর্মিমালার অবিরাম উত্থান ও

পতনের সৌন্দর্যময় ভঙ্গীর প্রতি আকুল নয়নে দৃষ্টিপাত করলেন। সমবেত সকলের ইচ্ছা যেন একটি ঐক্যতানের মধ্যে সকলের হৃদয়ে এই ধ্বনির সঞ্চার করলো—এই অসীম, অলঙ্ঘনীয় সমুদ্র কি সদয় হবে না!

রাম সকলের মনের কথা উপলব্ধি করে বললেন, 'এখন সমুদ্র পার হওয়ার উপায় চিন্তা করো সকলে। আমাদের এই বিপুল সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে লঙ্কায় উপস্থিত হতে না পারলে রাবণকে পরাজিত করার কল্পনা বাতুলতা মাত্র। অতএব আমাদের সদলবলে সমুদ্র অতিক্রম করতেই হবে।'

প্রাজ্ঞ বিভীষণ বিলম্ব না করেই বললেন, 'হে নরশার্দূল, তুমি ভগীরথের ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করেছ। অনেক কাল আগে তোমার পূর্বপুরুষগণ সমুদ্র খনন করে পর্বত-সম্ভূত জলের বেগকে সমুদ্রগামী করেছিলেন। এখন তুমি সাগরের কৃপা প্রার্থনা করো, অবশ্যই তুমি ফললাভ করবে।'

বিভীষণের বাক্যে প্রীত হয়ে রাম সাগরকূলে আসন বিস্তার করে সমুদ্রের আরাধনায় প্রবৃত্ত হলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাক্ষসরাজের চর শার্দূল শঙ্কিত চিত্তে বানর ও ভল্লুক সৈন্যের বিশাল সমাবেশের সংবাদ রাবণকে জানালেন। রাবণ দূত মারফৎ কিষ্কিন্ধ্যারাজ সুগ্রীবকে এই মানব ও রাক্ষসের দ্বন্দ্ব থেকে প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করলেন।

রাক্ষসদের সঙ্গে বানরদের কোন বিবাদ নেই। বানরেরা রাক্ষসদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত না হলে, বানর ও রাক্ষসদের মধ্যে স্থিতবস্তা অক্ষুণ্ণ থাকবে। সুগ্রীব বালীর মৃত্যু ঘটিয়ে রাজা হয়েছেন, তা সত্ত্বেও থাকবে। কিন্তু সুগ্রীব রাবণের ভেদনীতির নিকট নতি স্বীকার করলেন না।

বানরেরা পক্ষীরূপী রাক্ষসদূত শুককে প্রহারে জর্জরিত করলে, রাম, দূত সর্বদা অবধ্য, এই যুক্তিতে তাদের সংযত করলেন।

সুগ্রীব বললেন, 'হে দূত, রাবণকে গিয়ে বলবে যে রাবণ আমার উপকারক বা করুণার পাত্র নন। বরং তিনি রামের শত্রু হওয়ার জন্য, আমারও শত্রু। আমরা লংকাপুরী আক্রমণ করে সবান্ধব রাবণকে মৃত্যুমুখে পাঠাবো।'

অতঃপর তপস্যা এবং বিক্রম এই দুই উপায়ের দ্বারা রাম সমুদ্রকে বশীভূত করতে প্রয়াসী হলেন। সমুদ্রের সমগ্র জলরাশি শুষ্ক করার ভয় দেখালেন রাম। এইভাবে সমুদ্রকে শাসন করে রাম এই আশ্বাস লাভ করলেন যে বানরসেনার সাগর অতিক্রমের সময়ে সমুদ্র স্থির হয়ে থাকবে এবং হিংস্র জলজন্তুরাও তাদের আক্রমণ করবে না।

সঙ্গে সঙ্গে বানরদের আনন্দোচ্ছ্বাসে সমুদ্রকূল মুখরিত হল। বিশ্বকর্মার পুত্র নলের সঙ্গে পরামর্শের সাহায্যে রাম সেতু বন্ধনের প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলি সম্পন্ন করতে তৎপর হলেন। সঙ্গে আছেন চিরসাথী অনুজ লক্ষ্মণ, ভক্ত হনুমান ও বন্ধু সুগ্রীব।

শাল, অর্জুন, তাল, তাম্র প্রভৃতি বৃক্ষের সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যাকৃতি ও মহাবলশালী বানরেরা যন্ত্রযোগে বৃহদাকার প্রস্তর খণ্ড এবং পর্বত উৎপাটন করে নিয়ে

এলো। সেতু রচনার আয়োজনে যেমন বানরদের সহযোগিতা, সেতু রচনায় তেমনই তাদের সক্রিয় সহায়তা, এই মহান উদ্যোগের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করলো। বানরেরা নির্মাণ কাজে নিয়োগ করলো তাদের বুদ্ধিমত্তা ও শ্রম, উৎসর্গ করলো তাদের দেহ ও প্রাণ। কেউ সূত্র অথবা মানদণ্ড ধারণ করে, কেউ বা শিলা খণ্ড বহন করে এই বিরাট কর্মযজ্ঞের সম্পাদনায় আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির পুরোধা রামের প্রতি তাদের ভক্তি, প্রেম ও আনুগত্যকে চিরস্থায়ী করলো।

সেতু রচনার পরিসমাপ্তির দুর্লভ অবকাশে বিভীষণ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান, জাম্ববান, নল নীল প্রভৃতিকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে হর্ষজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'হে রাজতনয় রাম, তুমি তোমার বন্ধু, সহযোগী, অনুরাগী ও অনুচরদের সাহায্যে যে কীর্তির স্বাক্ষর স্থাপন করলে, তা বোধ করি তোমার অতি প্রখ্যাত এবং অতি শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষ রাজা সগরের বংশোদ্ভব মহাজ্ঞানী ও মহাতপস্বী ভগীরথের গঙ্গা আনার গৌরবকেও ম্লান করে দিচ্ছে। আরও দিচ্ছে এই জন্য যে এই সেতু শুধু বানরদের সাহচর্যে তোমার লংকায় পৌঁছে সীতাকে উদ্ধারের পথই প্রশস্ত করে নি, এই সেতু আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিযানকে মহান ভারত থেকে সুদূর লংকায় উপনীত হবার বিরল সুযোগকে সম্ভাবনাময় করে তুলেছে ! আমি সর্বান্তঃকরণে রামের জয় কামনা করি।'

বিভীষণের এই উক্তির সমাপ্তি যেন সত্যই সত্যই সেই অভীপ্সিত অভিযানের সূচনা করলো। রাম পুনরায় বিভীষণকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'হে ভবিষ্য লংকাপতি, তোমার বক্তব্য অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও তাৎপর্যপূর্ণ। বানররাজ সুগ্রীবের বদান্যতায় এবং তোমার সহৃদয়তায় আমাদের এই দ্বিমুখী অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হলে পৃথিবীর অনেক উপকার সাধিত হবে।'

তারপরে সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশে উদাত্তকণ্ঠে রাম বললেন, 'এখন এসো তোমরা, অগ্রসর হও সেই লক্ষ্যের পথে যেখানে আমাদের সকলের বৈরী রাবণ অপেক্ষা করছে তার শক্তি ও অহংকারের সুদৃঢ় দুর্গে। সেই দুর্গ আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধূলায় লুটিয়ে দেব, এই আমাদের আকাঙ্ক্ষা, এই আমাদের সংকল্প। এই প্রতিজ্ঞা আমাদের নিতেই হবে যে আমরা জয়ী হবো, তবেই আমাদের পুণ্য ব্রত পালনের শক্তি আমরা হৃদয়ে অনুভব করবো।'

রামের হৃদ্যতাপূর্ণ ও আবেগময় উক্তির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ লক্ষ কোটি বানর কণ্ঠে 'মহাত্মা রামচন্দ্রের জয়', 'বানরাধিপতি সুগ্রীবের জয়', 'লংকাধিপতি বিভীষণের জয়' এই ধ্বনিগুলি প্রচণ্ড হুংকারের মতো নিনাদিত হলো।

* * * *

রাবণের দূত বোধহয় বিভীষণের রামের সঙ্গে যোগদানের সংবাদ আগেই রাবণের গোচরীভূত করেছে। বিভীষণ শত্রুর দলে যোগদান করেছে! তবে কি বিভীষণ সত্যই ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনবিরোধী, দেশদ্রোহী? বিভীষণ বিশ্বাসঘাতক না হলে, রাম রাক্ষসদের শত্রু, একথা জেনেও তার নিকটে গিয়ে আশ্রয় নিল কেন সে! বানরসৈন্যের লংকায় পদার্পণ, রাবণকে বিভীষণের দেশত্যাগের চিন্তায় মগ্ন রাখলো। রাবণের হৃদয়ে প্রবল বিদ্বেষ।

বিভীষণের বিরুদ্ধে লংকায় প্রবল জনমত। বিভীষণের এই আশাতীত আচরণকে মনে মনে সমর্থন করেছেন কেউ কেউ, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। বিভীষণ

রাক্ষসদের ভীষণ শত্রু, রামের থেকে কোন অংশেও কম নয়। রাক্ষসদের মায়াবল, কূটকৌশল, এ সবই বিশ্বাসহন্তা বিভীষণের জন্য শত্রুর নিকটে গোপন থাকবে না নিশ্চয়ই। বিদ্বেষ, ঘৃণা, অবজ্ঞার সম্মিলিত দাবাগ্নি, লংকেশ্বর রাবণের শংকিত চিত্তকে প্রচণ্ডভাবে দগ্ধ করতে থাকে।

কুম্ভকর্ণ পুনরায় দীর্ঘ নিদ্রায় মগ্ন হয়েছে। ইন্দ্রজিৎ নিজের প্রাসাদে আপন ব্যসন ও ভোগের মধ্যে নির্ভাবনায় কালাতিপাত করেছে। সে দুর্জয় বীরত্বের অধিকারী হলেও তার প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

বিভীষণ ও মন্দোদরী বার বার বলেছেন রাবণকে, সতর্ক করেছেন তাঁকে একাধিকবার যে মন্ত্রী ও সেনাপতিরা শুধুই যে চাটুকার তাই নয়, তারা রাক্ষসসুলভ কামপ্রবৃত্তির দ্বারা আচ্ছন্ন। অগ্র ও পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই তারা নিজেদের এবং রাজার কামনার অগ্নিতে ইন্ধন যোগাতেই ব্যস্ত। রাবণ গভীর চিন্তায় মগ্ন।

রাবণ বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ করেন। রাজপ্রাসাদে তিনি একাকী। আজ আর ভ্রাতা বিভীষণ নেই যে যুদ্ধে ও সংকটে পাশে এসে দাঁড়াবে। রাজ্ঞী মন্দোদরী স্বামীর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতের চিন্তায় শুধুই অশ্রুপাত করছেন, এ কথা যেন রাবণ উত্তমরূপেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

তাঁর নিজের অন্য পুত্রেরা রাক্ষসপ্রবৃত্তি ও আচারেরই অনুরাগী। রাবণ নিজের বিদগ্ধ অন্তঃকরণের সুগন্ধি নির্যাসটিকে দিয়ে পুত্রদের হৃদয় আমোদিত করতে সক্ষম হন নি। রাক্ষস অভিজাত মহলে কেউ কেউ পুজার্চনা করলেও প্রায় সকলেই নিবিড়ভাবে ভোগেরই উপাসক। তবে রাক্ষসরাজের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব ও জ্বালা কে বুঝবে আজ? রাবণ আকুলভাবে চিন্তা করেন যে আজ তাঁর পাশে বিভীষণ নেই, বিভীষণ এখন রামের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে! বিভীষণের সন্তান তরণীসেন লংকায় থাকলেও সে নিতান্ত শিশু! হায়, নিয়তি কেন বাধ্যতে!

রাবণ অদূরে সমুদ্র সৈকতে শত্রুশিবিরের অশান্ত কোলাহল শুনতে পেয়েছেন। একি শত্রুর বেশে তাঁর নিয়তি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ মিত্রকে লংকার মৃত্তিকায় স্থাপন করে দিল! সেই নিয়তি, সেই রাম বিভীষণের মিত্র। কিন্তু রাক্ষস রাবণের পরম শত্রু। বিভীষণের পক্ষ পরিবর্তনের শেষ পরিণাম যেন দূরদর্শী ও বিচক্ষণ রাবণের মানসচক্ষে স্বচ্ছ আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। এই কি সেই আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির সংকেত!

রাবণের দক্ষ অনুচর শুক-সারণ এই সময়ে বিশ্রামকক্ষের মধ্যে প্রবেশ করায় রাবণের চিন্তায় বাধা পড়লো। রাবণ উদ্ধত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন যে শুক ক্ষত বিক্ষত ও আহত অবস্থায় এসেছেন।

রাবণের প্রশ্নে শুষ্ক মুখে শুক বললেন, 'মহারাজ, আমি বানররাজ সুগ্রীবকে আপনার বার্তা দিয়েছি। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় নি। ক্রোধপ্রবণ ও উগ্রস্বভাব বানরেরা আমাকে বন্দী করে নির্যাতন করতে উদ্যত হলে, রামের কৃপায় আমি মুক্তি পেয়েছি। রাম সেতু নির্মাণ করে সমুদ্রের মতোই এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইতিমধ্যে লংকাদ্বীপে উপনীত হয়েছেন। সেই সৈন্যদল বিরাটাকার ভল্লুক ও মেঘবর্ণ বানর সৈন্যের দ্বারা পুষ্ট।'

এই সংবাদ নিবেদন করে শুক অবনত মস্তকে অপেক্ষা করলেন। সারণ শংকা-বিহ্বল নেত্রে রাক্ষসাধিপতির গম্ভীর বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। চিন্তার সঙ্গে

ক্রোধ এসে যুক্ত হলে মুখের যে গাঢ় ভাব হয়, রাবণের বিস্তৃত নীলবর্ণ আননে সেই রোষরক্তিম ভীষণ ভাব।

শুক অসহায়ভাবে রাবণের প্রতি লক্ষ্য করে রাবণের পদতলে পতিত হলেন। রাবণ কিছু বলার আগেই ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'মহারাজ, অপরাধ নেবেন না আমার কথায়। দেবতা ও দানবের মধ্যে যেমন সন্ধির প্রসঙ্গ অবান্তর, আমার মনে হয়েছে রাক্ষস ও বানরের মধ্যেও সন্ধি হবার নয়। আর্যক্ষত্রিয় রাজপুত্র রাম ইতিমধ্যেই বানরদের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন।'

রাবণের রাক্ষস সত্তা দ্বিগুণ বিস্ফোরণের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করলো। তিনি প্রায় চিৎকার করে বললেন, 'রাম সেতুবন্ধন করেছে ও বানরসৈন্য নিয়ে সমুদ্র লঙ্ঘন করে লংকায় এসে উপস্থিত হয়েছে, তাতো বুঝতেই পারছি। এতে তোমাদের আশংকার কি হেতু আছে? শত্রুকে কিভাবে প্রতিহত করতে হয়, সে আমার জানা আছে। তোমরা দুজন সত্বর রানরের রূপ ধরে রামের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করে সব গুপ্ত খবর জেনে এস।'

রাবণের আদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে শুক বললেন, 'মহারাজ, আমি রামের সৈন্য বিভাগের কিছু সংবাদ সংগ্রহ করেছি, তাই এখন আপনাকে নিবেদন করতে ইচ্ছা করি।'

রাবণের মুখে কৌতূহলের চিহ্ন প্রকাশিত হলো। রাবণ এই গুপ্ত সংবাদ এত শীঘ্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন, আশা করেন নি।

উৎসাহের সঙ্গে রাবণ বললেন, 'বলো শুক, নীরব থেকো না। তোমার সংগৃহীত সব গুপ্ত তথ্য আগে আমাকে দাও, পরে যেমন আদেশ করেছি আরও খবর নিয়ে এসো।'

শুক সাহস সঞ্চয় করে বললেন, 'রক্ষরাজ, সুগ্রীবের নিকটে দৌত্যে গিয়ে আমি যতটুকু শুনেছি ওদের সৈন্যবিভাগ সম্বন্ধে, তা আপনাকে বলছি। নীলের সঙ্গে অঙ্গদ বানরবাহিনীর মধ্যভাগে থাকবে, ঋষভ ও গন্ধমাদন সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণ ও বাম দিক রক্ষা করবে, রাম এবং লক্ষ্মণ আগের দিকে থাকবে, জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শী সৈন্যদের কেন্দ্রস্থলে থাকবে, বানররাজ সুগ্রীব শেষের দিকে থাকবে।'

শুকের বিবরণে রাবণের মুখ যেন অন্তরের এক আলোকের প্রভাবে উজ্জ্বল হলো। রাবণের আননের বর্ণ-সমারোহে শুক ও সারণ অতীব বিস্মিত হলেন। রাক্ষসরাজের মনের গূঢ় চিন্তার এবং মুখের বর্ণ পরিবর্তনের হেতু তাদের বোধগম্য হয় নি।

—'রাম ও লক্ষ্মণ আক্রমণের পুরোভাগেই নিজেদের স্থাপন করেছে। এমন তো রাক্ষসদের মধ্যে দেখা যায় না। বিরাট বাহিনী নিয়ে যখনই অভিযান হয়, আমাদের রীতি অনুযায়ী রাজা সৈন্যদের কেন্দ্রস্থলেই অবস্থান করে। এইটিই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে নেতার সর্বাপেক্ষা সংরক্ষিত ও নিরাপদ স্থান। এরা তো দেখছি ভীষণ আক্রমনাত্মক সংগ্রামের কৌশল অবলম্বন করবে বলে বোধ হচ্ছে! দেখা যাক, আমিও সেনাপতিদের সঙ্গে যুদ্ধের কৌশল নির্ণয়ের জন্য পরামর্শ করি। তোমরা গিয়ে আমাকে বানরসৈন্য সম্বন্ধে আরও খবর এনে দাও। আমি এখানেই তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবো।' রাবণ চিন্তিতমুখে কথাগুলি বলে স্তব্ধ হলেন।

শুক-সারণ লংকাপুরীতে ফিরে এসে যে কথা জানালেন, তাতে লংকেশ্বর আদৌ প্রীত হলেন না। এই দুই ছদ্মবেশী রাক্ষসকে চিনতে বিভীষণের বিলম্ব হয় নি। বিভীষণ রাক্ষসদের মায়ার কৌশল সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত!

রাবণের রোষোদ্দীপ্ত প্রশ্নে ভীত হয়ে শুক ও সারণ বললেন, 'বিভীষণের দ্বারা

চিহ্নিত হয়ে আমরা রামের সন্নিধানে উপনীত হলাম। সব বৃত্তান্ত শুনে রাম সহাস্যে বললেন, তোমরা স্বচ্ছন্দে আমাদের সৈন্যদের সম্বন্ধে যা জানবার ও যা দেখবার সব জেনে ও দেখে যাও। এখন আমার এই বার্তা লংকাধিপতির কাছে পেঁাছে দাও যে তিনি যে শক্তি ও সামর্থ্যের বলে সীতাকে হরণ করেছেন, তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেই শক্তি এবং বিক্রম যেন তিনি আমাদের দেখান। আগামী কাল প্রভাতেই আমরা লংকাপুরী আক্রমণ করবো এবং রাক্ষসসৈন্য ধ্বংস করবো।'

—'এত বড় স্পর্ধা সেই সামান্য মানুষের যে পৃথিবীজয়ী রাক্ষসরাজ রাবণের কাছে সে বীরত্বের আস্ফালন করছে, তার শক্তি চূর্ণ করে দেবে বলে ভয় দেখাচ্ছে! আচ্ছা, দেখা যাবে, এই সুসজ্জিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত রাক্ষসসেনাকে রামের বর্বর ও অশিক্ষিত বানরসেনা কেমনভাবে প্রতিহত করতে পারে! আমি সেনাপতিদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যুদ্ধের কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। তোমরা আমার দায়িত্বশীল অনুচর বলেই বলছি যে রামের এইসব বৃথা দম্ভে কান দিও না। রাক্ষসসেনার মনোবল অটুট রাখার চেষ্টা করো। ওদের তেমন কোন অস্ত্রশস্ত্র আছে বলে শুনি নি। আমাদের প্রতি-আক্রমণের প্রচণ্ডতায় রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীবকে সদলবলে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। মায়াবলে বা অস্ত্রবলে কোন দিক দিয়েই বানরসেনা ও সেনাপতিরা রাক্ষসদের সমকক্ষ নয়।'

এইভাবে হৃদয়ের অপ্রতিহত ক্রোধকে দম্ভের সঙ্গে প্রকাশ করে রাক্ষসরাজ নীরব হলেন। অতঃপর রাবণ প্রাসাদের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে দূর থেকে রামের সৈন্যবল নিরীক্ষণ করলেন। হৃদয়ের ঔৎসুক্যকে রাবণ অনেকটা শান্ত করলেন।

শুক ও সারণ দূর থেকে রাবণকে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, অঙ্গদ, নীল, নল প্রভৃতি বানরপ্রধানদের দেখিয়ে সবিস্তারে তাদের বল, বিক্রম ও খ্যাতির কথা বিবৃত করলেন।

* * * *

পরের দিন প্রত্যুষে রামের ঘোষণা মতো লংকা আক্রান্ত হলো। বানরসেনা প্রচণ্ড রণহুংকার দিয়ে ত্রিকূট পর্বতের অভিমুখে অগ্রসর হলো। রাক্ষসরাজ লংকাপুরীর বাহিরে পর্বতের উপরিভাগ থেকে সানুদেশ পর্যন্ত সৈন্য স্থাপন করেছিলেন। সংখ্যাহীন রাক্ষসসৈন্য রথী ও মহারথীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সমুদ্রের সৈকতে শত্রুর শিবিরের দিকে ধাবিত হয়েছিল। কিন্তু রাক্ষসেরা শীঘ্রই আক্রমণাত্মক নীতিটিকে পরিবর্তন করতে বাধ্য হলো।

বানরসেনা বন্য পশুর মতো রাক্ষসদের বাহিনীকে দৈহিক আঘাতে পর্যুদস্ত করলো। রাক্ষসসৈন্য তীক্ষ্ন অস্ত্রাদির সাহায্যেও বানরদের কিছুতেই পরাজিত করতে পারলো না। বানরেরা হস্ত পদ ব্যতীত তীক্ষ্ন নখ ও দন্তের সহায়তায় প্রতিপক্ষকে বিহ্বল করলো। অসংখ্য রাক্ষসসেনার সঙ্গে সহস্র সহস্র বানরসেনাও রণে নিপাতিত হলো। কিন্তু লংকেশ্বরের শিক্ষিত সেনাবাহিনী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলো যে বানরেরা হীন প্রতিদ্বন্দ্বী নয় এবং রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবকেও সহজে পরাস্ত করা সম্ভব নয়।

যুদ্ধের প্রথম সুযোগেই রাবণ রাক্ষসোচিত মায়াজাল বিস্তার করে সীতাকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হলেন। রাবণের আদেশে রাক্ষসশিল্পী বিদ্যুজ্জিহ্ব মায়াবলে রামের মুণ্ড এবং বিরাট ধনুর্বাণ প্রস্তুত করলো।

সেই নরমুণ্ড শোকমগ্ন সীতাকে প্রদর্শন করে রাবণ বিদ্রূপাত্মকভাবে বললেন,

সীতা, যার আশায় তুমি অপেক্ষা করছো, সেই হতভাগ্য বীর রাম লংকায় পদার্পণ করেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। আমার কথায় তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য আমি রামের ছিন্ন মুণ্ড এবং রামের পরিত্যক্ত ধনুর্বাণ তোমার সম্মুখে নিয়ে এসেছি। আমায় মন্ত্রী প্রহস্ত মধ্যরাত্রে বানর শিবিরে গিয়ে নিদ্রিত রামের শির ছেদন করে নিয়ে এসেছে।'

রাবণের নিষ্ঠুর বাক্যে সীতা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। রামের মৃত্যুর চিন্তাই সীতার নিকট বেদনাদায়ক, সে মৃত্যু সংঘটিত হোক অথবা নাই হোক। সীতা অসহায়ভাবে রোদন করলেন। ইত্যবসরে বিদ্যুজ্জিহ্ব সেই মুণ্ড ও ধনুর্বাণ এনে সীতার সম্মুখে স্থাপন করলেন।

মনে মনে কৌতুক অনুভব কোরে রাবণ শ্লেষজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'সীতা, এবার তোমার বিক্রমশালী পতিদেবতার শেষ অবস্থাটি নিজের চোখেই দেখ।'

রাবণ তাঁর উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে মনে কোরে হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব উল্লাস বোধ করলেন। সীতার বিবর্ণ ও বিভ্রান্ত মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গেই রাবণের লম্বিত ওষ্ঠের কোণে এক ক্রূর হাসির রেখা।

পতিদেবতার মুখমণ্ডলের সঙ্গে এই ছিন্ন মুণ্ডের বিস্ময়কর সাদৃশ্য মনে মনে অনুভব করে সীতা দুঃখে ও শোকে মুহ্যমান হয়ে আর্ত স্বরে বিলাপ করতে প্রবৃত্ত হলেন!

সীতার মানসিক নির্যাতনের কামনায় রাবণ মুখে হর্ষের ভাব প্রস্ফুটিত করে বললেন, 'আরও শোনো মৈথিলী, তোমার উদ্ধারকারীদের নিগ্রহের কাহিনী। বিভীষণ পলায়ন করে রক্ষা পেয়েছে, লক্ষ্মণ বানরদের সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে। সুগ্রীবের গ্রীবা ভগ্ন হয়েছে এবং হনুমানের হনু চূর্ণ হয়েছে এবং সে নিহত হয়েছে। আরও শুনবে বানরদের বিক্রমের বৃত্তান্ত? মৈন্দ, দ্বিবিধ প্রভৃতি সেনাপতিদের রাক্ষসসৈন্য যমালয়ে প্রেরণ করেছে, অঙ্গদ রুধির বমন করে ভূতলে লুণ্ঠিত। আমাদের সেনাবাহিনীর হস্তী ও রথে পিষ্ট হয়ে বানরদের দেহ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। সুতরাং রামের প্রতি তোমার আকর্ষণ ও আনুগত্য উদাহরণযোগ্য হলেও, রামের দিক থেকে তোমার সব আশা মরীচিকাতেই লীন হয়েছে। অতএব, এখনও আমায় হিতবাক্য শোনো। কায়মনোবাক্যে নিজেকে আমায় নিকটে সমর্পণ করো। এর পরেও কিন্তু আর বেশী দিন আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারবো না।'

রাবণের এই দীর্ঘ ও নির্দয় উক্তিতে ক্ষোভে, দুঃখে ও আশংকায় সীতার হৃদয় কম্পিত হলো। সীতা অধীরভাবে রামের অকাল ও অপ্রাপ্য মৃত্যুর জন্য শিরে করাঘাত করে রোদন করতে লাগলেন। সীতার শোকে যেন সমগ্র অশোকবন, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা ম্রিয়মাণ।

রাক্ষসরাজ আকস্মিকভাবেই দ্বারপালের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অশোকবন ত্যাগ করলেন। সেনাপতি প্রহস্তের অনুরোধে তাঁকে সভাকক্ষে মন্ত্রণার জন্য যেতে হলো। রাবণের সঙ্গে সঙ্গে রামের মুণ্ড এবং ধনুর্বাণ অদৃশ্য হলো।

সীতা এই বিস্ময়কর পরিস্থিতিটি অনুধাবন করার আগেই, বিভীষণ-জায়া সরমা এসে সীতার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। সরমাকে লক্ষ্য করেই সীতা আর্তনাদ করে উঠলেন। তাঁর অশ্রুবেগ বাধা মানলো না। সরমা উপলব্ধি করলেন যে রাক্ষসরাজ নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে সীতাকে বাক্যযন্ত্রণা দিয়েছেন অথবা ভয় দেখিয়েছেন।

সুন্দরী ও সরলা সরমা সীতাকে দুই বাহুতে আবদ্ধ করে সান্ত্বনা দেবার জন্য মধুর স্বরে বললেন, 'দেবী জানকী, তোমার এই শোকাবেগের হেতু আমি বুঝতে পারছি না। তুমি আমাকে মার্জনা করো। কিন্তু আমার কাছে তোমার জন্য অত্যন্ত শুভ সংবাদ রয়েছে।'

বুদ্ধিমতী সীতা সরমার সমদর্শী এবং উত্তেজনাহীন আচরণে বিস্মিত হলেন। বিমূঢ়ের মতো বললেন রুদ্ধ কণ্ঠে, 'সখী সরমা, তুমি আমায় সর্বনাশের সংবাদ কিছু পাও নি ইতিমধ্যে? রাক্ষসরাজ এসে ইতিমধ্যে আমার পতির ছিন্ন মুণ্ড ও পরিত্যক্ত ধনুর্বাণ দেখিয়ে বানরসৈন্যের পরাজয়ের কথা জানিয়ে গেছে। আমার প্রিয়তম পতির সৈন্যবাহিনী যে সাগর অতিক্রম করে লঙ্কার মাটিতে এসে পেঁছেচে, এ সংবাদও আমার অজানা ছিল। সখী, সত্য বলো, আমার স্বামী কি সত্যই কালের কবলে পতিত হয়েছেন?'

চকিতে সমস্ত পরিস্থিতিটি বিচার করলেন সরমা। বিশুদ্ধপ্রাণা সরমা বুদ্ধিহীনা নন। রাক্ষসদের মায়াকৌশল তাঁর অজ্ঞাত নয়। তিনি সীতাকে বক্ষে আকর্ষণ করে প্রবোধ দিলেন।

সীতার তপ্ত অশ্রু আপন বস্ত্রাঞ্চলে সযত্নে মুছে দিয়ে সরমা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, রাক্ষসাধিপতি এত নিষ্ঠুর যে তোমাকে এইভাবে নির্যাতন করেছেন!'

পরে পরম যত্নে সীতার শিরে এবং দেহে হস্ত সঞ্চালন করে সরমা সীতাকে আশ্বস্ত করতে প্রবৃত্ত হলেন। সরমার স্নেহের এবং সহানুভূতির স্পর্শে বিগলিত হয়ে সীতা আর্ত কণ্ঠে বললেন, 'সখী, শীঘ্র বলো আমার রঘুনাথ কি চিরতরে বিদায় নিয়েছেন এই পৃথিবী থেকে? হায়, হায়, আমার কি দুর্ভাগ্য যে আমাকে এই বৈধব্যের অভিশাপও ভোগ করতে হবে।'

সীতার এই ভয়ঙ্কর বাক্যে শিহরিত হয়ে সরমা তীক্ষ্ন কণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন, 'কি অকল্যাণকর কথা তুমি উচ্চারণ করছো, সখী! পৃথিবীতে কি এমন কোন শক্তি আছে যা রাঘবেন্দ্র দশরথ-তনয়কে পরাজিত অথবা নিহত করতে পারে? এ'কথা আমার মতো অর্ধশিক্ষিতা, জ্ঞানহীনা রাক্ষসরমণীও জানে। আর তুমি সেই মহাবলী মহা-ক্ষত্রিয়ের অর্ধাঙ্গিনী হয়েও এই সত্যটির পরিচয় পাও নি! না না, এ হতেই পারে না। তুমি রক্ষরাজের মায়ার চাতুর্যে বিভ্রান্ত হয়েছ বলেই আমার বোধ হচ্ছে।'

সরমার কথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুমান করে ঈষৎ অপ্রতিভভাবে সীতা বললেন, 'ভগ্নী সরমা, তুমি শুধু আমার সখীই নও, তুমি আমার আত্মীয়েরও অধিক। দুরাত্মা রাবণের চরিত্রের নৃশংসতায় এবং কামার্ত প্রবৃত্তির বিকাশ দেখে ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় আমার মন অহরহঃ দগ্ধ হচ্ছে। সব সময়েই আমার হৃদয়ে এক বিভীষিকার সৃষ্টি হচ্ছে। সেই কারণেই আমি রাবণের হাতের সেই ছিন্ন মুণ্ডটিকে আমার পতির মুণ্ড মনে করে ভ্রমে পতিত হয়েছিলাম। আমাকে তুমি ক্ষমা করো। কি শুভ সংবাদ তুমি বহন করে এনেছ, আমাকে সত্বর বলো।'

সীতা আত্মস্থ হয়েছেন লক্ষ্য করে, সরমা সীতার পাশে উপবেশন করলেন। নিজের বস্ত্রাঞ্চল কণ্ঠে নিয়ে সীতার পদযুগলে প্রণত হলেন।

সীতা সরমার এই ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদনে অভিভূত ও অশ্রুসিক্ত হয়ে সরমাকে আশীর্বাদ করে মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'সখী সরমা, তুমি রাক্ষসরমণী সত্য, কিন্তু তুমি ইতিপূর্বেই মনুষ্যত্ব ধর্মে দীক্ষিত হয়েছ সম্পূর্ণভাবে। অনুমান করতে পারি, এ

নিশ্চয়ই তোমার গুণবান পতিরই অবদান। আমি শুনেছি, তোমার ধর্মপ্রাণ পতিদেবতা লংকা থেকে বিতাড়িত হয়ে আমার স্বামীর পক্ষ গ্রহণ করেছেন। সখী, তোমার পতিদেবতা কি তাঁর মনের অভিপ্রায়ের কথা তোমার কাছে আগেই ব্যক্ত করেছিলেন? এই লংকাতে বাস করে কেমন করে মহানুভব বিভীষণ আমার পতি ও দেবরের শৌর্য, বীর্য ও মহত্বের কাহিনী জানতে পারলেন?'

সরমা সীতার মধুর বাক্যে বিমোহিত হয়ে সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'দেবী, আগেই তোমাকে জানাই যে মহাবীর ও পরম ধার্মিক রাম-লক্ষ্মণ, ইতিমধ্যে সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতির সঙ্গে অসংখ্য বানরসৈন্য নিয়ে লংকায় উপনীত হয়ে সমুদ্রের তীরে শিবির স্থাপন করেছেন এবং রাক্ষসরাজকে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন। রাক্ষসাধিপতি তোমাকে ভীতি প্রদর্শন করে কেন হঠাৎ চলে গেলেন, তাও আমি জেনেছি। প্রথম আক্রমণেই বানরেরা রাক্ষসদের নিকট নিজেদের বীর্য ও বিক্রমের পরিচয় রেখেছে। বৃক্ষ উৎপাটন করে, প্রস্তর চূর্ণ করে তারা রাক্ষসদের নিধন করেছে। সুতরাং বুঝতেই পারছো, নিদ্রিত অবস্থায় রামের নিহত হবার সম্ভাবনা কোন সময়েই ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। বানরসেনা সমন্বিত রামকে পরাজিত করা দেবতাদেরও অসাধ্য, রাক্ষস তো কোন ছার!'

সরমার কথায় আগের উদ্বেগ মন থেকে দূর করে এবং সাহস সঞ্চয় করে সীতা ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, 'সরমা, তোমার ভালোবাসার ঋণ এই জন্মে আমি শোধ করতে পারবো না। যদি, একমাত্র, আমার বীর্যবান, উদারহৃদয় পতি শত্রুকে নিধন করে ধর্মাত্মা বিভীষণকে লংকার অধীশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তবেই তোমার উপকারের ঋণ কিছুটা শোধ হয়। জানিনা, আমাদের ললাটের লিখন কি। এখন এই দুর্বৃত্ত রাবণের হাত থেকে মুক্তি পেলে আমি বাঁচি।'

এই কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সীতার বক্ষ থেকে এক দীর্ঘশ্বাস নির্গত হলো। সীতার উক্তির শেষের অংশটি সরমার কানে ঝংকৃত হচ্ছে বারবার। হায়, তেমন দিন কি আসবে সরমার জীবনে, যখন তাঁর বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র পতিদেবতা লংকার সিংহাসনে আরোহণ করে ক্ষত্রিয় রাজপুত্র রামের সঙ্গে অক্ষয় সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হবেন!

সীতা যেন সরমার মনের কথা স্বতঃই অবগত হন। আবেগপূর্ণ কণ্ঠে জনকনন্দিনী বলেন, 'সরমা, তুমি স্বামীর বিরহে কাতর হয়ে আছ, তাই তোমার মনে শান্তি নেই। ভগ্নী, আমার শিরোভূষণ পতিদেবতা যখন সসৈন্যে লংকায় পৌঁছে গেছেন, তখন যেমন আমার উদ্ধারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তেমনই তোমারও লংকার রাজ্ঞী হবার সুযোগ নিকটবর্তী হয়েছে।'

—'সখী, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। যদি সেই সুদিন আসে এবং যদি তাইই হয়, তবে আমরা স্বামী ও স্ত্রী তোমাদের দেব ও দেবী বলেই স্বীকার করবো। অবশ্য এখনও আমি তাইই করে থাকি, এবং আমি জানি আমার পরম গুরু পতিদেবতাও তাই করে থাকেন। আমাদের একমাত্র সন্তান তরণীসেনও নরশ্রেষ্ঠ রামের একনিষ্ঠ ভক্ত। কিন্তু সে স্বদেশ ও স্বজনবৎসল, তাই তার পিতা লংকাপুরী ত্যাগ করলেও সে তার জ্যেষ্ঠতাতের একান্ত অনুগত হয়েই আছে। সখি, আমি এখন দিব্যচক্ষুতে দেখতে পাচ্ছি যে তুমি অযোধ্যার রাণী হয়ে রামচন্দ্রের বাম পাশে সিংহাসন আলোকিত করে বসে আছ।'

—'ভগ্নী সরমা, আমিও তোমার মতোই বলবো যে তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।

কিন্তু সখী, যদি আমি অযোধ্যার রাণী নাও হই, আমি শুধু আমার পতির সঙ্গে পুনরায় মিলিত হলেই সুখী হবো। রাজ্য, ধন, সম্পত্তি কিছুই আমার কাম্য নয়। শুধু পতির প্রেম ও পতির সেবাই তাঁর পত্নী হিসাবে আমার একান্তভাবে কাম্য। সখী, আমরা দুজনে পঞ্চবটীতে সুখের নীড় রচনা করে সেই নির্জন ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ বনভূমিতে কত শান্তিতে পরস্পরের উপর নির্ভর করে বাস করছিলাম, তা আমি তোমাকে বোলে বোঝাতে পারবো না! পঞ্চবটীর আনন্দময় স্মৃতিতে আমার প্রাণ ও মন এখনও পরিপূর্ণ। তাই তো দুষ্ট রাবণ যখন চৌর্যবৃত্তির দ্বারা সেই বিশ্রান্তির নিকেতন থেকে এবং পতির সান্নিধ্য থেকে আমাকে নিয়ে এলো, তখন ক্ষোভে দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। আমি পৃথিবীর সকল সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের বিনিময়ে শুধু আমার পতিকেই ফিরে পেতে চাই। যদি তিনি অযোধ্যায় ফিরে যাবার সংকল্প ত্যাগও করেন অথচ আমাকে আগের মতোই হৃদয়ে গ্রহণ করেন, তবে জানবো যে আমায় মতো সৌভাগ্যশালিনী ইহজগতে কেউ নেই।'

সীতার ভাবপ্রবণতায় গভীরভাবে বিচলিত হয়ে সরমা তাঁর সুপুষ্ট বাহু দুটিতে সীতাকে বক্ষে ধারণ করে অশ্রু মোচন করেন। সীতার ললাটে, মুখে চুম্বন করে সরমা কোমল কণ্ঠে বলেন, 'সখী, আমি জানি শীঘ্রই তোমার এই দুঃখনিশার অবসান হবে। এখন শুধু ধৈর্য ধারণ করো, বুকে বল সঞ্চয় করো, শীঘ্রই সৌভাগ্যের স্পর্শ অনুভব করবে তুমি।'

সরমার আন্তরিকতায় এবং মমতাপূর্ণ আশ্বাসে উৎসাহিত হলেন সীতা। কিন্তু পরক্ষণেই এক অন্য আবেগ এসে তাঁর হৃদয়কে অধিকার করলো।

সুষমায় ভরা সরমার সুন্দর অবয়বের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বিষণ্ন মুখে সীতা বললেন মৃদু কণ্ঠে, 'ভগ্নী সরমা, জন্মাবধি আমার ভাগ্য স্থির নয়। পূর্বজন্মকৃত পুণ্যবলেই এইরকম পতিভাগ্য আমার হয়েছিল। পতির প্রেমে ও উদারতায় এক স্বর্গীয় ও দুর্লভ অস্তিত্বের স্বাদ আমি দেহে ও মনে অনুভব করেছিলাম। আমার নারীত্ব পেয়েছিল তার আকাঙ্ক্ষিত সম্মান ও মর্যাদা। আমার মনুষ্যত্ব পেয়েছিল এক বিরল আদর্শ। সরমা, আমার ভয় হয় যে আমার জীবনে শেষ পর্যন্ত সুখ ও শান্তি কোনটাই হয়তো পাবো না।'

—'কেন পাবে না জনকনন্দিনী? আমি তো তোমার কাছে তোমার জীবনের কাহিনী সবই শুনেছি। তুমি এক মহাজ্ঞানী ও সম্মানীয় নরপতির কন্যা। তুমি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কোশলপতি রাজা দশরথের পুত্রবধূ। কৌশল্যার মতো গুণবতী ও দয়ার্দ্র রমণী তোমার শ্বশ্রূ। রামের মতো দেবতুল্য ব্যক্তি, শৌর্যে বীর্যে ও মহত্বে যিনি তুলনাবিহীন, তোমার পতিদেবতা। লক্ষ্মণের মতো অনুগত ও স্বার্থশূন্য ক্ষত্রিয় বীর তোমার দেবর। তবে তোমার ভাগ্য মন্দ কেন মনে করছো? অযোধ্যা থেকে নির্বাসন, রাক্ষসরাজ কর্তৃক হরণ অবশ্যই ভাগ্যের বিড়ম্বনা। হয়তো ভাগ্যের পরীক্ষা এবং খ্যাতির বিড়ম্বনা! সবই সময়ে ঠিক হয়ে যাবে। মেঘের অন্তরাল থেকে প্রখর সূর্য দৃশ্যমান হয়েছে, শীঘ্রই অধর্মের প্রতিপত্তি দগ্ধ হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। তুমি রাক্ষসরাজকে অগ্রাহ্য করে যে পতিব্রতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার উদাহরণ স্থাপন করেছো, তা পৃথিবীর বুকে তোমার পবিত্র স্মৃতিকে অমর করে রাখবে।'

এইবার সরমা সীতাকে পুনরায় প্রণাম করে চারিদিকে রাক্ষসীদের লক্ষ্য করলেন। মন্দোদরীর মতো সরমাও এই কামদগ্ধ রাক্ষসনারীদের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

সীতার প্রতি সরমার সহানুভূতি এবং দয়ার কথা রাক্ষসীদের অবিদিত নয়। রাণী মন্দোদরীও সীতার দুঃখে সংবেদনশীল এবং মন্দোদরীও সীতার সঙ্গে অত্যন্ত করুণাপূর্ণ আচরণে লিপ্ত থাকেন।

রাক্ষসীরা লক্ষ্য করে যে দুর্দান্ত রাবণ কামবিদ্ধ হয়ে সীতার নিকটে এলেও, সীতাকে স্পর্শ না করেই চলে যান। এ সবই তাদের নিকট প্রহেলিকা বলে বোধহয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রাবণের মন্ত্রণাসভার জরুরী অধিবেশনে সেই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হলো। রাবণ স্নায়বিক দৌর্বল্যে প্রপীড়িত মুখ্য মন্ত্রীদের সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করলেন না। মাতামহ মাল্যবান শত্রুর বিক্রম ও যুদ্ধক্ষমতা সম্বন্ধে রাবণকে সতর্ক করায়, সভামধ্যে অপমানিত হলেন।

কিন্তু রাবণ নিজে মনে মনে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। রাক্ষসরাজের নিজের শক্তি সম্বন্ধে পর্বতচুম্বী অহংকারকে প্রথম আঘাত প্রদান করেছিলেন বীর হনুমান, যুদ্ধের আগেই। এখন যুদ্ধের প্রারম্ভে দূর থেকে রাক্ষসসেনার পরিদর্শনে প্রবৃত্ত রাবণকে সুগ্রীব এসে নখ ও দন্তের আঘাত করায় রাবণ বিস্মিত হলেন। নিজেকে রামের দাস বলে পরিচয় প্রদান করে সুগ্রীব রাবণের মুকুটটিকে দূরে নিক্ষেপ করলেন। রাবণ মায়াবল প্রয়োগ করার আগেই, সুগ্রীব আকাশে উঠে রাবণের রাক্ষসব্যূহ থেকে নির্গত হলেন।

রাক্ষসরাজ রাবণ বানরাধিপতির এই দুঃসাহস স্বপ্নেও কল্পনা করেন নি। রাবণের গাঢ় নীল কান্তি, প্রকাণ্ড দেহ ও বিশাল আনন, অত্যন্ত মহার্ঘ্য ও রত্নখচিত বস্ত্র এবং রক্তবর্ণ উত্তরীয়, সুগ্রীবের নির্ভীক চিত্তে বিন্দুমাত্র ভয়ের সৃষ্টি করে নি। রাবণ এই অস্ত্রশূন্য অসম সাহসী বৈরীর উন্মত্ততায় বিমূঢ়!

এ'দিকে বিপক্ষ শিবিরে আক্রমণের প্রাথমিক আয়োজনগুলি সম্পাদিত হচ্ছে। রাম বানরসৈন্যদের আক্রমণাত্মক ভূমিকায় সক্রিয়ভাবে অবতীর্ণ হতে আদেশ প্রদান করলেন।

রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতি স্থির করলেন যে বানরসৈন্য লংকা নগরী অবরোধ করবে। প্রথমে ত্রিকুট পর্বতের সানুদেশে চারদিক থেকেই অভিযান আরম্ভ হবে। ক্রমশঃ রাক্ষসদের সমতলভূমিতে পরাজিত করে বানরেরা পর্বত আরোহণ করবে। বিভীষণের চারজন অনুচর পক্ষীর রূপ ধরে লংকাপুরীর রক্ষণব্যবস্থা রাক্ষসদের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্য করে এসেছেন।

রাক্ষসদের মায়াজাল ভেদ করতে, লংকাপুরীর বাহিরে এবং অভ্যন্তরের সকল কার্যকলাপ, আচার অনুষ্ঠান, সুবিধা কৌশল প্রভৃতির গোপন সূত্র আবিষ্কার করতে, বিভীষণই রামের প্রধান সহায়। বিভীষণের মনে কোন দ্বন্দ্ব না থাকলেও মধ্যে মধ্যে তাঁর হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হয়। কিন্তু গভীর অধর্মের পংকে নিমজ্জিত রাবণকে সমূলে উৎপাটিত না করতে পারলে রাক্ষসদের মঙ্গল নেই, লঙ্কারও মঙ্গল নেই।

তাই বিভীষণ রাক্ষস পক্ষের মনের ভাব অনুমান করেও নিজেকে হীন মনে করেন না। কোন আত্মগ্লানিও অনুভব করেন না। রাবণের রাক্ষসপ্রবৃত্তির অপ্রতিহত বিচরণে

দীর্ঘকাল থেকে লংকায় যে পাপের রাশি পুঞ্জীভূত হয়েছে, সে পাপ রাক্ষসদের এই কাম-রিপুর সমূলে উৎপাটনের মধ্যেই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। কামরূপী রাক্ষসদের মূর্তিময় প্রতিনিধি এবং অবিসংবাদিত নেতা রাবণ জীবিত থাকতে লংকার সেই মহাপাপের মোচন হবে না। রাক্ষস রাবণ সীতার দেহ উপভোগের জন্য হয়তো এখনও লালায়িত!

কিন্তু বিভীষণের হৃদয়াকাশে ক্ষণপ্রভার প্রভাদানের মতোই রাবণের মনের মণি-কোটরে অবস্থিত মুক্তির বাসনাটির কথা সেই সময়ে উদয় হয়। অমনই বিভীষণের বুক থেকে এক দীর্ঘশ্বাস মুক্তি লাভ করে। তবে তো রাবণ নিজেই এই দেবাসুরের সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করছেন!

বিভীষণের মনে হয় যে তাঁর নিজের আত্মোপলব্ধি যদি এতদূর অগ্রসর হয়ে থাকে, তবে বিভীষণের অপেক্ষা শতগুণে শিক্ষিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও দার্শনিক রাবণের আত্মোপলব্ধি কি ইতিমধ্যেই চরমে উপনীত হয় নি!

তবে বিভীষণ স্বদেশদ্রোহী ও বিশ্বাসহন্তার আখ্যা লাভ করবেন কেন? স্বদেশের মঙ্গলই তো রাবণের নিধন চায়। স্বজনদের অস্তিত্ব, চারিত্রিক ও নৈতিক উন্নতিই তো রাবণের আধিপত্যের সমাপ্তি আকাঙ্ক্ষা করে।

বিভীষণ ভালোভাবেই উপলব্ধি করেন যে রাবণের রাক্ষসত্বের নাশ না হলে এ'দুটি প্রার্থিত অবস্থার কোনটিই সম্ভব নয়। মনুষ্যরূপধারী রামই কি ভুভার হরণের জন্য লংকার মৃত্তিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, রাক্ষস রাবণের আকাঙ্ক্ষিত প্রতিপক্ষের আবরণে? বিভীষণ তো দুষ্কৃতকারীদের বিনাশে নিমিত্ত মাত্র। বিভীষণের হৃদয়ে অনুশোচনার বাষ্পও নেই।

যুদ্ধের মন্ত্রণার সময়ে বিভীষণ রামকে বিনীতভাবে বললেন, 'হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, তুমি রাবণের অপ্রমেয় সৈন্যবলকে ঠিক মতো বিশ্লেষণ করে উপযুক্তভাবে ব্যূহ রচনা করো। রাক্ষসেরা চতুরঙ্গ সেনায় সজ্জিত এবং ব্যূহযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী। তাদের রথী ও মহারথীরাও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। বানরসৈন্যের পক্ষে পর্বতের তলদেশে সমতল ভূমিতেই রাক্ষসদের নির্যাতিত ও পরাজিত করা সম্ভব। সুতরাং আমরা লংকার তোরণ দ্বারগুলি অবরোধ করলেও রাক্ষসেরা মায়াবলে লংকাপুরী থেকে নির্গত হয়ে বানরদের আক্রমণ করবে। সেই আক্রমণ বানরসেনা সমতলেই প্রতিহত করবে এবং সমতল যুদ্ধেই রাক্ষসদের ধ্বংস করবে। পর্বতের উপরিভাগে কোন সময়েই আমরা খণ্ড যুদ্ধের অথবা সম্মুখ যুদ্ধের পক্ষপাতী হবো না। কারণ, রাক্ষসেরা মায়াবলে সম্মুখ এবং পার্বত্যভূমিতে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত। তারা যাতে কোন অতিরিক্ত সুযোগ ও সুবিধা লাভ করে তা আমার অভিপ্রেত নয়।'

বিভীষণের মূল্যবান উপদেশের তাৎপর্য উপলব্ধি করে রাম বললেন, 'বিভীষণ, তুমি ঠিকই বলেছ। আমি সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, হনুমান, জাম্ববান, নল, নীল প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে তোমার উপদেশই অনুমোদন করেছি। এতে বানরদের পক্ষে নিম্নভূমির বৃক্ষ, পর্বতের প্রস্তর খণ্ড প্রভৃতির সাহায্যে প্রতিপক্ষের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও শিক্ষিত-সৈন্যদলকে বিনষ্ট করা সহজ হবে। রাক্ষসেরা অতর্কিতে পর্বতের আড়াল থেকে অস্ত্র প্রয়োগ করে আমাদের সৈন্য ক্ষয় করতে পারবে না।'

অতঃপর সকলেই রামকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করলেন। রাম বিভীষণকে প্রশ্ন করলেন, 'হে লংকাধীশ, এবার তুমি ব্যক্ত করো যে রাবণ লংকাপুরী রক্ষার কি ব্যবস্থা করেছে। আমি সব জেনে সেইভাবে দুর্গ আক্রমণের পরিকল্পনা রচনা করবো।'

রাম সমবেত সেনানায়কদের উদ্দেশে বললেন, 'তোমরা বোধহয় বুঝতে পেরেছ যে আমরা দুভাবে আক্রমণ করবো। সমতলভুমির রণাঙ্গনে শত্রুকে বাহুবলে পরাজিত করে আমরা লংকাপুরী অধিকার করবো। লংকাপুরীর উপর আমাদের সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে রাবণ ও তার অনুচরেরা বৈদেহীকে কোথায়ও স্থানান্তরিত করতে না পারে। কারণ, তাহলে আমাদের এই সমর প্রচেষ্টা এবং যুদ্ধ অভিযান নিরর্থক হয়ে যাবে। রাবণ বিনষ্ট হলেও আমার মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হবে না।'

রামের সীতাকে উদ্ধারের ব্যাকুলতায় বিচলিত বোধ করে বিভীষণ সহৃদয়তার সঙ্গে বললেন, 'হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, তোমার মতো শৌর্য ও বীর্যও যেমন দুর্লভ, তোমার মতো সেনাপতিও জগতে দুর্লভ। এখন, আমি লংকার দৃঢ় প্রতিরোধব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সংবাদ সংগ্রহ করেছি, তাই ব্যক্ত করছি। লংকাপুরীর চার প্রধান দ্বারে রাক্ষসরাজ শ্রেষ্ঠ রাক্ষসবীরদের স্থাপনের সংকল্প করেছেন। প্রহস্ত পূর্ব দ্বার এবং মহাপার্শ্ব, মহোদর দক্ষিণ দ্বার রক্ষা করবেন। পশ্চিম দ্বার ইন্দ্রজিতের অধীনে থাকবে এবং উত্তর দ্বারের রক্ষার দায়িত্ব থাকবে রাবণের নিজের উপর। রাবণ বোধহয় প্রাচীন সংস্কারের বশবর্তী হয়েই ইন্দ্রজিতকে অথবা নিজেকে লংকার দক্ষিণ দ্বারে স্থাপন করেন নি।'

বিভীষণের শেষ মন্তব্যটিতে সকলেই মনে মনে বিশেষ কৌতুক অনুভব করেন। রাম মৃদু হাস্যের সহযোগে বললেন, 'বন্ধুগণ, তোমাদের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে আমি লংকার প্রধান দ্বারগুলির আক্রমণকারীদের নাম ঘোষণা করবো।'

সকলেই আগ্রহের সঙ্গে রামের যুদ্ধকৌশল নির্ণয়ের পদ্ধতি লক্ষ্য করছিলেন। এখন রামের শেষ উক্তিতে সকলের চোখে মুখেই ঔৎসুক্যের চিহ্ন।

সকলের কৌতূহল নিরসনের জন্য রাম শান্তভাবে বললেন, 'আমি, লক্ষ্মণ, বন্ধু বিভীষণ ও তাঁর চারজন অমাত্য মানুষের রূপ ধারণ করে যুদ্ধ করবো। বানরেরা বানর রূপেই যুদ্ধ করবে, মানুষের রূপ ধারণ করবে না। তবেই আমরা তাদের রাক্ষসদের থেকে স্বতন্ত্র এবং আমাদের স্বজন বলে চিনতে পারবো।'

রামের বাক্যে সকলের মুখেই সমর্থনের চিহ্ন। সকলের মুখে সম্মতির চিহ্ন দেখে রামের নিরুদ্বিগ্ন মুখে এক পবিত্র হাস্য বিকশিত হলো।

রামই তাঁর নিজের পক্ষের প্রধান সেনাপতি, এবং শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। রামের আদেশ সকলেরই শিরোধার্য। এইবার সকলে গভীর আগ্রহে রামের লংকাপুরী আক্রমণের যোদ্ধা নির্বাচন সম্বন্ধে অবহিত হবার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন।

রামের মুখমণ্ডলে এক বিস্ময়কর আত্মপ্রত্যয়ের চিহ্ন। অনুত্তেজিত কণ্ঠে রাম বললেন, 'নীল পূর্বদ্বারে প্রহস্তের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করবেন। অঙ্গদ দক্ষিণদ্বারে মহাপার্শ্ব, মহোদরকে আক্রমণ করবেন। হনুমান পশ্চিমদ্বার ভেদ করতে সচেষ্ট হবেন। দুরাত্মা ও অত্যাচারী রাবণকে বধ করার জন্য আমি ও লক্ষ্মণ উত্তরদ্বারে অভিযান করবো। সুগ্রীব, জাম্ববান ও বিভীষণ মধ্যভাগ থেকে আক্রমণ করবেন।'

রামের আক্রমণ পরিচালনার ব্যবস্থায় অতিশয় প্রীত হয়ে বিভীষণ বললেন, 'রাম, তোমার চরম জয়লাভের জন্য যেমন ইন্দ্রজিৎ ও রাবণের পতন অনিবার্যভাবে আবশ্যক, তেমনই কুম্ভকর্ণের বিনাশও অনুরূপভাবে আবশ্যক। কুম্ভকর্ণ এখন দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভুত। আমাদের সৈন্যদের বল ও বিক্রমে এবং ধ্বংসকারী শক্তির সাহায্যে রাক্ষসদের প্রতি-আক্রমণের মেরুদণ্ডটিকে ভেঙ্গে দিতে হবে। তা'হলেই রাবণ অকালে কুম্ভকর্ণকে রাক্ষসদের পরিত্রাতারূপে যুদ্ধে নিযুক্ত করতে বাধ্য হবেন। সেই অবসরে

তুমি রাবণের প্রধান সহায় কুম্ভকর্ণকে বধ করে রাবণের জয়ের আশাকে চিরতরে নির্মূল করবে। ব্রহ্মার নির্দেশ অনুযায়ী, কুম্ভকর্ণের অকালে নিদ্রাভঙ্গ হলে, তাঁর মৃত্যু অবধারিত।'

মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণের দেশকালোচিত উপদেশে রাম এবং উপস্থিত সকলেই প্রীত হন এবং অতিশয় উৎসাহিত বোধ করেন। বিভীষণের সহায়তা যে লংকাবিজয়ে অপরিহার্য, এই চিন্তা শুধু রামের হৃদয়ে নয়, সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়।

বানরসেনার সমবেত কণ্ঠের জয়ধ্বনির মধ্যে নীলাম্বু মহাসমুদ্র থেকে উদ্ভূত তরঙ্গের গর্জনও ক্ষীণ হয়ে যায়। সাগরের দক্ষিণা পবন সেই গুরুগম্ভীর নিনাদকে ত্রিকূটশিখরে রাক্ষসাধিপতি রাবণের নির্জন বিশ্রামকুঞ্জে বহন করে নিয়ে যায়। নিঃসঙ্গ বিশ্রামের সময় নিভৃত চিন্তার অবসরে রাবণের হৃদয়ে এক অলৌকিক জ্যোতির উদ্ভাস।

অদূরে ভীষণ কোলাহলের মধ্যেও রাবণ সেই অদৃশ্য নিয়তির পদক্ষেপের শব্দে সচকিত হন। মনে এক পুলকের রেশ। রাক্ষসজন্মের অসংখ্য অন্যায়জনিত পাপের পুঞ্জ যেন রাবণের অজ্ঞাতসারেই তাঁর মনের কোনে এক অনুতাপের অনল প্রজ্বলিত করে। সেই পবিত্র অনলে পাপরাশি দগ্ধ হয়ে গেলে ব্রহ্মসচেতন রাবণ বক্ষের শোণিত-ধারায় সেই নিভন্ত ভস্মরাশিকে বিধৌত করে সমুদ্রের সলিলাশ্রয়ে চিরবিশ্রাম লাভ করবেন। রাবণের উৎকণ্ঠ শ্রবণে বানরদের তীক্ষ্ন হুংকার যেন মহাকালের অমোঘ আহ্বান!

*   *   *   *

রাম বানর এবং ভল্লুক বাহিনী নিয়ে লংকাপুরীর উত্তর দ্বার আক্রমণ করতেই প্রকৃত সংগ্রামের সূচনা হলো। রামের আদেশে অঙ্গদ আকাশপথে যাত্রা করে শেষবারের মতো রাবণকে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন। অঙ্গদ এমন কথাও রাবণকে বললেন যে অন্যথায় রাম যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ঋষিদের কণ্টকস্বরূপ রাবণকে সবংশে নিধন করে লংকার সমুদয় ধনরত্ন ও সম্পদ বিভীষণকেই প্রদান করবেন।

অঙ্গদ রাবণের বন্দী করার আদেশকে বিদ্রূপ করে এবং রাক্ষসদের বেষ্টনীকে বাহুবলে চূর্ণ করে এক লম্ফে প্রাসাদশিখরে আরোহণ করলেন! নিজের নাম সগর্বে ঘোষণা করে অঙ্গদ রামের নিকটে ফিরে এলেন।

অঙ্গদের সতর্কবাণী স্মরণ কোরে ক্রোধে এবং বিদ্বেষে রাবণের অন্তঃকরণ পূর্ণ হলো। তবে এই হীন অভিলাষ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বিভীষণ রাবণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! বিভীষণ রাজ্যকামী, সম্পদলোভী! বিভীষণের সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির অন্তরালে প্রতিহিংসা ও লালসার কদর্য অস্তিত্ব! রাম নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে রাক্ষসদের অনেক গুপ্ত সংবাদ বিভীষণের নিকট পেয়েছেন। হায়, বিভীষণ বিশ্বাসহন্তা হবে, এ যে স্বপ্নেরও অতীত!

রাবণের হৃদয়ে ক্রোধ ও বিদ্বেষ, ঘৃণায় ও কৃপায় রূপান্তরিত হয়। সামান্য এক রাজপুত্র, তাও পিতা কর্তৃক নির্বাসিত; তার এত বড় স্পর্ধা যে ভুবনজয়ী, ত্রিলোকত্রাস রাবণের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়! রাক্ষসসৈন্য ফুৎকারে না হলেও অল্প আয়াসেই বানরসৈন্যসহ এই সম্পায়ু রামকে যমালয়ে প্রেরণ করবে। তখন দেখা যাবে কেমন করে জাতিদ্রোহী, দেশদ্রোহী বিভীষণ স্বর্ণলংকার সিংহাসনে উপবিষ্ট হবার অলীক বাসনা পূর্ণ করে! অযোগ্য ব্যক্তিরও দুরাশার শেষ নেই!

পুনরায় রাক্ষসরাজের অন্তরস্থ তেজবহ্নি তাঁর বিস্তীর্ণ মুখমণ্ডলে প্রতিবিম্বিত হয়।

না, বিভীষণের এই আশাপ্রসূনটিকে দলিত মথিত করে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করতে হবে। ক্রোধ এসে রাবণকে সম্মোহিত করে, ক্রমে হৃদয় তাঁর বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুরতায় আচ্ছন্ন হয়।

রাক্ষসরাজ ক্রোধে অন্ধপ্রায় হন। তিনি যুদ্ধের প্রারম্ভেই প্রমাণ করবেন যে রাম ও লক্ষ্মণ যুদ্ধে তাঁর নিকট বালক মাত্র এবং রাক্ষসদের মায়াবল ও রণচাতুর্যের তুলনায় তাদের শক্তি ও সামর্থ্য নিতান্ত অকিঞ্চিতকর।

প্রথম দিনের যুদ্ধই অত্যন্ত ভীষণ বিধ্বংসী রূপ ধারণ করলো। অঙ্গদ ও ইন্দ্রজিতের মধ্যে আঘাত বিনিময় হলো, ইন্দ্রজিতের রথ ও সারথী বিনষ্ট হলো। হনুমান জাম্বুমালীকে বধ করলেন। প্রঘসকে বৃক্ষের আঘাতে সুগ্রীব নিধন করলেন। লক্ষ্মণের শরে বিরূপাক্ষ নিপাতিত হলেন। সুষেণ বিদ্যুম্মালীকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করলেন। রাম ও নল রাক্ষসনিধনে তৎপর হলেন।

দিনমনি অস্তাচলে গেলে, ক্ষণিক বিরতির পরে নিশাযুদ্ধ আরম্ভ হলো। রাক্ষসেরা নিশাচর বলে পরিচিত। বানরেরাও তীক্ষ্ন দৃষ্টিসম্পন্ন। বানর-রাক্ষসের হিংস্র নৈশযুদ্ধে প্রাণী হত্যার ভয়ংকর তাণ্ডবলীলা অপ্রতিহত গতিতে চলে। পরস্পরের প্রতি আস্ফালনে এবং পরস্পরের হুংকারে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হলো।

রামের শর নিক্ষেপে জর্জরিত ও ভীত হয়ে রাক্ষস মহারথীগণ পলায়নে তৎপর। শরাঘাতে বজ্রদংষ্ট্র, মহাপার্শ্ব, মহোদর, শুক ও সারণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সম্মুখ যুদ্ধে রাক্ষসদের নিস্তার নেই।

অঙ্গদের হাতে নিগ্রহের পরে ইন্দ্রজিৎ ক্রোধযুক্ত হয়ে রাবণের আদেশে মায়াবল প্রয়োগ করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

অদৃশ্য ইন্দ্রজিতের অতর্কিত শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলেন রাম ও লক্ষণ। সর্বাঙ্গে বাণবিদ্ধ হয়ে অসহায়ভাবে দুই ভ্রাতা বীর শয্যায় শয়ন করলেন। দেহে কোন স্থানই অক্ষত নেই। বানরেরা তাঁদের দুজনের জীবনের আশা ত্যাগ করে শোকগ্রস্ত হৃদয়ে রোদন করতে লাগলেন।

রাক্ষস শিবিরে সকলের হৃদয়ে গভীর উল্লাস। পৈশাচিক আনন্দে রাক্ষসসৈন্য নৃত্য করতে লাগলো। রাত্রের গাঢ় অন্ধকারে মশালের ক্ষীণ আলোকশিখাগুলি বিস্তৃত সমরাঙ্গনে এক বিভীষিকাময় বাতাবরণের সৃষ্টি করে দুই প্রবল পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে যেন তীব্রতর করলো।

সুগ্রীব, বিভীষণ, নীল, অঙ্গদ, সুষেণ হনুমান প্রভৃতি সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। এই আকস্মিক বিপর্যয়ের প্রভাবে সকলেই মিয়মাণ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

তীব্র প্রতিহিংসার প্রবৃত্তিতে জাগরিত হয়ে বিভীষণ ইন্দ্রজিতকে খুঁজতে চারদিক নিরীক্ষণ করলেন। শেষে মায়াবলে বিভীষণ ইন্দ্রজিতের সাক্ষাৎলাভ করলে, ইন্দ্রজিৎ সগর্বে বললেন 'যে আমার পিতার নিদ্রাহরণকারী, রাক্ষসকুলের এবং লংকাপুরীর সকল অনর্থের মূল, সেই রাম ও লক্ষ্মণকে আমি শরপ্রহারে বধ করেছি। আর কেউই ওদের প্রাণ দিতে পারবে না। ওদের যমালয়ে প্রেরণ করে আমি লংকায় রাক্ষসদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছি। কনিষ্ঠতাত, আপনি নির্লজ্জ, কারণ আপনি সেই সামান্য মানব রামের ক্রীতদাস হয়ে দেশের প্রতি, দেশের রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। ধিক্ আপনাকে।'

ইন্দ্রজিৎ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে রাবণকে রাম ও লক্ষ্মণের নিধনের সংবাদ দিলেন। রাবণ পুত্রকে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে আলিঙ্গন করলেন। তার পরে রাবণ প্রবীণা রাক্ষসী ত্রিজটাকে আদেশ করলেন শূন্য থেকে সীতাকে রাম ও লক্ষ্মণের ধূলায় লুণ্ঠিত মৃতদেহ দেখাবার অন্য।

ত্রিজটা সীতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'রাম ও লক্ষ্মণের মুখশ্রী নষ্ট হয়নি, সুতরাং তাঁরা শরাঘাতে অচৈতন্য হয়েছেন মাত্র। তাঁদের মৃত্যু হয় নি।'

অন্যদিকে বানর শিবিরে হুতাশা ও শোকের ছায়া। রাম ও লক্ষ্মণের বাণাহত অজ্ঞান অবস্থায় সকলেই দুঃখে ও অনাগত বিপদের আশংকায় মুহ্যমান। বিভীষণ প্রথমে সুগ্রীব হনুমান প্রভৃতিকে সান্ত্বনা প্রদান করলেও, এই রাজপুত্রদের জীবন সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছেন।

শোকে, দুঃখে শিরে করাঘাত করে বিভীষণ ব্যাকুল হৃদয়ে বললেন, 'দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের অন্যায় যুদ্ধেই রাম ও লক্ষ্মণের এই শোচনীয় অবস্থা। হায়, আমি যাদের উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠার আশা করেছিলাম, তাঁরা এখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত! আমি এখন কি করবো? আমার রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা ধূলিস্যাৎ হয়েছে, রাবণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে!'

সুগ্রীব বিভীষণের বিপন্ন অবস্থা দেখে সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে বললেন, 'ধর্মজ্ঞ বিভীষণ, তোমার লংকায় রাজা হওয়ার পথ কেউই রোধ করতে পারবে না। চিন্তিত হয়ো না। রাম ও লক্ষ্মণ শীঘ্রই গরুড়ের সহায়তায় নাগপাশ থেকে মুক্ত হবেন। এঁরা আঘাত পেয়ে মূর্ছা গেছেন মাত্র। অলক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞা লাভ করে রাবণকে যুদ্ধে পরাস্ত করবেন।'

গরুড়ের অভাবনীয় আবির্ভাবে চার দিকে প্রকৃতির মধ্যে এক বিপুল উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হলো। আকাশ, বাতাস, সমুদ্র, বালুকারাশি, তরুরাজি সবই আবেগে কম্পিত হয়ে রাম ও লক্ষ্মণের নাগপাশ থেকে মুক্তির আনন্দে উত্তাল। গরুড়কে দেখেই সর্পকুল ত্রাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। রাম, লক্ষ্মণের ক্ষতও গরুড়ের স্পর্শে তিরোহিত হলো। গরুড় রামকে আলিঙ্গন করলেন এবং নিজের পরিচয় দিলেন।

রাম ও লক্ষ্মণের ইতিমধ্যে সংজ্ঞালাভে বানরসৈন্য প্রচণ্ডভাবে হুংকার করে উল্লাসে এবং উদ্দীপনায় আত্মহারা হলো। রাম ও লক্ষ্মণের জয়ধ্বনিতে সমুদ্রসৈকতের আকাশ ও বাতাস মুখরিত হলো। সেই ভয়ংকর শব্দ ত্রিকূটশিখরে রাক্ষসরাজের কর্ণে প্রবেশ করলো। রাবণ সংবাদ পেলেন, রাম ও লক্ষ্মণ পাশমুক্ত হয়েছে।

এদিকে বিভীষণের হৃদয় এক অভূতপূর্ব আনন্দের আবেগে নৃত্য করতে লাগলো। তবে বিভীষণের লংকার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার আশা তিরোহিত হয়নি!

বিভীষণ নিজের মনেই এই রাজ্যকামনার চিন্তায় বিস্মিত হন। কই, আগে তো তিনি স্বপ্নেও লংকার অধিপতি হবার কথা চিন্তা করেন নি। তবে এখন লংকেশ্বরের রাক্ষসোচিত তামসিকতা, অদূরদর্শিতা এবং নিষ্ঠুরতাই বিভীষণকে তাঁর নিধন কামনায় প্রলুব্ধ করেছে! বিভীষণ তো রাবণের হৃদয়বৃত্তির সংস্কার সাধনের দ্বারাই স্বদেশ ও স্বজনদের চিরস্থায়ী উপকারের জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু হায়, রাবণের রাক্ষসসত্তাই রাবণের উপর পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করলো। মহাজ্ঞানী, মহাতপস্বী রাবণের রাক্ষসসুলভ কামপ্রবৃত্তি ও মায়াবল রাবণকে তত্ত্বজ্ঞান-লাভ ও আত্মোপলব্ধির পুণ্য পথ থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত করলো!

এই পরিস্থিতিতে বিভীষণের রাজ্যের বাসনা অন্যায় ও অসঙ্গত নয়। স্বদেশ ও স্বজনদের অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার মহৎ উদ্দেশ্যে, এই পথ ব্যতীত অন্য পথ নেই। বিভীষণ গভীরভাবে চিন্তা করেন যে তিনি তো ন্যায় ও ধর্মের পথই গ্রহণ করেছেন। রামের মাহাত্ম্যকে স্বীকার করেছেন, রাক্ষসদের হৃদয়গত পরিমার্জনের আবশ্যকতাই অনুভব করেছেন। এই উচ্চ ও মহৎ ব্রত পালনের জন্য যে প্রধান বাধাটি দূরীভূত করতে হবে, যে তীক্ষ্ন কণ্টকটিকে উৎপাটিত করতে হবে, সেই প্রধান বাধা ও কণ্টক হচ্ছে স্বয়ং রাবণ। আর রাবণ যদি নিজের মুক্তি কামনাতেই এই বিপদসংকুল পথ নির্বাচন করে থাকেন, তবে বিভীষণ তো রাবণের সেই পুণ্য ব্রত পালনের সহায়ক, সেই অভীপ্সিত মোক্ষ লাভের পথে সহযোগী বন্ধু। বিভীষণ রাবণের শ্রেষ্ঠ হিতকামী, বিভীষণ কখনই বিশ্বাসহন্তা বা স্বজনদ্রোহী নন। বিভীষণ নিজের বিবেকের নিকট অপরাধী নন।

অন্যদিকে রাম ও লক্ষ্মণের অভাবনীয়ভাবে পুনর্জীবন লাভ করা লংকাধিপতি রাবণের নিকট এক অনাগত বিপর্যয়ের পূর্বাভাস বলেই বোধ হয়েছে। কে এই রাম, এই প্রশ্ন বার বার রাক্ষসরাজ রাবণের হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উত্থিত হচ্ছে! এ কি করে সম্ভব! ইন্দ্রজিৎ তো মিথ্যা সংবাদ দেয় নি তাঁকে। রাবণের হৃদয় গভীর উত্তেজনায় কম্পিত হয়। দৈবই সর্বক্ষেত্রে বলবত্তর, এ বিষয়ে সংশয় নেই। কিন্তু এই দৈব যে রাক্ষস রাবণের বিপরীত, তাতে সন্দেহ নেই। তবে কি রাক্ষসরাজ রাবণের দিন শেষ হয়ে আসছে! তবে কি বিভীষণই লংকার ভবিষ্যৎ?

এই মানবরূপী রামের হাতে যদি তাঁর মৃত্যু থাকে, তবে রাবণ নিশ্চয়ই জানতে আগ্রহী যে এই রাম সত্য সত্যই কে। কোন সাধারণ মানুষ কি এই বিপুল সেনা-বাহিনী নিয়ে সমুদ্র লংঘন করে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত লংকাপুরী আক্রমণ করতে সাহস করে!

রাবণের স্মৃতিতে উদয় হয় যে তিনি অতীতে বিষ্ণুর সঙ্গে ক্ষমতা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সুযোগ হয় নি। সেই আক্ষেপ রাবণের কখনও যায় নি। তবে কি ইহজীবনে সে সুযোগ হবে না! হলে, দেখিয়ে দেবেন রাবণ যে বিশ্রবার পুত্র, শিরায় ও ধমনীতে ব্রহ্মরক্তবাহী রাবণ-দানে, ধ্যানে, পুণ্যে, বীরত্বে, স্বর্গ, মর্ত ও পাতালে কারও অপেক্ষা হীন নয়। রাবণ পুনরায় চিন্তা করেন তবে কি রাম আর সেই আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ এক ও অভিন্ন! না না, কখনই না। এই ভিখারী রাজপুত্রকে এতটা মহৎ ও অপার্থিব ভাবা যায় না।

* * * *

কিন্তু অন্য এক ভাবনা রাক্ষসরাজকে কিছুতেই ত্যাগ করছে না। সম্মুখ সংগ্রামে রাক্ষসপক্ষের উপর্যুপরি এই বিপর্যয়ের কারণ কি? শূল, মুদগর, গদা, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, পরশু প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রে ভূষিত হয়ে রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধ করছে। বানরদের শুধু হাতের নখর ও মুখের দন্ত এবং বৃক্ষ ও শিলাখণ্ড সম্বল। এই দুই অস্ত্রের ভয়ংকরতা রাবণের শিক্ষিত সেনার তীক্ষ্ন আয়ুধগুলিকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। দৈহিক বলে বানরেরাই অগ্রণী।

হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধে রাক্ষসবীর ধূম্রাক্ষ মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। বজ্রদংষ্ট্র নিহত হলেন অঙ্গদের হাতে। বার বার এই পরাজয়ে রাবণের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হয়। এ যেন অক্ষ ক্রীড়ার মতো অনিশ্চয়তা। একবার বিপর্যয়ের পরে রাবণ পরবর্তী সেনাপতির

উপর ফললাভের আশা করেন। সেনাপতিরাও রাক্ষসনায়ককে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে, রাম ও লক্ষ্মণকে অনায়াসেই বধ করবেন বলে সর্বাধিনায়কের মনে প্রত্যাশার উদ্রেক করেন। তারপরে নিজেদের বীরত্বের আস্ফালন করে সসৈন্যে রণক্ষেত্রে গমন করেন। কিন্তু ফল একই। সেনাপতির নিধন, রাক্ষস সৈন্যের পলায়ন এবং রাবণের নৈরাশ্য।

সর্বশস্ত্রবিশারদ অকম্পন হনুমানের হাতে বৃক্ষের আঘাতে প্রাণত্যাগ করলেন। রাবণের মন্ত্রী ও সেনাপতিরা বানরদের বিক্রমে ভীত ও নৈরাশ্যযুক্ত। লংকাপুরীতে বোধহয় কোন বীরই নিরাপদ নন। অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের অনিবার্যতা ক্রমশঃ সকলের মনকেই অধিকার করে।

অকম্পনের নিধনের পরে প্রহস্ত রাক্ষসরাজ কর্তৃক বানরদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হলেন। রাবণের এইবার চৈতন্যোদয় হয়েছে যে প্রতিপক্ষ অত্যন্ত প্রবল। রাবণের হৃদয়ে এখন এই ভয় যে রাম ও লক্ষ্মণ এই বানরদের বিক্রমের সাহায্যেই যুদ্ধ জয়ের পথে অনেক দূর অগ্রসর হবে।

বিভীষণ রামকে সতর্ক করলেন। মহাবীর প্রহস্তের দ্রুত সৈন্য পরিচালনায় বিস্মিত হয়ে রাম বিভীষণকে সেনাপতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

বিভীষণ বললেন, 'ইনি অস্ত্রবিশারদ ও বিপুল বীরত্বের অধিকারী, সেনাপতি প্রহস্ত। ইনি রাবণের অন্যতম মুখ্যমন্ত্রী ও উপদেষ্টা। রাবণের সমগ্র সৈন্যের এক-তৃতীয়াংশ এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে।'

বানরেরা যথারীতি শিলা ও বৃক্ষ নিয়ে রাক্ষসসৈন্যকে প্রহারে জর্জরিত করছে। রাক্ষসসৈন্যও নানাবিধ অস্ত্র প্রয়োগ করে বানরদের সঙ্গে প্রাণপণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। দু'পক্ষেই নিহতের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু প্রহস্ত শেষ রক্ষা করতে সক্ষম হলেন না। নীলের সঙ্গে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে নীলের ললাটে মুষলের দ্বারা আঘাত করলেন। কিন্তু বীরবিক্রম নীল এক বৃহৎ শিলাখণ্ডের দ্বারা প্রহস্তের মস্তক চূর্ণ করলেন।

রাক্ষসদের সকল উৎসাহ সেই মুহূর্তের জন্য শেষ হয়ে গেল, মনে হলো। প্রহস্তের সৈন্যবাহিনী নেতার অভাবে নিরুদ্যম ও নৈরাশ্যগ্রস্ত হয়ে লংকাপুরীর মধ্যে পলায়ন করলো। প্রহস্তের সঙ্গে তাঁর চার প্রধান অনুচরও কালের কবলে পতিত হলেন।

উত্তরোত্তর বিপর্যয়ের মুখে রাবণের মনের স্থৈর্য সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। বানর সৈন্য এবং বানর সেনাপতিরা যে ভীষণ শক্তিশালী, এই বিষয়ে রাবণের মনে আর কোন সংশয় নেই। রাবণের চিন্তা এই যে কোন রকমে যদি রামলক্ষ্মণকে পরাজিত ও নিহত করা যায়, তবে বানরেরা সদলবলে লংকা ত্যাগ করে পলায়ন করবে। রাবণ স্থির করলেন তিনি নিজেই যুদ্ধে যাত্রা করবেন।

প্রহস্তের মৃত্যু প্রমাণ করেছে যে বানরেরা অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দুর্ধর্ষ। রাবণ আর তাদের উপেক্ষা না করে নিজেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলেন। বিভীষণ যথারীতি রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে রাবণের বীর্যবত্তা এবং অপরাজেয়তার কথা বললেন। বিভীষণ রাবণের বিচিত্র শরসম্ভারের রহস্যও রামকে জানালেন।

রাবণের সঙ্গে এলেন ইন্দ্রজিৎ, অতিকায়, মহোদয়, কুম্ভ, নিকুম্ভ প্রভৃতি রাক্ষস মহারথীগণ। লংকাপুরী ত্যাগ করার আগে রাবণ পুরী রক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেছেন, যাতে লংকায় তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেউ প্রবেশ করতে না পারে।

রাবণ নিজে যে পৃথিবীজয়ী বীর তার প্রমাণ দিলেন সুগ্রীব, নল, নীল, গবয়, গবাক্ষ

প্রভৃতি বীরদের সংযত করে। রাবণের বিক্রমে ও রণনৈপুণ্যে অসংখ্য বানরসৈন্য নিহত হলো। রাম, লক্ষ্মণকে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অনুমতি দিলেন, কারণ রামের ধারণা হলো যে এই দুর্জয় বীরত্বের যোগ্য প্রত্যুত্তর একমাত্র লক্ষ্মণ অথবা তিনি নিজে।

বিভীষণ রামকে সমর্থন করে বললেন, 'রঘুনাথ, আমার জ্যেষ্ঠের বীরত্বের তুলনা নেই, মেধার তুলনা নেই, জ্ঞানের তুলনা নেই। তিনি বেদবিদ, ব্রহ্মজ্ঞ ও তপস্যা-পরায়ণ। এঁকে সহজে বধ করা যাবে না। সত্য কথা বলতে কি, ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ ও রাবণ, এই তিন ব্যক্তিই লংকার শ্রেষ্ঠ বীর। রাবণ বিশ্বজয়ী, ইন্দ্রজিৎ অল্প বয়সেই অত্যন্ত বিক্রমশালী এবং প্রায় অজেয়। কুম্ভকর্ণ অতীব শক্তিমান, অর্থাৎ আসুরিক শক্তি-সম্পন্ন। এদের শেষ করতে পারলেই লংকাপুরীর পতন ঘটবে। তুমি এখন নিজে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করো।'

রাবণের অস্ত্রাঘাতে লক্ষ্মণ সাময়িকভাবে ধরাশায়ী হলেন। কিন্তু বীর হনুমানের মুষ্টি প্রহারে রাবণ নিজে সংজ্ঞাহীন হলেন। সংজ্ঞা লাভ করে রাবণ দ্বিগুণ বিক্রমে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরে রাবণ মোহগ্রস্ত হলেন। রামের অলৌকিক বীরত্ব ও অব্যর্থ শরসন্ধান রাবণের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করলো। রাবণ রামকে চাক্ষুষ দেখে হয়তো উপলব্ধি করলেন যে রাম এক ভীষণ বৈরী এবং লংকার বিষম বিপদ উপস্থিত।

দ্বৈত সমরে প্রথম সাক্ষাৎকারে রাম প্রতিপক্ষ রাবণের অসামান্য বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি জানিয়ে, তাঁকে বিশ্রাম গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। রাবণ তখন সত্যই রণক্লান্ত। রাবণ সারথীকে রথ লংকাপুরীর অভিমুখে চালিত করতে আদেশ দিলেন।

কে এই শত্রু, যে এই প্রথম দর্শনেই তাঁর হৃদয় জয় করে নিলো! এই নবদূর্বাদল-শ্যাম বর্ণ, মুখের দিব্য কান্তি, অপরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব, এ সবই কি এক সাধারণ মানবের? কেন রামের শত্রুর প্রতি অহেতুক এই করুণা! রামের সুন্দর আননের স্বর্গীয় জ্যোতিতে যেন দয়া ও প্রেমের এক অপূর্ব মিশ্রণ। রাবণ আর চিন্তা করতে সক্ষম হন না।

*   *   *   *

বিভীষণ মনের গোপন ব্যাথার কথা ব্যক্ত করতে পারেন না। পতিব্রতা ভার্যা সরমা এবং প্রিয় পুত্র তরণীসেনের বিরহে মধ্যে মধ্যে তিনি মনে মনে কাতর হন। রাম লক্ষ্য করেন মিত্র বিভীষণের এই ভাবান্তর। কিন্তু সঙ্গত কারণেই কোন প্রশ্ন করেন না।

বিভীষণ তাঁর মনের দুঃখ অতি কষ্টে সংবরণ করেন। না জানি কবে রাক্ষস-রাজ পুত্র তরণীসেনকে যুদ্ধের আদেশ দেন। পিতৃভক্ত তরণীসেন কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত অন্ত প্রাণ। বিভীষণ নিশ্চিত যে স্বদেশ ও স্বজনের পক্ষ অবলম্বন কোরে রাবণের খ্যাতি ও মর্যাদাকে অটুট রাখতে কিশোর তরণীসেন রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবেই। রামকে দেখে প্রকৃত ভক্তের মতো সে প্রাণে গভীর পুলক অনুভব করবে। পিতার মতো পুত্র তরণীসেনও রামের অনুরাগী ও গুণগ্রাহী।

কিন্তু রাবণ যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে তরণীসেনের আগেই কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং অকালে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করতে হলো।

বানরসেনার নিরন্তর উল্লাসধ্বনিতে রাবণের রাক্ষসহৃদয় কম্পিত হয়। কিন্তু রাবণ নিজের মনোবল অক্ষুন্ন রাখতে মনে মনে সীতাকে কামনা করেন। রাবণ অথবা

কুম্ভকর্ণ রামকে নিহত করতে সক্ষম হলেই, রাবণ জনকনন্দিনীর দেহ উপভোগ করবেন।

পদভারে মেদিনী কম্পিত করে এবং প্রবল হুংকারে সমগ্র লংকাপুরী এবং সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ রণভূমিকে নিনাদিত করে, কুম্ভকর্ণ অসংখ্য রাক্ষসসৈন্যের সমভিব্যাহারে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। কুম্ভকর্ণের বিশাল দেহ, বিরাট মস্তক এবং সুদৃঢ় ও লৌহকঠিন হস্তপদ বানরদের হৃদয়ে আতংকের সঞ্চার করে। কুম্ভকর্ণ সংখ্যাহীন বানরকে বধ করেন। কুম্ভকর্ণের অগ্নিগোলকের মতো রক্তবর্ণ চক্ষুদুটি দুরন্ত বেগে শত্রু সৈন্যকে অনুসরণ করে মুষ্ট্যাঘাতে এবং পদভারে তাদের ধ্বংস করে।

বিভীষণ ইতিপূর্বেই রামকে কুম্ভকর্ণের নিদারুণ বলবীর্য ও হিংস্র যুদ্ধপ্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত করেছিলেন। কুম্ভকর্ণের রণহুংকারে সমুদ্র উচ্ছ্বসিত ও পর্বত কম্পিত হলো। এই প্রথম বানরদের মধ্যে ত্রাহি রব।

নীল, শরভ, গবাক্ষ, অঙ্গদ সকলেই কুম্ভকর্ণের নিকট পরাজিত হয়েছেন। এমন কি, বীর চূড়ামণি হনুমান কুম্ভকর্ণের শূলের আঘাতে বিদীর্ণবক্ষ হয়ে প্রচণ্ড গর্জন করতে লাগলেন। সুগ্রীব নিক্ষিপ্ত পর্বত কুম্ভকর্ণের বক্ষের আঘাতে চূর্ণ হলো। বানরেরা এই ভীমকায় কুম্ভকর্ণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অক্ষম।

হনুমান কৌশলে কুম্ভকর্ণের নাসাকর্ণ ছেদন করার পরে লক্ষ্মণ তাঁর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কুম্ভকর্ণ রামের সঙ্গে যুদ্ধ করার কামনা প্রকাশ করলেন।

কুম্ভকর্ণের ক্ষতবিক্ষত প্রকাণ্ড দেহের উপরে বানরেরা বিচরণ করতে প্রলুব্ধ হলে, কুম্ভকর্ণ তাদের দূরে নিক্ষেপ করলেন।

কিন্তু রাবণের সেই অদৃশ্য নিয়তিই রাবণের কনিষ্ঠ কুম্ভকর্ণকে মারাত্মক আঘাতে জর্জরিত করতে উদ্যত হলো। রামের শরপ্রহারে কুম্ভকর্ণ ছিন্নবাহু, ছিন্নপদ। কুম্ভকর্ণ বিকটভাবে মুখ ব্যাদান করে রামকে আক্রমণ করলেন। রাম ভীষণদর্শন ঐন্দ্র বাণ ধনুকে সংযোজন করে রাক্ষসপ্রবর কুম্ভকর্ণের সুবৃহৎ মস্তকটি ছেদন করলেন। বিরাট পর্বততুল্য কুম্ভকর্ণের দেহটি ধরায় লুণ্ঠিত হলো। লংকার গৌরব-সূর্য লজ্জায় মেঘের অন্তরালে অন্তর্হিত হলো।

কুম্ভকর্ণের পতনে বানরদের আনন্দধ্বনিতে লংকার সিংহাসনে উপবিষ্ট রাবণের হৃদকম্পন উপস্থিত হলো। দূতের মুখে কুম্ভকর্ণের নিধনের সংবাদে রক্ষরাজ জ্ঞানশূন্য হয়ে সিংহাসন থেকে ভূতলে লুণ্ঠিত হলেন।

সম্বিত লাভ করার পরে হা কুম্ভকর্ণ হা কুম্ভকর্ণ বলে বিলাপ করতে করতে রাবণ শিশুর মতো রোদন করলেন। কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে যেন রাবণের ডান বাহুটি ছিন্ন হয়ে ধরণীর ধূলিকণায় পরিণত হলো। লংকাপুরীতে শত সহস্র গৃহে পতিহারা, পুত্রহারা রাক্ষসীদের ক্রন্দনধ্বনি রাক্ষসরাজের হৃদয় বিদীর্ণ করলো।

ক্রমে সমুদ্র এসে কুম্ভকর্ণের পর্বতপ্রমাণ শবটিকে গ্রাস করলো। কুম্ভকর্ণের সঙ্গে অসংখ্য রাক্ষসসৈন্যও নিহত হয়েছে। তাদের খণ্ডিত, বিকৃত ক্ষতবিক্ষত দেহগুলিও সমুদ্রের অতল গহ্বরে বিলীন হলো।

বিপরীত শিবিরে বিভীষণের হৃদয় গভীর শোকে অভিভূত। বিভীষণ স্মরণ করলেন যে কুম্ভকর্ণ সীতা হরণের নৈতিক যুক্তির বিরুদ্ধে রাবণের নিকট প্রতিবাদ করেছিলেন। কুম্ভকর্ণ পাপকে ঘৃণা করলেও, পাপীকে ঘৃণা করেন নি। ভ্রাতা

রাবণের প্রতি ভ্রাতৃবাৎসল্যে এবং স্বদেশের প্রতি অনুরাগে অনুপ্রাণিত হয়ে কুম্ভকর্ণ রামের বিপক্ষে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু কুম্ভকর্ণের আগের একটি উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়েছিল যে রামের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ছিলেন না। হয়তো কুম্ভকর্ণ রামের হাতে মৃত্যু কামনা করেছিলেন।

বিভীষণ মানসচক্ষে লক্ষ্য করলেন যে অহংকারী রাবণের রাক্ষস-কামনার সলিল-সমাধি রচনা করতে সমুদ্র যেন ক্রমশঃ লংকাপুরীর নিকটবর্তী হচ্ছে।

* * * *

কুম্ভকর্ণের অপ্রত্যাশিত নিধনে লংকার রাক্ষসপুরীতে গভীর শোকের ছায়া। রাবণ এবার তাঁর অন্য পুত্রদের যুদ্ধে প্রেরণ করতে সংকল্প করেন। ইন্দ্রজিৎ রাক্ষস-রাজ রাবণের এবং স্বর্ণলংকার শেষ অবলম্বন। এখনও রাবণের আশা হয় যে হয়তো অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যুদ্ধ করে, পুত্র মেঘনাদ তার ভয়ংকর শরপ্রহারে রাম ও লক্ষ্মণকে নিহত করবেন।

কিন্তু রাবণ বিভীষণের মৃত্যুহীনতার কথা অবগত হলেও, রাম ও লক্ষ্মণের অস্ত্রের দ্বারা অবধ্যতার গোপন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অবহিত নন। নিজের এবং ইন্দ্রজিতের চরম সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার আগে, রাবণ তাঁর চার পুত্র নরান্তক, দেবান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায়কে সৈন্য পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান করলেন। এই পুত্রেরা সকলেই উদ্ধত প্রকৃতির এবং দুর্ধর্ষ বীর। পুত্রদের সুগঠিত তনুগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করে রাবণের মনে গর্বের অন্ত নেই। এরা সকলেই রাম ও লক্ষ্মণের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

রাবণ তাঁর দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহারথী মহোদর ও মহাপার্শ্বকেও তাঁদের ভ্রাতু-ষ্পুত্রদের পরে সৈন্যাপত্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। এই আহ্বান এবং অনুরোধ সবই রাক্ষসরাজের আদেশ এবং অবশ্য পালনীয়। সকলেই কুম্ভকর্ণের মৃত্যুজনিত শোক ও দুঃখকে পরিহার করে শত্রুবধের প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ এই প্রতিশ্রুতির মূল্য কি, তা বোধহয় ক্রমশঃ উপলব্ধি করছেন।

রাবণ একদিকে যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। অন্যদিকে নিজের পর্বতচূড়ার বিরামকুঞ্জে সুযোগ্য ভ্রাতা মহাবলী কুম্ভকর্ণের জন্য শোকে মগ্ন হচ্ছেন। রাবণের হৃদয়ের হাহাকার যেন সমুদ্রোত্থিত বায়ুবেগে সঞ্চারিত হয়ে লংকার আকাশে, অরণ্যে, প্রাসাদে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

সাগরের বিরামবিহীন তরঙ্গগর্জনের মধ্যে একটি নেতিবাচক শব্দপ্রবাহ এসে রাবণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে। রাক্ষসরাজ সেই শব্দকে উপেক্ষা কোরো এক ইতিবাচক প্রত্যয়ের স্তম্ভের উপর নিজের ভগ্নপ্রায় আশাকে স্থাপন করতে প্রয়াসী হচ্ছেন।

এই দুঃখ ও সংকল্পের সন্ধিক্ষণে শান্ত পদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করলেন রাজ্ঞী মন্দোদরী। লংকেশ্বরীর সেই নয়নলোভন সুশ্রী আননে বিষাদের স্বাক্ষর, কুসুম-কোমল দেহলতাটি ঈষৎ অবসন্ন। রাণীর দুই চারু নেত্রে ক্লান্তির চিহ্ন। মন্দোদরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে রাবণের হৃদয়ে শংকা জাগে।

মন্দোদরী রাবণের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। তিনি যেন দুঃখের এক প্রতিমূর্তি।

ললাটে করাঘাত করলেন মন্দোদরী। সজল নয়নে পতির অবনত মুখটি লক্ষ্য করে রাণী কাতর স্বরে বললেন, 'হায় রক্ষরাজ, বিভীষণ আগেই আপনাকে ত্যাগ করেছে। আপনার পাপের ভাগী হতে চায় নি, সে। আপনাকে অনেক হিতোপদেশ

ধার্মিক ও মহানুভব বিভীষণ দিয়েছিল। আপনি আপনার ক্ষমতার দর্পে, সে সবে কর্ণপাত করেন নি। আমি জানি, দেবর কুম্ভকর্ণও আপনার সীতাহরণের দুষ্কৃতিকে মহা পাপ বলেই চিহ্নিত করেছিল। সীতাকে তার পতির কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্য অনুনয় বিনয়ও করেছিল। কিন্তু আপনি যে শুধু তার কথা শোনেন নি তাইই নয়, তাকে তিরস্কারও করেছিলেন, অপমানও করেছিলেন। কিন্তু নিজের পরাজয় ও মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও, ভ্রাতৃবৎসল কুম্ভকর্ণ আপনার পক্ষে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়ে গেছে। রাক্ষসনাথ, আপনি কি কারোর প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারবেন? পারবেন না। তবে কেন অকারণে এত প্রাণ বলি দিয়ে শুধু আপনার নিজের অহমিকাকে অক্ষুণ্ণ রাখার বৃথা চেষ্টা করছেন?'

রাবণ নীরবে প্রিয়তমা পত্নীর এই ভৎর্সনা শুনছিলেন। রাবণের হৃদয়েশ্বরী মন্দোদরী এখন হয়তো আর রাবণের হৃদয়ের স্পর্শ সম্পূর্ণভাবে অনুভব করতে পারেন না। কিন্তু তিনি এখন যা বলেছেন, তা মন্দোদরীরই যোগ্য।

রাবণের নিকট মন্দোদরীই সেই নারী যাকে রাবণ হৃদয়ের সকল উষ্ণতা দিয়ে এখনও ভালোবাসেন। সীতাকে তিনি কামনা করলেও, মন্দোদরীর আসনে সীতাকে স্থাপন করার কল্পনাও করেন নি। সীতা রাবণের নিকট মায়া, যে তাঁকে নিয়ত প্রলুব্ধ করছে। সে মায়ার রহস্য হয়তো রাবণ ভেদ করতে সক্ষম হন নি। তাই রাক্ষস-মায়ার কৌশলে রাবণ সীতাকে এবং রামকে বঞ্চনা করার চেষ্টা করছেন।

রাবণকে নিরুত্তর লক্ষ্য করে মন্দোদরীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। লংকাপুরীতে যুদ্ধের প্রথম থেকেই বিপর্যয়ের পারম্পর্যে রাজ্ঞী মন্দোদরীর শংকিত হৃদয়, নৈরাশ্য ও বিষাদে নিমজ্জিত হয়েছিল। এই বিপর্যয় ও অনিষ্টের মূলে যে তাঁর পতিদেবতা, এ'কথা তিনি মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন নি।

মন্দোদরী ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বললেন, 'মহারাজ, এখনও কি আপনি আপনার নিজের ভুলগুলি বুঝতে পারেন নি? লংকার সর্বনাশ যে আসন্ন, একথা কি এখনও আপনার মনকে পীড়া দিচ্ছে না? হায়, আমাদের সকলের কি দুর্ভাগ্য যে শুধু একজনের উগ্র অহংকার ও ক্রোধের ফলে একটি সমগ্র জাতি নষ্ট হয়ে গেল! রাক্ষসরাজ, আপনার শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, তপস্যা, আরাধনা সবই কি আপনার প্রবৃত্তির যূপকাষ্ঠে নিঃশেষ হয়ে গেল! হায় দূরদৃষ্ট, কেন আপনি বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, ও আমার সতর্ক বাণীকে বার বার উপেক্ষা কোরে এই স্বপ্নের লংকাকে প্রতিকারহীন বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন!'

—'কে বলেছে প্রতিকার নেই, মহারাণী? তুমি আমাকে অযথাই তিরস্কার করছ। তুমি কি জান আমি লংকার ধন, সম্পদ, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য এবং শিল্প, কলা, বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য, অথবা প্রজাদের দুঃখ লাঘব করার জন্য কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছি, কত ক্লেশ সহ্য করেছি, কত বিলাসিতা বর্জন করেছি? আমি নিয়ত দেব মহেশ্বর ও মহাশক্তির আরাধনা করেছি। আমি কি আমার নিজের হাতে গড়া দেশকে নষ্ট হতে দিতে পারি? আমি পরদেশ-আক্রমণকারী রামকে যদি উপযুক্ত শিক্ষা না দিতে পারি তো আমার নাম রাবণই নয়। তুমি কিছু চিন্তা কোরো না, লংকেশ্বরী। আমি আমার পুত্রদের এবং অন্য ভ্রাতাদের আহ্বান করেছি। তারা শীঘ্রই যুদ্ধে যাত্রা করবে এবং শত্রুকে ধ্বংস করবে।'

—'মহারাজ, আপনি এখনও আশা করছেন যে আপনার অল্পবয়স্ক পুত্রেরা এবং দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, মহাবীর মহোদর ও মহাপার্শ্ব শত্রুকে নিধন করবে! আশ্চর্য,

এখনও আপনার চৈতন্য হলো না যে রাম, লক্ষ্মণ ও বানরদের আপনি কোন দিনই পরাজিত করতে পারবেন না!'

মন্দোদরীর তীক্ষ্ন কণ্ঠস্বর যেন বিরামকুঞ্জের গবাক্ষ পথে নির্গত হয়ে পর্বত চূড়ায় গিয়ে প্রতিধ্বনিত হলো।

মন্দোদরীর কর্কশ উক্তিতে আজ রাবণের হৃদয় কম্পিত হয় কেন! যে দুই বাহু স্বর্গের বহু দেবতাকে, মর্ত্যের বহু বীরকে এবং পাতালের নাগ প্রভৃতি দুর্ধর্ষ গোষ্ঠীকে নির্জিত ও নিগৃহীত করেছে,সেই দুই বাহু কেন আজ সত্য সত্যই বলবীর্য-শূন্য বলে মনে হয়! একি মনের ভ্রান্তি, না হৃদয়ের দৌর্বল্য, না দেহের অবসাদ! একি সেই অমোঘ পরিণামের শেষ কাহিনী, নিয়তির শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসরণ! রাবণের দৃষ্টি কি মায়ায় ব্যাহত হচ্ছে?

মন্দোদরীর উক্তির শেষ অংশটি স্মরণ করে রাবণ সংযত কণ্ঠে বললেন, 'প্রিয়তমে, তুমি রাক্ষস রাবণের সহধর্মিণী। তোমার পক্ষে স্নায়বিক দৌর্বল্যে এতটা ভেঙ্গে পড়া উচিত নয়। মহারাণী, তুমি প্রকৃতিস্বরূপা, তুমিই তো আমার শক্তি। তুমি বিরূপ হলে, ভাগ্যলক্ষ্মীই আমার প্রতি বিরূপ হবে। মন্দোদরী, আমার পুত্রেরা কেউই নির্বীর্য নয়। তুমি মনে কোন আশংকা রেখো না। শত্রু পরাজিত হবেই।'

এত দুঃখের মধ্যেও রাজ্ঞী মন্দোদরীর মুখে একটি মধুর হাসি বিকশিত হয়। মন্দোদরী হৃদয়ের বিদ্বেষ ও বিক্ষোভের ভাব পরিহার করে, রাবণের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হতে সচেষ্ট হন। বিদ্বেষ থেকে ঘৃণার উদ্রেক হয়। তাঁর স্বামী তো প্রভূত শক্তি এবং বহুবিধ গুণের অধিকারী। তাঁর স্বামী তো বেদজ্ঞ, ধর্মপরায়ণ ও তপস্বী। তাঁর পতির ধার্মিক সত্তাটি তো তাঁর রাক্ষস সত্তার মতো কামরূপী নয়। মন্দোদরীর মনে অকস্মাৎ এই সত্যই প্রতিভাত হয় যে রাবণের চরিত্রের এই বৈপরীত্যই তাঁর জীবনে এই চরম বিপর্যয়ের সূচনা করেছে। মন্দোদরী মনে মনে নিশ্চিত যে রাক্ষস রাবণের নিষ্কৃতি নেই।

রাবণের মুক্তির কথা রাবণ নিজেই একদিন মন্দোদরীকে ব্যক্ত করেছিলেন। লংকার ভবিষ্যৎ যে বিভীষণ, এই কথাও রাবণ প্রকারান্তরে উল্লেখ করেছিলেন। তাই মন্দোদরী রাবণকে জ্ঞানের কথা স্মরণ করিয়েই নির্ভুল পথে নিয়ে আসার শেষ চেষ্টা করলেন।

রাবণের উক্তির প্রত্যুত্তরে কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করে মন্দোদরী শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'মহারাজ, যদি কোথায়ও আমার ধৃষ্টতা হয়, মার্জনা করবেন। আমি দানব-শ্রেষ্ঠ ময়ের কন্যা। আপনার জ্ঞানে, গুণে, বিক্রমে অভিভূত হয়ে পিতা আমাকে আপনার হাতে সম্প্রদান করেছিলেন। মহারাজ, আমার জ্ঞানের পরিধি আপনার তুলনায় সমুদ্রের নিকট গোষ্পদ তুল্য। তবুও আমি আপনার ধর্মপত্নী, সহধর্মিনী। হিত কথা আমি যেমন বুঝি, আপনাকে তেমন বলার অধিকার আমার আছে।'

মন্দোদরীর প্রীতিপূর্ণ বচনে আকৃষ্ট হয়ে রাবণ বেশ কিছুক্ষণ প্রিয়তমা পত্নীর ব্যাকুল নয়ন দুটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। মন্দোদরী লক্ষ্য করলেন যে রাবণের মুখমণ্ডলে চিন্তা ও উত্তেজনার চিহ্নের পরিবর্তে এক অপূর্ব জ্যোতি। যেন রাবণ ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করেছেন, মন্দোদরী তাঁকে কি বলবেন। সহধর্মিতার এক প্রসন্ন ভাব এসে রাবণের আননকে অধিকার করে।

রাবণ প্রশান্ত বদনে বললেন, 'প্রিয়তমে, তোমার কথাগুলি শুনতে খুব ভালো লাগছে আজ। আমি যেন ক্রমশঃ নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি গাঢ় অন্ধকারের মধ্য থেকে।

আরও মনে হচ্ছে, মনের চারপাশে যে নিবিড় আঁধার, সেই আঁধার ভেদ করে ফাঁকে ফাঁকে বিশুদ্ধ আলোর রশ্মি এসে অন্তর্দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করে দিচ্ছে। রাণী, তুমি যা বলবে, বলো, নির্ভয়ে বলো।'

মন্দোদরী তাঁর এই রহস্যময় ও মহানুভব স্বামীর হৃদয়ের পরিবর্তনে মনে মনে আশ্বস্ত হন। তিনি রাবণের এই আত্মানুসন্ধানের প্রবণতাকেই জাগরিত করতে উন্মুখ।

বিলম্ব না করে মন্দোদরী ধীরভাবে বললেন, 'প্রভু, আপনি আপনার রাক্ষস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য অন্যায় ও অধর্মের আশ্রয় নিয়েছেন। আপনি ব্রহ্মচ্যুত হয়েছেন, আপনি মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন, প্রভু। আমি আপনাকে বার বার বলেছি যে সীতার থেকেই লংকার সর্বনাশ হবে। ওকে ত্যাগ করুন, ওকে রামের কাছে ফিরিয়ে দিন। যুদ্ধ বিগ্রহের সম্ভাবনাকে দূরীভূত করুন, আর্যদের সঙ্গে সন্ধি করুন।'

মন্দোদরীর বাক্যে বিচলিত হয়ে রাবণ আকুল কণ্ঠে বললেন, 'মহারাণী, আমি সব জানি। কিন্তু এ আমার নিয়তি, হয়তো এই আমার কাম্য, আমার রাক্ষসজন্ম থেকে উদ্ধারের শেষ অবলম্বন। সীতারূপী মায়ার দ্বারা যে বিরাট শক্তি আবৃত হয়ে আছে, আমি এত সহজেই তাকে স্বীকার করতে চাই নি। চেয়েছি, বিভীষণের স্বপ্নের ইষ্ট সেই বিষ্ণুকে, যাকে আমি খুঁজে পাই নি। এখনো আমার ঐকান্তিক কামনা যে তার সঙ্গে সংগ্রাম করেই, ইহলোক ত্যাগ করবো। মন্দোদরী, সীতাকে পরমা প্রকৃতি বলে স্বীকার করার সময় কি এখনই হয়ে গেছে বলে তুমি মনে করো ? না, না, এখনও শেষ পরীক্ষা বাকী। রাবণকে মূর্খ ভেবো না। যে জ্ঞান অনিবার্যভাবে আসছে, তাকে ধীরে ধীরে আসতে দাও। কিন্তু ভুলে যেও না, আমি স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল-জয়ী রাবণ, যে মুনি বিশ্রবার পুত্র, রাক্ষসী কৈকসীর গর্ভজাত। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, আমি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করবো, শেষ পর্যন্ত দেখবো, তবে আমার শান্তি, তবে আমার নির্বাণ। হাঃ হাঃ হা হা···।'

*   *   *   *

রাক্ষসদের পরাক্রমে এবং যুদ্ধের নৈপুণ্যে বিস্মিত হলেও, রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদ জাম্ববান প্রভৃতি কেউই যুদ্ধে জয় সম্বন্ধে সন্দিহান হন নি। রাবণের বীরত্বপূর্ণ ও গম্ভীর আননে তাঁর চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়েছিল, তা রামের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও তীক্ষ্ন বোধকে অতিক্রম করে নি। মুহূর্তের দর্শনেই রাম রাবণের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও উন্নত চিত্তবৃত্তির সন্ধান লাভ করেছিলেন। রামের হৃদয় যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই স্বীকার করেছিল—'হ্যা, এই আমার যোগ্য বৈরী।'

লংকাদ্বীপে আর্যদের প্রভাব বিস্তার করতে হলে রাবণকে পরাভূত করে বিভীষণের শিরে রাজমুকুট স্থাপন করতে হবে। কুম্ভকর্ণের মৃত্যু রামের পথ থেকে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়কে দূরীভূত করেছে। বাকী ইন্দ্রজিৎ এবং রাবণ নিজে। রাম অন্য কোন রাক্ষস রথী ও মহারথীকে তেমন গুরুত্ব দেন না। বন্ধু সুগ্রীব ও তাঁর অনুচরেরাই এই সব রথী মহারথীকে নিধন করার পক্ষে যথেষ্ট।

রাবণের পুত্র নরান্তক বেগবান অশ্বে আরূঢ় হয়ে শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করে বানরদের বিধ্বস্ত করলেন। কিন্তু অঙ্গদের মুষ্টিপ্রহারে তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হলো। ভ্রাতার শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করে দেবান্তক ও ত্রিশিরা অঙ্গদকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হনুমানের বজ্রসম মুষ্টিপ্রহারে, দেবান্তক নিজের অন্তিম মুহূর্তে উপলব্ধি করে ভ্রাতার পথেরই পথিক হলেন। ত্রিশিরার মুণ্ডকে হনুমান খড়্গপ্রহারে বিচ্ছিন্ন করলেন।

অল্প সময়ের বিরতিতেই রাক্ষসরাজ তাঁর তিন পুত্রকে হারিয়ে শোকে বিহ্বল হলেন। রাক্ষসসৈন্য কিন্তু পুনরায় পূর্ণ বিক্রমে বানরদের আক্রমণ করলো। নানাবিধ অস্ত্র প্রয়োগ করে বানরদের বধ করতে প্রবৃত্ত হলো। বানরসৈন্যও অকুতোভয়ে শিলা ও বৃক্ষ নিয়ে তীব্রভাবে প্রতি-আক্রমণ করে রাক্ষসদের শিবিরে ত্রাসের সৃষ্টি করলো।

নিশাচর রাক্ষসেরাও ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে বন্য পশুর মতো হিংস্রভাবে বানরদের প্রতি ধাবিত হলো। কিন্তু বানরদের তীক্ষ্ণ নখ ও দন্ত রাক্ষসদের আক্রমণের তীব্রতাকে স্তিমিত করলো।

মহোদর নীলের প্রতি শর বর্ষণ করেও যুদ্ধজয়ে কৃতকার্য হলেন না। নীল বৃক্ষের আঘাতে মহোদরকে যমালয়ে প্রেরণ করলেন। ভ্রাতা মহাপার্শ্ব প্রতিহিংসার প্রবৃত্তিতে জাগরিত হয়ে ঋষভের বক্ষে লৌহ গদার দ্বারা আঘাত করলেন। ঋষভের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে রক্তস্রাব হলেও, অল্পক্ষণ পরেই ঋষভ মহাপার্শ্বেরই গদার আঘাতে এই রাক্ষসবীরের জীবন নাশ করলেন।

হায়, কোন সেনাপতিই রাক্ষসরাজ রাবণের উদ্দেশ্য সাধনের পথে এক পদও অগ্রসর হতে পারলেন না! লঙ্কাপুরীর আকাশ ও বাতাস রাক্ষসদের বিলাপে শব্দময় হলো। রাবণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা চিন্তা করলেন। রাক্ষস রাবণের নিকট আর অন্য কোন পথ নেই। এই রুধিরাক্ত ভয়ঙ্কর পথেই শেষ পর্যন্ত চরম পরিণতিতে উপনীত হতে হবে!

এখন ইন্দ্রজিৎই একমাত্র সহায়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অশোকবনে সীতার নিকট যুদ্ধের গতি ও রাক্ষসদের ক্রমিক পরাভবের কাহিনী অজ্ঞাত থাকে না। রাবণ আর সীতাকে প্রলুব্ধ করতে অথবা ভীতি প্রদর্শন করতে আসেন না। সীতা সর্বক্ষণ পতির মুখটি হৃদয়ে স্মরণ কোরে তাঁকে দেখার জন্য মনে মনে ব্যাকুল হন।

সীতার হৃদয়ের গোপন ব্যথার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কোরে বিভীষণ-জায়া সরমা বলেন, 'সখি, আমি তো আগেই বলেছি যে শীঘ্রই তোমার সুদিন আসছে। এই লোকক্ষয়কারী সংগ্রামে রাক্ষসপক্ষের এতটুকুও সুবিধা হয় নি। বানরদের একজন দল-নায়কও নিহত হয় নি। অথচ রাক্ষসরাজের পক্ষে প্রধান সেনাপতিরা ইতিমধ্যেই হত, এমনকি কুম্ভকর্ণও নিহত।'

সরমাকে দেখে সীতার বিষণ্ন মুখ উজ্জ্বল হয়। সরমার উক্তির উত্তরে সীতা বললেন, 'সখি সরমা, এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে রাক্ষসরাজ প্রথম থেকেই নিবৃত্ত হলো না কেন? লঙ্কায় কি এমন কেউই ছিল না যে রাবণকে তার অন্যায় পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে!'

সীতার অকপট প্রশ্নে সরমা সীতার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। সীতাকে আদর করে তাঁর মুখে চুম্বন অঙ্কিত কোরে সরমা নিবিড়ভাবে বললেন, 'লঙ্কাপুরীতে কেবলমাত্র আমার পতিদেবতা এবং রাণী মন্দোদরীই রাক্ষসাধিপতির উপর প্রভাব

বিস্তার করতে পারতেন। তাঁরা যৎপরোনাস্তি চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু মহারাজকে এই অন্যায় ও বিপজ্জনক পথ থেকে কিছুতেই ফেরাতে পারেন নি। সখী, মহাজ্ঞানী, ধর্মজ্ঞ রাবণের এই রকম হীন আচরণ অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ বলেই মনে হয়।'

সরমার বচনে প্রত্যয় স্থাপন করে সীতা বললেন, 'সরমা, আমিও তোমার সঙ্গে একমত। রাক্ষসরাজ যত পাপিষ্ঠই হোক, যত নিষ্ঠুরই তার মনোভাব হোক আমার প্রতি, কিন্তু সে একদিনের জন্যও আমার অঙ্গ স্পর্শ করে নি। আমার শ্লীলতা হানির কোন অপচেষ্টাই করে নি, আমাকে লংকায় নিয়ে আসার পরে। এমন কি, লংকার রাজপ্রাসাদেও আমাকে রাখে নি।'

সীতার কথা শেষ হবার আগেই সরমা বললেন, 'সখি, রাক্ষসরাজ তোমাকে পবিত্র অশোকবনের নির্জন ও পাপশূন্য পরিবেশে বন্দী করে রেখেছেন। বার বার তোমার দেহকে জয় করার জন্য তোমার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। আমি জানি তিনি তাঁর মন্ত্রীদের প্ররোচনা সত্ত্বেও জোর করে তোমার দেহ উপভোগে প্রয়াসী হন নি। এতে তাঁর চারিত্রিক মহত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে।'

সরমার রাবণ-প্রশস্তিতে সীতা কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। দুষ্ট রাবণ মহানুভব হলে, ছল-চাতুর্যে তাঁকে হরণ করে লংকায় আনবে কেন? দুরাত্মা রাবণ তাঁকে ধর্ষণ করে নি সত্য, কিন্তু তাঁকে তাঁর অনুপম পতির নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৈশাচিক আনন্দে আত্মহারা হয়েছে। রাবণের নিকট এটা যদি ক্রীড়া হয়, তবে এ তো এক মারাত্মক ক্রীড়া! এ তো সীতার নিকট মৃত্যুর তুল্য। স্বামীর সঙ্গে এই অনিচ্ছাকৃত বিচ্ছেদ যে সীতার হৃদয়কে বিদীর্ণ করছে!

সীতা নিজের চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বললেন, 'সখী, তুমি যাইই বলো না কেন, রাবণ অত্যন্ত অসভ্য ও অনার্যের মতোই ব্যবহার করেছে আমাদের সঙ্গে। যদি সে আমার পতিকে শত্রু বিবেচনা করে তাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিল, তবে সে সৈন্যসামন্ত নিয়ে দণ্ডকারণ্যেই আমাদের আক্রমণ করে নি কেন! রাবণ নিজেও যজ্ঞবিরোধী রাক্ষস, সুতরাং সে কামুক রাক্ষসের মতোই আত্মপ্রকাশ করেছে। তার এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাকে সবংশে নিহত হতেই হবে। লংকার সিংহাসন অনিবার্যভাবে হারাতেই হবে।'

সীতার অন্তরে ক্রোধের উদ্রেক হয়েছে অনুমান করে, তাঁকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে সরমা বললেন, 'সখী, রাক্ষসরাজের পাপে আজ লংকাপুরীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে। ইতিমধ্যেই আমার স্বামী লঙ্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। অবশ্য, তিনি ধর্মের দিকে, ন্যায়ের দিকেই যোগদান করেছেন। লংকার অনেকেই তাঁকে রাক্ষসদ্রোহী, রাজ্যলোভী বলে অভিহিত করছে। কিন্তু তারা একবারও ভাবছে না যে আজ রাক্ষসদের প্ররোচনাতেই তাদের অধিপতি তোমাকে বন্দী করে রেখে, তোমার পতি, দেবর ও বানরদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে। আজ একলা রাবণের পাপেই নয়, সমগ্র রাক্ষস জাতির পাপেই সোনার লংকা ধ্বংসের পথে চলেছে।'

জনকনন্দিনী সীতা বিদুষী ও বুদ্ধিমতী। তিনি সরমার মনের ক্ষোভের কারণটি উত্তমরূপেই উপলব্ধি করেছেন।

এইবার সরমাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে, সীতা সৌহার্দপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'সখী, তোমার পতির নিন্দায় তুমি কর্ণপাত কোরো না। আমাদের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগদান করা তাঁর পক্ষে যুক্তিযুক্ত অথবা অযৌক্তিক, সেই বিচার ভবিষ্যতের

মানুষেরাই করবে। বিভীষণ নিজে রাবণ এবং লঙ্কার শত্রু অথবা মিত্র, সে কথার জবাব উত্তর কালই দেবে। ধর্ম ও ন্যায় চিরদিনই ধর্ম ও ন্যায়। সখী, আমি যেমন আমার পতির গর্বে গরবিনী, তোমারও তাই হওয়া উচিত। এখন রাক্ষসদের বিরূপ সমালোচনা ও বিদ্রূপ সহ্য করো, ভবিষ্যতে তারাই তোমার পতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে।'

সীতার মধুর বচনে সরমা হৃদয়ে সংবেদনশীলতা এবং সম্প্রীতির স্পর্শটি অনুভব করলেন। সত্যই তো এমন সহজভাবে সত্য কথা তাকে কেউ বলে নি। রাণী মন্দোদরীও নয়। অবশ্য তিনি এখন নিজের যন্ত্রণাতেই অভিভূত।

মন্দোদরী ইন্দ্রজিতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন। পুত্র ইন্দ্রজিৎ ও পুত্রবধূ প্রমীলা মন্দোদরীর নয়নের মণি। রাক্ষসরাজের অপরিণামদর্শী কাজের কুফল ইন্দ্রজিতকে না ভোগ করতে হয়, এই চিন্তাই মন্দোদরীকে দগ্ধ করে দিন রাত্রি।

সরমার মনের কোণে অন্য একটি চিন্তা এসে উঁকি দেয়। ক্রমে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ হতে থাকে সেই চিন্তার লক্ষ্য বস্তু। হৃদয়ের মুকুরে আকস্মিকভাবে প্রতিবিম্বিত হয় তরণীসেনের মুখ।

সরমাকে নিস্তব্ধ লক্ষ্য করে সীতা বিমর্ষ বোধ করেন। সীতার মন্তব্যে বিভীষণের প্রসঙ্গ সরমার সুন্দর আননটিকে আলোকিত করেছিল। কিন্তু এখন সরমার অধরোষ্ঠ বর্ণহীন, চক্ষুদুটি নিষ্প্রভ।

সীতা কিছু প্রশ্ন করার আগেই সরমার হৃদয়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। সরমা সীতাকে দুই বাহুতে আবদ্ধ করে রোদন করেন।

ক্ষীণ ও অস্পষ্ট কণ্ঠে সরমা বললেন, 'সখী, আমার তরণীসেন কি উত্তর কালের সামনে রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে দাঁড়াতে পারবে? বিষ্ণুভক্ত তরণী তার পিতারই সঙ্গে এ বিষয়ে এক নৌকার সহযাত্রী। কিন্তু রাক্ষসরাজ রাবণের সে যত প্রিয় ততই অনুগত। লংকেশ্বরের বিপদের দিনে প্রয়োজন হলে সে তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দেবে। প্রাণও তার কাছে তুচ্ছ।'

সীতা সরমার মনের আশংকাটির তাৎপর্য উপলব্ধি করে বললেন, 'রাক্ষসরাজ এই কিশোরকে যুদ্ধে হয়তো পাঠাবেন না। কিন্তু যদি আমি তোমার পতির হৃদয়ের কিছু পরিচয়ও তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে পেয়ে থাকি, তবে আমার মনে হয় তরণীসেন রাবণের পক্ষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে, তিনি মনে মনে প্রীত হবেন।'

পতির প্রশস্তিতে আনন্দিত হলেও, পুত্রের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বিভীষণজায়া সরমা মনে মনে গভীর দুঃখে মগ্ন হন। সীতার হাত দুটি বক্ষে নিয়ে সজল নয়নে সরমা বললেন, 'সখী, তুমি মহাশক্তিস্বরূপা। মহাত্মা রামের যোগ্য পত্নী তুমি। তুমি ঠিকই বুঝেছ যে তরণীসেন লংকার স্বার্থে তার প্রাণও উৎসর্গ করতে পারে।'

সরমাকে বক্ষে গ্রহণ করে, সীতা দয়ার্দ্র চিত্তে বললেন, 'সখী সরমা, দুঃখ কোরো না। ঈশ্বরের যা অভিপ্রেত, তা হবেই। তবে তোমার পতিদেবতা ও তুমি, দুজনেই ধর্মের পথই অবলম্বন করেছ। তোমাদের উপযুক্ত সন্তানও সেই পথেই যাবে। সুতরাং মনের দুঃখকে দূরে সরিয়ে, পুত্রকে তার কর্তব্য পালন করতে কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ কোরো।'

সরমা জনকনন্দিনী এবং রামের প্রেয়সী সীতার অবর্ণনীয় মুখশোভায় মুগ্ধ হয়ে

বস্ত্রের অঞ্চলে অশ্রু মুছলেন। সরমার মনে হলো সীতার আননে এক রহস্যময় অভিব্যক্তি—তার অর্থ যেমন দুজ্ঞেয়, তার রূপ তেমনই অপার্থিব।

*　　*　　*　　*

রাবণের অন্যতম পুত্র অতিকায় রণক্ষেত্রে পদার্পণ করে বানরসৈন্য নিধনে হিংস্র বীরত্ব প্রদর্শন করলেন।

রামের হৃদয়ে বিস্ময় উৎপাদন করে পর্বতসদৃশ এই যোদ্ধা রথে উপবিষ্ট হয়ে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হলেন।

বিভীষণ রামের প্রশ্নের উত্তরে অতিকায়ের পরিচয় প্রদান করে বললেন, 'এই ভীষণ-দর্শন রাজপুত্রের নাম অতিকায়। অতিকায় রাবণের অন্যতম পুত্র, এর মায়ের নাম ধন্যমালিনী। এই বীর সব অস্ত্র প্রয়োগে পারদর্শী, হস্তী ও অশ্ব চালনায় দক্ষ। ব্রহ্মার বরে অতিকায় সুরাসুরের অবধ্য। একে শীঘ্র বধ করার প্রয়োজন আছে। অন্যথায়, এর বিক্রমে অনেক বানরসৈন্য বিনষ্ট হবে।'

অতিকায় সদর্পে সকলকে যুদ্ধে আহ্বান জানিয়ে, নিজের রথ থেকে শর নিক্ষেপ করতে প্রবৃত্ত হলেন। অতিকায়ের দাম্ভিক উক্তিতে ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মণ বললেন, 'রে দুষ্ট রাক্ষস, তুই আমাকে বালক বলে অবজ্ঞা করছিস? তোর স্পর্ধা তো কম নয়! রে মূর্খ, তোর শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

লক্ষ্মণের নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণ অতিকায়ের অভেদ্য বর্মে প্রতিহত হলো। শেষে লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে এই বিশালদেহী রাবণপুত্রের কিরীটশোভিত মস্তকটি ছেদন করলেন।

অতিকায়ের অতি দ্রুত জীবনাবসানে রাবণের কঠিন হৃদয়েও প্রচণ্ড আঘাত অনুভূত হয়েছে। রাবণ দুঃখে অভিভূত হয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হন।

ইতিমধ্যে রাবণের সুযোগ্য পুত্র শূরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ পিতার সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেন। ইন্দ্রজিৎ গভীর আত্মপ্রত্যয়ে প্রজ্বলিত হয়ে রাবণকে বললেন, 'পিতা, আপনি শোকগ্রস্ত হবেন না। আপনার এখন যুদ্ধে যাত্রা করার প্রয়োজন নেই। আমি পুরুষকারের পূজারী এবং দৈব আমার সহায়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আজই রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করে আপনাকে যুদ্ধে জয়ী করবো।'

কুম্ভকর্ণের অভাবে ইন্দ্রজিৎই এখন রাক্ষসরাজ রাবণের একমাত্র ও শেষ অবলম্বন। এখন অল্প কয়েকজন রথী ও মহারথী অবশিষ্ট আছেন। রাবণ নির্ভর করতে পারেন শুধুমাত্র ইন্দ্রজিতেরই শৌর্য ও বীর্যের উপর। কিন্তু যুদ্ধের গতি ইতিমধ্যেই রাক্ষসদের প্রতিকূলে। যুদ্ধজয়ের বাসনা থাকলেও যুদ্ধজয়ের আশা অতি অল্প, এ'কথা রাবণের অবচেতন মন থেকে সচেতন মনে সঞ্চারিত হয়েছে। ইন্দ্রজিৎ এখনও নবীন যুবক মাত্র, কিন্তু ইন্দ্রজিতের অদৃশ্য যুদ্ধ-কৌশল প্রতিরোধহীন এবং ইন্দ্রজিতের বৈচিত্র্যময় শরপ্রয়োগ প্রায় অব্যর্থ। সুতরাং দেখাই যাক্ না।

ইন্দ্রজিতের শিরে হাত দিয়ে রাবণ আশীর্বাদ করেন। মুখে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার দীপ্তি।

গম্ভীর কণ্ঠে রাবণ বললেন, 'বৎস ইন্দ্রজিৎ, তুমি যুদ্ধে বিজয়ী হও। জানি না, কোন দৈবের প্রভাবে আমার রথী মহারথী ও সৈন্যেরা এমন বিপুলভাবে বিনষ্ট হয়েছে। আমাদের শত্রুরা আকৃতিতে সামান্যই। তোমার খুল্লতাত বিভীষণ এবং তার চার অনুচরকে নিয়ে মানুষের আকৃতিতে তারা সাতজন, আর সবই বানর। অবশ্য

বানরদের মধ্যে হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্ববান, নীল, নল প্রভৃতি বিশেষভাবে শক্তিসম্পন্ন। ওদের পক্ষের একজন নায়কও এ পর্যন্ত নিহত হয় নি। পুত্র, তুমিই রাক্ষসদের শেষ আশা। তুমি এখনই রাম ও লক্ষ্মণকে যেমনভাবে পার, বধ করার চেষ্টা করো।'

ইন্দ্রজিৎ রাবণের যোগ্য পুত্র, রাণী মন্দোদরীর একমাত্র সন্তান। ইন্দ্রজিৎ ব্রাহ্মমন্ত্র-বিশারদ। রথে আরোহণ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে ইন্দ্রজিৎ তাঁর চার দিকে রাক্ষস-সৈন্য সন্নিবিষ্ট করলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করে হোম করলেন এবং তাঁর ধনুক, রথ, অস্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রাসিদ্ধ করলেন।

ইতিমধ্যে রাক্ষসসেনা বানরদের আক্রমণ করেছে। ইন্দ্রজিৎ নিজেও নালীচ, নারাচ, গদা ও মুষল নিয়ে বানরসৈন্য বধ করতে প্রবৃত্ত হলেন। বানরেরা যথারীতি শিলা বৃক্ষ প্রভৃতির সাহায্যে ইন্দ্রজিতকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হয়ে ব্যর্থ হলেন। হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্ববান, সুষেণ প্রভৃতি বাণবিদ্ধ হয়ে যুদ্ধে অক্ষম হলেন। ইন্দ্রজিতের লক্ষ্য এখন রাম ও লক্ষ্মণ। ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে অদ্বিতীয়।

রাম বুঝতে পারলেন যে ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য হয়ে যে শরপ্রহার করছেন, তার থেকে বানরসৈন্যকে রক্ষা করা অসম্ভব। রামও তাঁর স্বাভাবিক বিচক্ষণতায় আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করতে দৃঢ়সংকল্প হলেন।

রাম, লক্ষ্মণকে অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করে এই ভীমকায় রাবণনন্দন অপ্রতিরোধ্য ও অবধ্য। এখন আমাদের এর শরপ্রয়োগ সহ্য করতেই হবে। এসো, আমরা বরং সকলে মৃতের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করে থাকি। তাহলে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে মনে করে রণস্থল ত্যাগ করবে।'

ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে মন্ত্রজালে অভিভূত করে লংকাপুরীতে পিতাকে বিজয় সংবাদ প্রদান করলেন। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ কি কখনও কল্পনা করেছিলেন যে এই জয় খুবই অল্পক্ষণ স্থায়ী হবে? রাবণও হয়তো করেন নি। তার কারণ, ইন্দ্রজিতের মায়া-যুদ্ধের দুর্ধর্ষতা রাবণের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। এবং হনুমানের অদ্ভুত কার্যক্ষমতা ও অপ্রমেয় দৈহিক শক্তি সম্বন্ধে রাবণের জ্ঞান থাকলেও, হনুমানের সম্পূর্ণ দেবী শক্তি সম্বন্ধে রাবণের সম্যক ধারণা ছিল না। রাম ও লক্ষ্মণ অচিরেই হনুমান আনীত ভেষজ ঔষধির গন্ধে শল্যমুক্ত হলেন। শরাহত সমগ্র বানরসৈন্যই এই অলৌকিক ঔষধির প্রভাবে সঞ্জীবিত হলো।

বানরসৈন্যের আনন্দধ্বনিতে যেন রাক্ষসরাজ রাবণের হৃদয়ে শেলবিদ্ধ হয়। নিশা-শেষে রাবণ উদ্যান-মন্দিরে উপস্থিত হয়ে প্রথমে মহেশ্বরের পূজা সমাপন করে মহাশক্তির আরাধনায় মগ্ন হন। কিন্তু হায়, আজ রাক্ষসরাজ দেবীর ধ্যানে মনঃসংযোগ করতে কৃতকার্য হন না। রাবণের মনে ঘোর সংশয়ের উদয় হয়। তবে কি শক্তি-স্বরূপিনী মহাকালী রাবণের মনস্কামনা পূর্ণ করবেন না। সঙ্গে সঙ্গে সেই একবার মাত্র দেখা নবদূর্বাদলশ্যাম অপরূপ রামের কমনীয় মুখচ্ছবি রাবণের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। ধ্যানমগ্ন রাবণের হৃদয়ে ইষ্ট দেবতার রূপচিন্তন বিঘ্নিত। রাবণের বিভ্রান্ত আঁখি দুটি উন্মিলীত হয়। পুনরায় সেই মুখ! বার বার মৃত্যুমুখে পতিত হয়েও যে বৈরী বার বার পুনর্জীবিত হয়, সে বৈরী নিশ্চয়ই সামন্য নয়!

* * * *

বিভীষণ যুদ্ধের গতিতে উৎফুল্ল, যদিও রাম ও লক্ষ্মণের সাময়িক পরাজয় ও

মৃতকল্পতা তাঁর মনে গভীর দুঃখের সৃষ্টি করে। বিভীষণ নিরাশ হন না। রাক্ষস রাবণের শেষ বিচারের দিন আর বেশী দূরে নয়, বিষ্ণুভক্ত ও রামের অনুগামী বিভীষণের এই স্থির বিশ্বাস।

বিভীষণ শিবিরের মধ্যে উপবিষ্ট রামকে বলেন, 'অযোধ্যাপতি, তোমার অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের আর অধিক বিলম্ব নেই। শুধু ইন্দ্রজিতকে নিধন করতে পারলেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তবে সত্য কথা বলতে কি, ইন্দ্রজিতকে বধ করা সত্যই দুরূহ কাজ। যা হোক, সে কথা যথা সময়ে ভাবা যাবে। আপাততঃ আমাদের যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করতে হবে।'

বিভীষণ অন্যকিছু বলার আগেই সুগ্রীব হনুমানের উদ্দেশে বললেন, 'রাবণের পক্ষে অসংখ্য সৈন্য এবং অনেক রথী ও মহারথী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এই আমাদের সুযোগ। আমাদের পরীক্ষা করা উচিত যে কেমনভাবে এখন রাক্ষসরাজ পুরী রক্ষা করে।'

সূর্যাস্তের পরে বানরসেনা লংকাপুরী পরিবেষ্টন করে প্রাসাদগুলিতে অগ্নি সংযোগ করলেন। দগ্ধপ্রায় রাক্ষসগণ স্ত্রী, পুত্র, পরিবার নিয়ে ব্যাকুলভাবে পলায়ন করতে প্রবৃত্ত হলেন। যাঁরা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে তোরণদ্বারগুলি অতিক্রম করে প্রাসাদ ত্যাগ করতে উন্মুখ হলেন, তাঁরা বানরসেনার নৃশংস আক্রমণে নিহত হলেন। বানরেরা মশাল হাতে নিয়ে, তোরণদ্বারগুলির বহির্ভাগে অপেক্ষমান।

রাবণ এই আকস্মিক বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু রাক্ষসরাজের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে এই নূতন বিপদের আশংকা ধ্বনিত হয়েছিল। বিশ্বাসহন্তা বিভীষণ শত্রুপক্ষকে লংকাপুরীর পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে! রাক্ষসদের অধিকাংশ বীর সেনাপতি নিহত হয়েছে। এখন তোরণদ্বারগলি রক্ষার ব্যবস্থা করাই রাক্ষসরাজের পক্ষে এক সমস্যা।

এই শোচনীয় অবস্থায় রাবণ আর কাল বিলম্ব না করে কুম্ভকর্ণের দুই শক্তিমান পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভকে যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। তাঁদের সহকারীরূপে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন যূপাক্ষ, শোনিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ, কম্পন ও অগণিত সশস্ত্র রাক্ষসসৈন্য। কিন্তু লংকাপুরী আজ দুর্ভাগ্যের কবলিত। রাবণের ভাগ্যাকাশে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ, যার অস্তিত্ব রাবণ নিজের মানসচক্ষে উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ করেন।

অঙ্গদের হাতে প্রাণ দান করলেন কম্পন। অঙ্গদের মুষ্টির প্রহারে প্রজঙ্ঘের প্রাণ নিঃশেষিত হলো। অঙ্গদের দুই মাতুল দ্বিবিধ ও মৈন্দ যথাক্রমে শোণিতাক্ষ ও যূপাক্ষকে বধ করলেন।

কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ বিক্রম প্রকাশ কোরে অঙ্গদকে পরাজিত করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুগ্রীব বজ্রতুল্য মুষ্টিপ্রহারের দ্বারা কুম্ভকে নিহত করলেন। হনুমান কুম্ভকর্ণের অপর পুত্র নিকুম্ভকে নিষ্পেষিত করে তার মুণ্ড উৎপাটন করলেন।

* * * *

কুম্ভ ও নিকুম্ভের পতনে সমগ্র লংকাপুরী বানরদের হিংস্র আক্রমণের ভয়ে কম্পিত। আর বোধহয় শত্রুর কনকলংকায় প্রবেশ রোধ করা গেল না! রাবণ নিরুপায় হয়ে খরের পুত্র মকরাক্ষকে শত্রু নিপাত করতে আদেশ দিলেন।

পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে মকরাক্ষ রামকেই যুদ্ধে আহ্বান করলেন। রামের মুখে স্মিত হাসি।

রাম স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'জনস্থানে তোমার পিতাসহ চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে আমি একাই বধ করেছি। তার সঙ্গে দূষণ ও ত্রিশিরাও নিহত হয়েছিল। সুতরাং তুমি যখন আমার হাতেই মরতে চাইছ, তাইই হবে।'

নবীন যোদ্ধা মকরাক্ষ যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়েও রামের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারলেন না। রাম অনায়াসেই মকরাক্ষের অশ্ব, রথ ধনুক প্রভৃতি খণ্ডিত করে পাবকাস্ত্রের দ্বারা তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। রাবণের পক্ষে বাকী শুধু ইন্দ্রজিৎ ও তরণীসেন।

* * * *

বিভীষণের লংকা ত্যাগের পরে, তরণীসেন শুধুমাত্র জননী সরমার নিকট তাঁর হৃদয়ের দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের ভাবটি প্রকাশ করেছিলেন। পিতা বিভীষণ কোনদিনও তরণীসেনের নিকট অথবা তরণীসেনের সম্মুখে এই রকম অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নি। হয়তো বা জননীর নিকট পিতা কিছু বলে থাকবেন।

লংকাপুরীতে পিতার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ তরণীসেনের কর্ণগোচর হয়েছে। শ্রদ্ধেয় জনকের সম্বন্ধে এই হীন চিন্তা কখনও কখনও তরণীসেনের মনকে পীড়িত করেছে। কিন্তু তাঁর পিতা যে নৈতিকভাবে কোন গর্হিত অথবা আত্মস্বার্থ-সর্বস্ব কাজ করতে পারেন, এ তরণীসেনের ধারণার অতীত। তরণীসেন বিশ্বাস করতে পারেন না যে পিতা কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছেন।

আশ্চর্য, জ্যেষ্ঠতাতও তরণীর সম্মুখে কোনদিনও লংকা থেকে চলে যাওয়ার জন্য বিভীষণের নিন্দায় অথবা সমালোচনায় মুখর হন নি! জননী সরমা, এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে, নীরবে ক্রন্দন করেছেন, ক্ষীণকণ্ঠে বলেছেন—পুত্র, নিজের পিতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখো।

জননীর কণ্ঠে এ'কথা শুনার পরে তরণী আশ্বস্ত হয়েছেন। কিন্তু সময়ে সময়ে পিতার এই আকস্মিক ও অভাবনীয় আচরণের জন্য নিজের মনেই দুঃখিত হয়েছেন, বিস্মিত হয়েছেন। পরে বিমূঢ়ভাবে চিন্তা করেছেন, পিতা সত্য সত্যই কেন গেলেন!

জ্যেষ্ঠতাত এবং পিতার মধ্যে যে এক আদর্শগত ও নীতিগত সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল, এই কথা তরুণ তরণীসেনের অজানা ছিল না।

পিতা মধ্যে মধ্যে তরণীসেনকে যেভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন, যেভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, ইষ্টের প্রতি ভক্তিতে দীক্ষিত করেছিলেন, তাতে তরণীসেনের মনে কোন সংশয়ই ছিল না যে পিতা ক্রমশঃ আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির সমর্থক হয়েছেন। পিতা বিভীষণ যে লংকায় ভাগবত ধর্মের স্রোত প্রবাহিত করতে আগ্রহী ছিলেন, তাঁর এই অভিপ্রায়ও তরণীসেনের নিকট ছিল স্বচ্ছ।

তবে এই মহৎ উদ্দেশ্যেই পিতা রামের পক্ষ অবলম্বন কোরে জ্যেষ্ঠতাতের সঙ্গে মত-পার্থক্যের সমাধান করবেন! বিভীষণ ও তরণীসেন, দুজনেই বিষ্ণুভক্ত, রামের অনুরাগী। কিন্তু এটা তাঁর পিতার পক্ষে দেশদ্রোহিতা ও স্বজনবিদ্বেষের পরিচায়ক হবে না কি? আর, জ্যেষ্ঠতাত রাবণ আসন্ন সংগ্রামে পরাজিত না হলেও তো পিতার এই উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হবে না।

লংকায় অনেকেই বিভীষণের লংকা ত্যাগকে তাঁর সিংহাসনের প্রতি লোভের সঙ্গে জড়িত করেছে। তবে কি এর মধ্যে কোন সত্যতা আছে! কিন্তু পিতার উদ্দেশ্য যে

মহৎ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদিও এর জন্য লংকাকে অনেক উচ্চ মূল্য দিতে হতে পারে। লংকাকে লংকা রেখেই কি সব কিছু করা যেতো না ?

ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতি কিশোর তরণীসেনকেও বিশেষভাবেই বিচলিত করে। জ্যেষ্ঠতাত রাবণ তরণীসেনকে সকল সময়েই বাহুবল বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় তরণীসেন অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছেন। লংকার এই দুঃসময়ে তরণীসেন স্বদেশ রক্ষায় যুদ্ধ করবেন না! নিশ্চয়ই করেবেন। তবে তো তাঁকে পিতার বিপক্ষেই যুদ্ধ করতে হবে!

তরণীসেন এই প্রথম নিজের মনের মধ্যে পিতার আচরণের প্রতি বিদ্রোহের অস্তিত্ব অনুভব করলেন। কিন্তু তাহলেও তরণীসেন নিশ্চিত যে এটা প্রকৃত বিদ্রোহ বা বিরূপতা নয়, ঘোর সংশয় মাত্র। পিতা কি পরিস্থিতি অনুযায়ী ন্যায্য কাজই করেছেন, না, পিতার আচরণকে অন্য কোন আলোকে ভাববার অবকাশ আছে ?

হৃদয়ের আবেগকে দমন করতে অক্ষম হয়ে, তরণীসেন জননী সরমার নিকট গেলেন। সরমা তখন অশোকবন থেকে নিজের আবাসে ফিরে এসেছেন। তরণী লক্ষ্য করলেন যে সরমা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। এর আগেই তরণীসেন জননীর নিকট দেশের পক্ষে যুদ্ধ করার আকাংক্ষা প্রকাশ করেছেন।

তরণীসেন মাতার পালংকের নিকট ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে, সরমার পাশে এসে বসলেন। সরমা অন্যমনস্কভাবে এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কোরে চক্ষু দুটি নিমীলিত করলেন। সরমার দুটি নয়ন থেকে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়লো।

তরণীর হৃদয়ের আবেগ জননীর অশ্রুপাতে নিদারুণভাবে উদ্বেলিত হলো। তরণী দুহাতে জননীর কণ্ঠ ধারণ কোরে কোমল কণ্ঠে বললেন, 'মাতা, আমি যে এসেছি আপনি কি জানতে পারেন নি ? আপনি নিশ্চয়ই পিতার অনুপস্থিতে আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করছেন। তাই নয় ?'

পুত্রের বাক্যে সম্বিত লাভ কোরে সরমা পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন। সরমার দুটি আঁখি অশ্রুতে পরিপূর্ণ।

পুত্রস্নেহে বিগলিত হয়ে সরমা বললেন, 'তরণী, মনে বড়ই আশংকা জাগছে আমার। পুত্র, যুদ্ধের গতি আদৌ লংকেশ্বরের অনুকূলে নয়। আমার মনে হচ্ছে আমরা ক্রমশঃ এক বিরাট বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলেছি।'

'হ্যাঁ মা, সন্দেহ নেই যে লংকার আজ বড়ই দুর্দিন। জ্যেষ্ঠতাত ইতিমধ্যে আমাকে স্মরণ করেছেন। জানি না কি বলবেন, হয়তো যুদ্ধে যেতে আদেশ দেবেন। আমি স্বদেশের এই দুর্দিনে স্বজনদের পাশে দাঁড়িয়ে দেশের মান সম্ভ্রম রক্ষা করতে চাই। আমি পিতার মতো স্বদেশ ও স্বজন পরিত্যাগ করতে পারবো না। মা, পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হলেও, আমি তা পারবো না।'

পুত্রের হৃদয়ের দ্বন্দ্বের ছবিটি তার এই একটি উক্তির মধ্যেই সরমার নিকট পরিস্কার হয়। পতি বিভীষণকে সমর্থনের উদ্দেশ্যে এবং তরণীসেনের মনে পিতার অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোন সংশয় না রাখতে সরমা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'পুত্র তরণী, আমি কি তোমাকে একাধিকবার তোমার পিতার রাক্ষসপক্ষ পরিত্যাগের কারণ সম্বন্ধে বলি নি ? তুমি বুদ্ধিমান, ধার্মিক, নীতিজ্ঞানসম্পন্ন। তুমি কি বুঝতে পারো নি, বৎস, যে দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্যই তোমার পিতাকে এই বিপজ্জনক পন্থাটি অবলম্বন করতে হয়েছে! বিপজ্জনক বলছি এই কারণে যে আপাতঃদৃষ্টিতে দেশের সাধারণ

লোক তাঁকে দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থপর বলে মনে করতে পারে। কিন্তু তরণী, তুমি তো ভালো করেই জানো যে তোমার পিতার আত্মস্ফীতির অথবা অর্থ, প্রভাব, প্রতিপত্তির প্রতি কোন আকর্ষণই নেই। তিনি একজন বিষ্ণু-উপাসক, সমাজ-সেবক ও দেশভক্ত।'

জননীর বাক্যে আশ্বস্ত হয়ে তরণীসেন চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, 'মা, আমি সবই বুঝি। পিতা যে বার বার জ্যেষ্ঠতাতকে আর্যশ্রেষ্ঠ রামের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাও জানি। কিন্তু, তাহলেও, দেশের মাটি ত্যাগ না করে, পিতা লংকায় নিরপেক্ষভাবে থাকতে পারতেন। রাম নিজের শক্তিতেই লংকা জয় করতেন। পিতার ললাটে বিশ্বাসহন্তার অপবাদটি যুক্ত হতো না!'

পুত্রের মনের দুঃখ ও ক্ষোভের কারণটি অনুমান করে পুত্রের মাথায় হাত দিয়ে গভীর স্নেহের সঙ্গে সরমা বললেন, 'বৎস তরণীসেন, তুমি তোমার পিতাকে ভালো-ভাবেই জানো। তাঁর মনের গতি, প্রকৃতি, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কিছুই তোমার অজানা নেই। তিনি রাক্ষসরাজের অধীনেই রাক্ষসদের রীতি, নীতি এবং চরিত্র সুসংস্কৃত ও সংশোধিত করতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় কোন ত্রুটিই ছিল না। কিন্তু তামসিক প্রবৃত্তিতে অনুপ্রাণিত রাক্ষস নেতৃবৃন্দ রক্ষপতিকে কাম ও হিংসার পথেই উৎসাহিত করলো। তোমার পিতা শত চেষ্টাতেও রাক্ষসরাজকে ন্যায় ও অন্যায় এবং পাপ ওপুণ্যের পার্থক্যটি বোঝাতে পারলেন না। রাক্ষসেরা তাদের দম্ভ, নিষ্ঠুরতা এবং কাম-প্রবৃত্তিকে কিছুতেই বর্জন করলো না। নিজেদের চরম ও পরম হিতের সম্ভাবনার আলোকময় শিখা তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন মনকে উদ্দীপিত করতে সক্ষম হলো না। তোমার পিতা রাক্ষসরাজ কর্তৃক অপমানিত, লাঞ্ছিত ও শেষ পর্যন্ত নির্বাসিত হয়ে, গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে লংকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর পরে লংকার রাক্ষসত্ব মোচনের জন্য, লংকাবাসীর মুক্তির জন্য, দেশের মধ্যে দীর্ঘ অনাচার-জনিত পুঞ্জীভূত পাপকে চিরকালের জন্য দূরীভূত করার জন্য, তোমার পিতার পক্ষে ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ, মহৎহৃদয় এবং সকল গুণের অধিকারী রামের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। তোমার পিতা লংকায় থাকলে হয়তো তাঁকে রাক্ষসরাজের দুর্বিনীত অনুচরদের হাতে নিগৃহীত হতে হতো। তিনি লংকারও কোন উপকার করতে পারতেন না, রাক্ষসরাজেরও না। পুত্র, তোমার পিতার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল লংকা এবং লংকাবাসীর কল্যাণ। তিনি কোন দিনও সেই পথ থেকে বিচ্যুত হন নি।'

তরণীসেন জননীর যুক্তিপূর্ণ বচনে হৃদয়ে এক অপূর্ব আনন্দের ও অনুপ্রেরণার অস্তিত্ব অনুভব করলেন। স্নেহময় পিতার সৌম্য, শান্ত মূর্তিটি তার মনের পটে উদ্ভাসিত হলো। তরণীসেন মাতার কণ্ঠলগ্ন হয়ে জননীকে সান্ত্বনা প্রদান করলেন।

নয়নের অশ্রুস্রোত অতি কষ্টে দমন কোরে সরমা মধুর কণ্ঠে বললেন, 'পুত্র তরণী, যদি কেউ তোমার পিতার আচরণকে যথার্থভাবে বুঝে থাকে, তবে তিনি তোমার জ্যেষ্ঠ-তাত। সেই কারণেই আজ লংকায় তোমার পিতার অনুপস্থিতিতে রাক্ষসরাজই তোমার নেতা ও অভিভাবক। তিনি তোমাকে যা করতে নির্দেশ দেবেন, তাই তোমার পিতার আদেশ বলে মনে করবে। পুত্র, তোমার পিতা তোমার জ্যেষ্ঠতাতকে যে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখেন, লংকায় আর কোন ব্যক্তিই রক্ষপতিকে সেই শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখেন না। তোমার পিতার এই বিদ্রোহ লংকা এবং লংকেশ্বরের বিরুদ্ধে নয়, লংকার রাক্ষসনীতির বিরুদ্ধে। তাই তিনি বিশ্বাসহন্তা নন, দেশের

এবং দেশবাসীর পরম উপকারক। সুতরাং অন্য যে যাহ বলুক তোমার পিতার সম্বন্ধে, তুমি বিচলিত হয়ো না। তুমি তোমার বিবেক অনুযায়ী কর্তব্য পালন করে যাও। তাতে আমি এবং তোমার পিতা দুজনেই সুখী হবো।'

মাতাকে প্রণাম কোরে তরণীসেন প্রসন্ন বদনে প্রস্থান করলেন।

* * * *

যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনে রাক্ষসরাজ তরণীসেনকে আপন কক্ষে আহ্বান করে যুদ্ধের শোচনীয় অবস্থা জানালেন। হয়তো তরণীসেনের পিতার মতো তরণীসেনও এই পরিণাম সম্বন্ধে আগে থেকেই অবহিত ছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠতাতের প্রতি শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে, এই আশংকা কারোর নিকটই প্রকাশ করেন নি। বিভীষণের রাক্ষসপক্ষ পরিত্যাগের পরে, তরণীসেন শুধুমাত্র জননী সরমার নিকট তাঁর হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন। লংকাপুরীতে পিতা বিভীষণের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকার অভিযোগ সময়ে সময়ে তরণীসেনের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটালেও, এই তরুণ দেশপ্রেমিক কখনও সর্বজন-সমক্ষে পিতার কাজের সমর্থন করেন নি।

বালক তরণীসেনকে যে যুদ্ধের আদেশ দিতে হবে, রাক্ষসরাজ স্বপ্নেও ভাবেন নি। কিন্তু অস্ত্রশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তরণীসনকে যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করার কোন ত্রুটি রাবণের ছিল না। তরণীসেনও রাবণের বাধ্য ও অনুগত পুত্রের মতোই রাক্ষসদের এই জাতীয় সংগ্রামে অংশ গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

রাবণ লক্ষ্য করলেন তরণীসেন নত শিরে তাঁর সম্মুখে অপেক্ষা করছেন। কিশোর তরণীকে এখন যুবক বলেই ভ্রম হয়। তরণীর নিষ্পাপ মুখের পবিত্র ভাব ও শান্ত চক্ষু দুটির সরল দৃষ্টি সকলের হৃদয়কেই স্পর্শ করে।

তরণীসেন রাবণকে প্রণাম করে স্থির চিত্তে বললেন, 'আমাকে ডেকেছেন, জ্যেষ্ঠতাত।' রাবণ মনে মনে সঙ্কুচিত বোধ করেন। কেমন করে নিতান্ত এই বালককে রামের সিংহ বিক্রমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ করবেন!

রাক্ষসরাজের দ্বিধাগ্রস্ত হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে এক স্বস্তির নিঃশ্বাস মুক্ত হলো যখন তরণীসেন জ্যেষ্ঠতাতের ম্রিয়মাণ আঁখি দুটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'মহারাজ, আমাকে আর কবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে আদেশ করবেন? লংকাপুরী যে ইতিমধ্যেই বীরশূন্য হয়ে গেছে! বানরসেনা শীঘ্রই পুরীর মধ্যে জোর করে প্রবেশ করবে। জ্যেষ্ঠতাত, যদি আপনার অপরিণতবুদ্ধি ও হীনবল ভ্রাতুষ্পুত্রকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করতে কোন সংকোচ হয়, তবে লংকার এক সাধারণ সৈনিক এবং নাগরিককে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য সংগ্রামে যোগ দিতে আদেশ দিন। আজ দেশের এই ঘোর দুর্দিনে, শত্রু যখন প্রতি মুহূর্তে আমাদের বাসভূমির মর্মস্থলে পৌছানোর চেষ্টা করছে, স্বর্ণলংকাকে আগুনে দগ্ধ করে রাক্ষসদের নির্মমভাবে গৃহহীন করছে, যখন লংকার নিরাপত্তা ও রক্ষণপ্রচেষ্টা ভীষণভাবে বিঘ্নিত, তখন আমি, আপনার পুত্রতুল্য ভ্রাতুষ্পুত্র, দেশভক্ত বিভীষণের পুত্র কি যুদ্ধে না গিয়ে পারি? রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, স্বদেশের প্রতি, স্বজনের প্রতি, রাজার প্রতি আমার যে ঋণ, তা আমাকে পরিশোধ করার সুযোগ দিন? জ্যেষ্ঠতাত, যদি রামের হাতে আমার মৃত্যু হয়, তা আমি আমার পুণ্যফল বলেই জানবো।'

তরণীসেনের শেষ কথাটি রাবণের শ্রবণে প্রবেশ করে এক করুণ সুরের মূর্ছনায় রাক্ষসরাজের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করে। মুগ্ধ বিস্ময়ে রাক্ষসরাজ বিভীষণ-তনয়ের

মুখের স্বর্গীয় শোভাটি নিরীক্ষণ করেন। তরণীসেনের উন্নত ও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের পরিচয় লাভ করে রাক্ষসরাজ গভীরভাবে বিচলিত বোধ করেন।

রাবণ নিজের ভাবাবেগকে সংহত করতে অক্ষম হয়ে রত্নখচিত পালংক ত্যাগ কোরে তরণীসেনকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। তরণীসেন লক্ষ্য করেন, লংকেশ্বরের আঁখি দুটি শুষ্ক নয়। তরণীসেন জ্যেষ্ঠতাতের এই স্নেহের অভিব্যক্তিতে মুগ্ধ হন।

বিহ্বল চিত্তে রাবণ বললেন, 'পুত্র তরণী, ধন্য তোমার পিতা, ধন্য তোমার মাতা, যাঁরা এমন বীরপুত্রের জন্ম দিয়েছেন! ধন্য আমাদের লংকা, যে এমন স্বার্থহীন দেশভক্তের পবিত্র শোণিতাঞ্জলি লাভ করতে পারবে! ধন্য আমি লংকাধিপতি যে অন্ততঃ একজন লংকাবাসীর প্রাণে লালসাশূন্য স্বদেশপ্রেম এবং ইষ্টের নিকট ভক্তিপূর্ণ আত্মসমর্পনের প্রেরণা জাগাতে পেরেছি।'

নীরবে জ্যেষ্ঠতাতের বিরাট হৃদয়ের অন্তহীন স্নেহের স্পর্শকে মনে মনে অনুভব করে, বিনম্রভাবে তরণীসেন বললেন, 'তবে অনুমতি দিন মহারাজ, আমি এখনই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাই। আমি তাদের কিছুক্ষণের জন্যও নিযুক্ত রাখলে, জ্যেষ্ঠ মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞের প্রস্তুতির সময় লাভ করবেন।'

তরণীসেনের দায়িত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে গভীরভাবে বিচলিত বোধ করে রাবণ বলেন, 'পুত্র তরণী, তুমি তোমার স্নেহময়ী জননীর অনুমতি নিয়ে এসেছ তো?'

—'জ্যেষ্ঠতাত, আপনি আমাকে এই সময়ে ডেকেছেন শুনেই আমার হৃদয় উল্লাসে নৃত্য করে উঠেছিল। আমি আপানার মনের কথা বুঝতে পেরে, আপনার নিকটে আসার আগেই জননীকে আমার যুদ্ধ করার বাসনা জানাই। মাতা সরমা সজল চক্ষে আমাকে বললেন, 'তরণীসেন আজ তোমার পিতা লংকাপুরীতে উপস্থিত থাকলে তোমাকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধে যাত্রা করার অনুমতি দিতেন। সুতরাং এখন তোমার পিতার অনুপস্থিতিতে তোমার জ্যেষ্ঠতাতের আদেশই তোমার পিতার অনুমতি-স্বরূপ।' জ্যেষ্ঠতাত, তাই তো আমি আপনার অনুমতি ভিক্ষা করেছি। এবার আপনি আদেশ করুন।'

রাবণের রাক্ষসসত্তা এই প্রথম এক বালকের নিকট পরাজয় স্বীকার করলো। রাবণ আর রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীবকে যুদ্ধে বধ করে এসো, এই কথা না বলে, প্রণামরত তরণীসেনকে আশীর্বাদ করে রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'বৎস তরণী, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

তরণীসেন যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি লাভ করে পুলকিত চিত্তে রাবণের কক্ষ ত্যাগ করলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দূর থেকে রাম, লক্ষ্মণ লক্ষ্য করলেন যে রাক্ষসরাজ রাবণের নবতম সেনাপতি এক নবীন কিশোর। এক অপরূপ বেশে সজ্জিত হয়ে সে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করেছে। এই সেনাপতির রথের এক পাশে পীতবর্ণ বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান। রাবণের রক্তবর্ণ পতাকার পাশে সেই অভিনব ও বর্ণাঢ্য কেতন নিজস্ব মৌলিকতায় যেন রাক্ষস সেনাপতির হৃদয়ের মধ্যে এক দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে।

তবে এই তরুণ যোদ্ধা রাক্ষসদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করছে মাত্র, নিজে রাক্ষস নয়! রাম ও লক্ষ্মণ দু'জনের মনেই গভীর বিস্ময়, তীব্র কৌতুহল। নিজের আত্মজকে রাক্ষস-সেনার সেনাপতির পদ বৃত করতে দেখে, বিভীষণের হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল। কিন্তু পর মুহূর্তেই তিনি অবসাদগ্রস্ত ও ভগ্নমনোরথ।

কেন এই আকস্মিক ভাবের পরিবর্তন—দূরদর্শী, স্থিতপ্রজ্ঞ বিভীষণের হৃদয়ে। বিভীষণ কি চিন্তা করেছিলেন যে রাবণ বিশ্বাসহন্তা বিভীষণের পুত্রকে এই সংকটময় মুহূর্তেও রাক্ষসদের স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত করবেন না। বিভীষণ এখন উপলব্ধি করেন যে তাঁর ও পত্নী সরমার নয়নের মণি তরণীর বক্ষের রক্তে রণাঙ্গন অভিসিঞ্চিত না হলে, ইন্দ্রজিৎ ও রাবণ শেষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন না। বিভীষণের একমাত্র সন্তান, বীর ও রামভক্ত তরণীসেন, লংকার জন্য বলিপ্রদত্ত, ত্যাগের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তার অভিশপ্ত রাক্ষসজন্মের মুক্তির লগ্ন আসন্ন। বিভীষণের পিতৃহৃদয়ে যুগপৎ দুঃখ ও আনন্দের সন্নিবেশ।

রাম প্রশ্নের ভঙ্গীতে বিভীষণের ম্রিয়মাণ মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। রণক্ষেত্রে রাক্ষসদের হুংকার এবং জয়ধ্বনি বিভীষণের পিতৃহৃদয়ে সন্তানের জন্য গর্বের বোধটিকে জাগরিত করে। এক অবশ্যম্ভাবী বিষাদময় পরিণতির চিন্তার মধ্যেও বিভীষণ পুত্রের অপ্রত্যাশিত বীরত্বের প্রভাবে স্তম্ভিত হন।

স্তম্ভিত হন রামও, বানরসৈন্যের ক্ষণিক বিপর্যয়ের সংকেতে। তরণীসেনের রথের চূড়ায় পীত ধ্বজা, তরণীসেনের দেহে পীত বেশবাস ও মস্তকে পীত উষ্ণীষ। তরণীসেনের সারথীর ও অশ্বদুটির পীতাভ গাত্রাবরণ রামের হৃদয়ে এক চমকের সৃষ্টি করে। কামনার প্রতিমূর্তি রাবণের রাক্ষসনিবাসে এই পীতাম্বরধারী ব্যতিক্রমটি কে? তবে এই ব্যক্তিও বিভীষণের মতোই বিষ্ণুভক্ত নাকি ?

—'মিত্র বিভীষণ, রাবণের এই নবীন সেনাপতি, কে ? রাবণের সঙ্গে তার কিই বা সম্পর্ক ? এ'কি রাক্ষসকুলের কেউ নয় ?'

রামের এই প্রশ্নগুলি বিভীষণকে মুহূর্তের জন্য বিচলিত করে। মিথ্যা কথা বলা বিভীষণের স্বভাববিরুদ্ধ, তাও স্বয়ং রামের নিকট! সত্য কথা স্বীকার করলে মানবপ্রেমী, মহানুভব রাম তরণীসেনকে বধ করবেন না, হয়তো যুদ্ধজয়ের অভিলাষই পরিত্যাগ করবেন। তাতে কোন পক্ষেরই কোন উপকার হবে না। তরণীসেনের মুক্তি ঘটবে না, বিভীষণের রাজ্যপ্রাপ্তির আশা নির্মূল হবে। লংকার রাক্ষসত্ব ঘুচবে না।

মন স্থির করে নির্লিপ্তভাবে বিভীষণ বললেন, 'এই বালক সম্পর্কে রাবণের ভ্রাতুষ্পুত্র। এর প্রকৃতি শান্ত ও সংযত। আমি জানি এ বিষ্ণুর অনুরাগী, ধর্মভীরু ও সাত্ত্বিকভাবাপন্ন। কিন্তু এ অত্যন্ত বিক্রমশালী যোদ্ধা এবং রাবণের প্রিয়পাত্র। রাবণের জ্যেষ্ঠপুত্র ইন্দ্রজিৎই শুধু জীবিত আছে। এই তরুণ সেনাপতি রাবণের শেষ আশা। একে বধ না করলে যেমন বানরসেনার প্রভূত ক্ষতি হবে, তেমনই ইন্দ্রজিৎ ও রাবণকে চূড়ান্ত যুদ্ধে নামানো যাবে না। তোমার যুদ্ধজয়ের জন্য এই সেনাপতির নিপাত অত্যন্ত আবশ্যক।'

হায় বিভীষণ, নিজের পুত্রের প্রাণের বিনিময়েও তুমি রামের বিজয় কামনা করছো!

বিভীষণ রামকে যে উপদেশ প্রদান করলেন, তাতে তিনি রামের প্রকৃত সুহৃদের মতো বন্ধুকৃত্যই করলেন। তাই তো বিভীষণের নিজের মনেই আজ এই প্রশ্ন যে

বিভীষণ তো রাজ্যলোভী, পাষাণহৃদয়, স্বার্থসর্বস্ব নন। বিভীষণের হৃদয় কি এক-মাত্র সন্তানের আশু জীবননাশের আশংকায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছেন না ? লংকাপুরীতে দুঃখিনী সীতার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত পতিপ্রাণা সরমার কথা স্মরণ করে নিশ্চিত পুত্র-বিয়োগজনিত বেদনা কি বিভীষণ এখনই অনুভব করছেন না ?

বিভীষণ শেষ পর্যন্ত নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন এই ভেবে যে এ জগতে পাপী ও পুণ্যবান সকলকেই মূল্য প্রদান করতে হয়। বিশ্বনিয়ন্তার নির্দেশে সেই মূল্য অনেক সময়ে অতি উচ্চ ও দুঃখজনক।

তরণীসেনের শরপ্রয়োগের নৈপুণ্য, অব্যর্থ লক্ষ্য সন্ধান, অকাতর যুদ্ধোদ্যম, বানর-সৈন্যের মনে আতংকের সৃষ্টি করে। রাক্ষসসৈন্যের সংখ্যা ইতিমধ্যে অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও, নবীন সেনাপতির যুদ্ধ-পরিচালনার ও পরাক্রমের ফলে ভগ্নোৎসাহ রাক্ষসসৈন্য যেন রণোন্মাদনার তুঙ্গে আরোহণ করে।

বানর সেনানায়কেরা তরণীসেনকে আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বীর হনুমান এই কিশোর সেন্যাধক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য মনে মনে উৎসাহ বোধ করেন না। লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদ প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে, রাম লক্ষ্মণকেই তরণীসেনের সঙ্গে দ্বৈতযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে বলেন।

কিন্তু সেই মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্রে এক নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। রাক্ষসসেনার তীব্র চিৎকার এবং তীক্ষ্ন অস্ত্রক্ষেপণের মধ্যে তাদের নবীন সেনাপতি অকস্মাৎ রথ থেকে ভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে বানরসেন্যের অভিমুখে অগ্রসর হন। রাক্ষসসৈন্যেরা সেনাপতির অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম হয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। বানরসৈন্যও বিপক্ষীয় সেনানায়কের সৌম্য মূর্তিতে আকৃষ্ট হয়ে গভীরভাবে বিচলিত, স্তম্ভিত।

তরণীসেন দূর থেকে রামকে লক্ষ্য কোরে যুক্ত করে প্রণাম নিবেদন করেন। কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে রামের জ্যোতির্ময় অবয়বের প্রতি নির্নিমেষ নয়নে দৃষ্টিপাত করেন। যেন দুটি চক্ষুর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে রামের দেহের অপার্থিব অমিয়ধারাকে পান করেও তাঁর তৃপ্তি নেই। দৃষ্টির এই তৃষ্ণা যেন সম্মুখে উপস্থিত এই দেবপ্রতিম অপরূপ দেহধারীর মুখলাবণ্যকে আকণ্ঠ পান করেও মিটবে না।

তরণীসেন গভীর আবেগে পরিপ্লুত হয়ে নিজের শরীরের প্রত্যেক রোমকূপে এক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চের শিহরণ অনুভব করেন। অশ্রুর বন্যা এসে তরণীসেনের দুই আঁখিকে প্লাবিত করে। সজল নেত্রের অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ দৃষ্টিতে রামের অপূর্ব দেহচ্ছটা হঠাৎ ক্ষীণ হয়ে যেন পুনরায় লেলিহান সহস্র শিখার মধ্যে উজ্জ্বল হলো। রামের প্রশান্ত আননে অধরের সুমিষ্ট হাসি তরণীসেনকে গভীরভাবে মুগ্ধ ও অভিভূত করে। মুহূর্তের জন্য তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়।

তরণীর প্রাণের আবেগকে পিতৃহৃদয়ের অসীম দৌর্বল্যের ও অপত্যস্নেহের দ্বারা উপলব্ধি করে বিভীষণ রামের উদ্দেশে বললেন, 'হে রঘুকুলগৌরব, তুমি নিজেই এই শত্রুকে সকল শক্তি নিয়োগ করে নিধন করো। মনে হয়, এই বালক তোমার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার আকাঙ্ক্ষা করছে। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণের শক্তি ও তেজ সঞ্চিত থাক। তাঁকে লংকাপুরীর মধ্যে প্রবেশ করে ইন্দ্রজিতকে বধ করতে হবে।'

বিভীষণ এই কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই তরুণ সৈন্যাধ্যক্ষের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সকলের শ্রুতিগোচর হলো। সেই মনোমুগ্ধকর কণ্ঠের যেমন আবেদন তেমনই আকর্ষণ !

রামের কর্ণে প্রবিষ্ট হলো এক উদাত্ত আহ্বান, 'হে রঘুনন্দন রাম, তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে তুমিই গোলকবিহারী বিষ্ণু। আমি অজ্ঞান রাক্ষস, কিন্তু আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত, একান্তভাবে তোমার ভক্ত। কিন্তু তা হলেও, আমি তোমার শত্রু, ভীষণ শত্রু। রাক্ষসরাজ রাবণ তোমাকে নিধন করার জন্যই আমাকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তুমি নিজে আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমাকে একটি সুযোগ দান করো যাতে আমি রাজার আদেশ পালন করতে পারি, তোমাকে পরাজিত করার চেষ্টা করতে পারি। আমি বয়সে নবীন বলে আমাকে অবজ্ঞা কোরো না।'

তরণীসেনের প্রাঞ্জল আবেদনে রাম বিমোহিত। এই অল্পবয়স্ক অনভিজ্ঞ বালক তাঁর অনুরাগী ও ভক্ত, তাঁকে হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও সম্মানের উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছে! পুনরায় রাক্ষসরূপে তার কর্তব্য পালনের জন্য যুদ্ধে আহ্বান করছে, তাঁকে পরাজিত করার বাসনাও প্রকাশ করছে! কি অপূর্ব এই তরুণের আত্মপ্রত্যয়, তেজ ও স্বদেশ-প্রেম! এই শৌর্য্য ও বীর্য্যের আস্ফালনের মধ্যেই কি সুন্দরভাবে তার আত্মনিবেদনের ভাব প্রকাশিত হয়েছে!

রামের হৃদয়ে এক ক্ষুদ্র প্রশ্ন যেন এক বিপুল দ্বন্দ্বে রূপায়িত হতে সচেষ্ট হয়েছে। এই নবীন যোদ্ধা বিভীষণের পুত্র বিষ্ণুভক্ত তরণীসেন নয় তো!

লক্ষ্মণ তরণীসেনের বাক্যে বিমূঢ়, হনুমান স্তম্ভিত। সুগ্রীব, জাম্ববান, অঙ্গদ প্রভৃতি ভাববিহ্বল।

প্রভু রামের ভক্ত এই বালক সেনাপতি কি রাক্ষসরাজ রাবণের একটি মায়ার ছলনা?

বিভীষণ তরণীসেনের হৃদয়ের গভীর ব্যাকুলতায় পুত্রের জন্য তীব্র মর্মবেদনা অনুভব করেন। বিভীষণের হৃদয়ে পিতৃস্নেহ উদ্বেলিত হয়। বিভীষণ প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় এই পুত্রের পবিত্র মুখটি পলকহীন চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। পুত্রের সরল হৃদয়ের অকপট ভক্তি এবং কর্তব্যপরায়ণতা বিভীষণের মনে তীব্র বেদনার সঞ্চার করে। এমন পুত্রকে দেশের স্বার্থে, রামের স্বার্থে, বিসর্জন দিতে হবে!

তরণীসেনের যুদ্ধের প্রার্থনায় রাম মনের মধ্যে এক অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করেন। এই তরুণ সেনাপতি যদি বিভীষণের পুত্র হয়, তবুও সে দেহগতভাবে রাক্ষস রাবণের অনুচর। সুতরাং সে রামের শত্রু।

রাম ধনুর্বাণ গ্রহণ কোরো তরণীসেনের রথ ও অশ্বকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তরণীসেন যে এত বিচক্ষণ যোদ্ধা, এ'কথা তাঁর বিশ্বাসের অতীত ছিল। তরণীসেনের শরবৈচিত্র্যে নানারূপ অতিপ্রাকৃত দৃশ্যের অবতারণা হয়। অমিতবিক্রম রামও শত্রুর বাণগুলি যথাসম্ভব খণ্ডন করেন। রামের মনেই হয় না যে তরণীসেন এক বালক মাত্র।

তরণীসেন রামের শরপ্রহারে জর্জরিত। রথোপবিষ্ট বিভীষণতনয় রক্তাক্ত দেহে, নিরুত্তাপ হৃদয়ে প্রতি-আক্রমণের মধ্যে রামকে বাণের আঘাতে চঞ্চল করেছেন। বিভীষণ পুত্রের এই অভাবনীয় বীরত্বে ভীষণভাবে মুগ্ধ। বিভীষণ মনে মনেই রাবণকে অভিনন্দন জানান যে রাক্ষসরাজ তরণীসেনকে এমন অপরাজেয় বীরত্ব প্রদর্শন করার সুযোগ দিয়েছেন। ধন্য রাবণ, ধন্য লংকা, ধন্য তরণীসেন!

বিভীষণের হৃদয়ে এক জটিল দ্বন্দ্বের আবির্ভাব হয়। রামের অলৌকিক ও অপ্রমেয় বলবীর্যও এই বীর বালককে নিধন করতে সক্ষম হচ্ছে না। অথচ তা না হলেও নয়। তরণীসেন জীবিত থাকতে হয়তো লংকাপুরীতেই প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

রামের অভীষ্টসাধনে তরণীসেনের, সেই আদরের তরণী বিভীষণের একমাত্র পুত্র হলেও, মৃত্যু তরান্বিত করাই যুক্তিযুক্ত। হায়, এই কঠিন কর্তব্য পিতা হয়ে বিভীষণকেই পালন করতে হবে! কিন্তু তা না করলে রামের কেমন উপকারক তিনি।

বানর নায়কগণ ও বানরসৈন্য তরণীসেনের অপ্রতিরোধ্য বীরত্বে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে উপায়ের চিন্তা করেন। তরণীসেন জীবিত থাকলে অনুপ্রাণিত রাক্ষসসৈন্য দুর্ধর্ষ ও দুর্জয় হয়ে উঠবে।

রাম নিজেও এই বালক যোদ্ধাকে নিধন করতে অক্ষম হয়ে ঈষৎ উদ্বিগ্ন, যদিও রাম নিশ্চিত যে শেষ পর্যন্ত এই অক্লান্ত যোদ্ধা তরণীসেন তাঁর হাতেই নিহত হবে।

হৃদয়ের দ্বন্দ্বের ভাবটিকে গভীর ক্লেশের সঙ্গে অতিক্রম কোরে বিভীষণ আবেগময় কণ্ঠে রামকে বললেন, 'বন্ধুবর, তুমি আর বিলম্ব কোরো না। এই তরুণ বীরকে ব্রহ্মাস্ত্র ব্যতীত তুমি বধ করতে পারবে না। আমি তার তপস্যার প্রভাবের কথা জানি এবং তাই তোমাকে বলছি যে একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেই তুমি তার জীবনান্ত করতে পারো।'

বিভীষণ চর্মচক্ষে একমাত্র পুত্রের নিধন কেমনভাবে দেখবেন। রাম, বিভীষণের মুখের নির্দেশ পাওয়া মাত্র, এক তীক্ষ্ণ বাণ অভিমন্ত্রিত করে তরণীসেনের প্রতি নিক্ষেপ করেন। বিভীষণ আতংকে বিহ্বল হয়ে চক্ষু মুদ্রিত করেন। তাঁর দুনেত্র থেকে অশ্রুর স্রোত প্রবাহিত হয়।

তরণীসেনও রামকে লক্ষ্য করে শর প্রয়োগ করেন। কিন্তু রামের বাণ বিদ্যুৎ শিখার মতো ক্ষণিকের জন্য আকাশে উঠে অদূরে রণভূমিতে যুধ্যমান তরণীসেনের বক্ষ ভেদ করে। নিমেষের মধ্যে তরণীর কমনীয় মুখে এক দিব্য কান্তির প্রকাশ।

সম্মুখে রামের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কোরে আহত পক্ষীশাবকের মতো তরণীসেন ধরাশায়ী হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিস্ফারিত চক্ষু দুটি শান্তিতে মুদ্রিত হয়।

*   *   *   *

তরণীসেনের পতনে বানরসেনার উগ্র জয়ধ্বনি আকাশ ও বাতাসকে বিদীর্ণ করে। সমুদ্রোত্থিত প্রভঞ্জনের তীব্র বেগ রাক্ষসদের আর্তনাদকে লংকাপুরীর মধ্যে সঞ্চারিত করে। তরণীসেনের মৃত্যু বানরপ্রধানদের নিকট কাম্য হলেও, তাঁর শান্ত ও পবিত্র মুখচ্ছবি সাময়িকভাবে সকলের হৃদয়েই অংকিত হয়।

অংকিত হয় রামের উদার ও অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ের মধ্যেও। রাম ও লক্ষ্মণ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে বিভীষণ ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে আকুলভাবে রোদন করছেন। তবে কি তরণীসেন বিভীষণ যা বলেছিলেন, তাই নয়!

বিভীষণের মস্তকটি ক্রোড়ের উপর স্থাপন করে, গভীর সহৃদয়তার সঙ্গে রাম বললেন, 'মিত্রবর, তোমার এই শোকের বিশেষ কারণ কি?'

বিভীষণ রামের কণ্ঠস্বরে অনুকম্পার স্পর্শ অনুভব করে, রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'রঘুনাথ, আমার একমাত্র পুত্র তরণীসেন এখনই তোমার হাতে নিহত হলো। তাই আমার এই শোকের উচ্ছ্বাস।'

সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতা রামের হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে। বালকের মত উচ্চকণ্ঠে রোদন করে রাম বললেন, 'হায় বিভীষণ, কি ভীষণ পাপ আমি করেছি, তোমার পুত্রকে বধ করে! এ তুমি কি করলে বন্ধু? তোমার একমাত্র সন্তানের পরিচয় আমার কাছে গোপন করলে! তরণীসেন তোমার পুত্র জানলে, আমি কখনই

তার সঙ্গে যুদ্ধ করতাম না। আমি জানকীকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করতে না পারলেও, তোমার পুত্রকে কখনই বধ করতাম না।'

পরম স্নেহে রাম বিভীষণের শিরে এবং দেহে হস্ত সঞ্চালন করলেন। রামের অঙ্গের স্পর্শে বিভীষণের সর্বাঙ্গ শীতল হলো, পুত্রশোকের তীব্রতা স্তিমিত হলো। তবুও বিভীষণের অশ্রু বাধা মানলো না।

দু'হাতে অশ্রু মুছে, ঈষৎ অপ্রতিভভাবে দুঃখবিজড়িত কণ্ঠে বিভীষণ বললেন, 'হে রঘুকুলসূর্য, তুমি পাছে তরণীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, এবং পাছে লংকেশ্বরের সঙ্গে আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে না চাও, সেই কারণেই আমি আমার পুত্রের পরিচয় গোপন রেখেছি। রাম, তোমাকে এই ঘোর যুদ্ধে জয়ী হয়ে লংকা অধিকার করতে হবে। জনকনন্দিনীকে উদ্ধার করতে হবে। পথে যা কিছু বাধাবিঘ্ন, তা তোমাকে অবশ্যই দূর করতে হবে। তাইতো তোমাকে সাহায্য করতে আমার নিজের পুত্রের মৃত্যুবাণ তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। তোমার হাতের নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র তার হৃদয় বিদীর্ণ করেছে, সে মুক্তি লাভ করে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেছে।'

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিভীষণ, 'হা পুত্র, তরণীসেন' বলে আর্তনাদ করলেন। তাঁর সংজ্ঞা লোপ পেলো।

রাম লক্ষ্মণ উভয়েই 'হায় বিভীষণ', বলে বিলাপে মগ্ন হলেন। বানরদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হলো।

কিছুক্ষণ পরে হনুমান অগ্রসর হয়ে বিভীষণকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হে বীর, তুমি তো প্রভু রামের প্রতি তোমার আনুগত্য প্রদর্শন করেছ, তোমার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছ। তবে আর শোক করছ কেন? তুমি মহাপ্রাজ্ঞ, মহাধার্মিক। তুমি একান্তভাবে রামের অনুরাগী ও ভক্ত। তুমি তোমার উপযুক্ত কাজই করেছ। এখন শোক পরিহার করো, ভবিষ্যতের চিন্তা করো। এখনও অনেক কঠিন কর্তব্য বাকী আছে।'

তীব্র শোকের জ্বালা হৃদয়ের মধ্যে গোপন করে বিভীষণ বললেন, 'বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি যা বলেছ, তা সবই সত্য। আমি জানি, এই শোক আমার শোভা পায় না। কিন্তু বন্ধু, আমি পিতা। নিজের চক্ষের সম্মুখে পুত্রের মৃত্যু দেখে স্থির থাকতে পারি নি। হায়, বিধাতা যদি আমাকে পুত্র না দিতেন! বন্ধু, পুত্র পেয়ে, আর সেই পুত্র যদি তরণীসেনের মতো পুত্র হয়, তাকে হারানোর যে কি মর্মান্তিক জ্বালা, তা আমি ভীষণভাবেই অনুভব করছি। আমি ভাবছি, আমার নিরপরাধ পত্নী সরমা কেমনভাবে এই পুত্রশোক সহ্য করবে! হে রাম, তুমি আমার এই শোক দূরীভূত করার জন্য শীঘ্রই তোমার লক্ষ্যে উপনীত হও। তোমার পক্ষে সবই সম্ভব, আমরা সকলে নিমিত্ত মাত্র।'

বিভীষণের উক্তির গূঢ় তাৎপর্য উপস্থিত সকলেই উপলব্ধি করলেন। সন্ধ্যার সমাগমে রণক্ষেত্র ত্যাগ করার সময়ে সকলেরই মানসপটে রামের উদাস ও শান্ত ভাবটি উদ্ভাসিত হলো। রাম একদৃষ্টিতে তরণীসেনের ভুলুণ্ঠিত দেহটিকে লক্ষ্য করছিলেন।

নিশাচর রাক্ষসদের মৌন ক্রন্দনে লংকার প্রকৃতিতে এক অভাবনীয় অস্থিরতা। এই অস্থিরতা রাক্ষসরাজ রাবণের আহত হৃদয়ের অন্তর্নিদর্শন কিনা, কে বলতে পারে!

* * * *

লংকার প্রদীপ একে একে নিভে যাচ্ছে। একমাত্র পুত্র ইন্দ্রজিৎই সম্বল।

তরণীসেনের মৃত্যু অবধারিত জেনেও, রাক্ষসরাজ তাঁকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার অনুমতি দিয়েছিলেন। না দিয়ে পারেন নি তিনি।

বিশ্বাসঘাতক বিভীষণের একমাত্র পুত্র কিশোর তরণীসেন লংকাবাসীর হৃদয়ে তার দেশপ্রেম সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থভাবে আত্মদান করে গেলো। তরণীসেনও তো অক্লেশে তার পিতার সঙ্গে রামের পক্ষে যোগদান করতে পারতো!

না, তাহলে তরণীসেন দেশপ্রেমিক বলে নিজেকে প্রমাণিত করতে পারতো না, সাধারণ দেশবাসীর নিকটে। রাবণ বেশ ভালোভাবেই জানেন যে তা'হলে তরণীসেন রাক্ষসজীবন থেকেও মুক্তিলাভ করতে পারতো না। মুক্তির কামনা এখন রাবণের হৃদয়কেও আকুল করে। কিন্তু রামের বিরুদ্ধে লংকার এই সংগ্রামকে তো তার শেষ পরিণতিতে নিয়ে যেতে হবে।

তরণীসেনের মৃত্যুতে সাময়িকভাবে কাতর হলেও, রাক্ষসরাজ কর্তব্য নিরূপণ করতে বিলম্ব করেন না। ভ্রাতৃবধূ সরমার এই নিদারুণ পুত্রশোক সহ্য করার ক্ষমতা রাবণকে মুগ্ধ করে। রাণী মন্দোদরীর নিকট রাবণ শুনলেন যে অশোকবনে বন্দিনী সীতাই সরমার প্রধান সান্ত্বনাদাত্রী এবং এই প্রচণ্ড শোকাবেগ সহ্য ও সংযত করবার বিষয়ে প্রধান শক্তিদাত্রী। রাক্ষসরাজ বিস্মিত বোধ করেন এই চিন্তা করে যে জনকনন্দিনী নিজের দুর্দশা ভুলে কেমনভাবে অপরের পর্বতপ্রমাণ দুঃখের বোঝাকে লাঘব করছে!

এ তো সামান্যা নারী নয়! রামও যে সামান্য নর নয় তা' কি ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয় নি? তবে আর কেন? যদি ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করে যুদ্ধে জয়ী হয়, তবে রাক্ষস রাবণ কি করবে? তবে রাক্ষসদেরই বা কি হবে? রাবণ ইন্দ্রজিতের অনুকূলে রাজ্য ত্যাগ করলেও কি লংকাপুরীর ও রাক্ষসদের মানসিক উত্তরণ ও নৈতিক সংস্কার সম্ভব হবে? রাক্ষসরাজ নিজের মনেই উত্তর দেন—না, হবে না। হয়তো এর জন্য রাবণের বংশেরই উচ্ছেদ প্রয়োজন।

রাবণের আত্মোপলব্ধি আজ তার আত্ম-বিলোপকেই আকাঙ্ক্ষা করছে!

আর পরামর্শ করার জন্য লংকায় কেউই জীবিত নেই। রাক্ষসরাজ আপন সভাকক্ষে সিংহাসনে উপবেশন করে ম্লান মুখে চিন্তা করেন। বড়ই অসহায় ও একাকী আজ রাবণ। অন্দরমহলে গিয়েও শান্তি নেই। মহিষী মন্দোদরীর অন্তহীন বিক্ষোভ—অভিযোগ ও অভিশাপ অপেক্ষা নিষ্ঠুর বলে প্রতীয়মান হয়। মনে মনে রোদন করেন, রাবণ, তাঁর রাক্ষস অস্তিত্বের পূর্ব অনাচারের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ।

ইন্দ্রজিৎ এসে যথারীতি বীরত্বের আস্ফালন করেন, সান্ত্বনা দেন ভগ্নহৃদয় পিতাকে। ম্রিয়মাণ রাক্ষসরাজ পুত্রকে বলেন, 'বীরেন্দ্র, তুমি দৃশ্য অথবা অদৃশ্য যেভাবেই যুদ্ধ করো, তোমার বল ও বীর্য তুলনাহীন। তুমি যাও, শত্রুকে জয় করে রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করো।'

ইন্দ্রজিৎ রাবণের এই আদেশের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। ইন্দ্রজিতের অদৃশ্য যুদ্ধে রাম ও লক্ষ্মণ দুজনেই শরাঘাতে জর্জরিত হলেন। ইন্দ্রজিৎ মায়াযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী। চার দিক এবং আকাশ ধূমাচ্ছন্ন হয়ে আঁধারে আবৃত হলো। ইন্দ্রজিতের শরপ্রহারে শত্রুরা আহত এবং রক্তাক্ত।

শত্রু সাময়িকভাবে পর্যুদস্ত হলে, ইন্দ্রজিৎ তাঁর রথে একটি মায়াময়ী সীতার মূর্তি স্থাপন করে, যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন। হনুমান ইন্দ্রজিতকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে ইন্দ্রজিৎ দম্ভের সঙ্গে বললেন, 'যে সীতার উদ্ধারের জন্য তোমরা সকলে লংকায়

এসেছ, সেই সীতাকে আমি তোমাদের চোখের সামনে হত্যা করবো। আমি যে কাজ শত্রুর পীড়াদায়ক, তাইই করবো। সেই কাজের দ্বারা স্ত্রীলোকের হত্যা অনুষ্ঠিত হলেও আমি সঙ্কুচিত হবো না।'

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ দুঃখে মুহ্যমান, উপবাসে কৃশ সীতার সেই মায়াময়ী মূর্তি তীক্ষ্নধার খড়্গের আঘাতে ছেদন করলেন। গভীর শোক এবং দুঃখে নিমগ্ন হয়ে হনুমান হিংস্রভাবে ইন্দ্রজিতের রথের উপর শিলাখন্ড নিক্ষেপ করলেন। বানরেরাও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে রাক্ষসদের আক্রমণ করলো। রাক্ষসসৈন্যও ইন্দ্রজিতের পৃষ্ঠ রক্ষা করে সেই আক্রমণ প্রতিহত করলো। ইন্দ্রজিৎ শূল, খড়্গ, পট্টিশ, মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা বানরদের নিধনে প্রবৃত্ত হলেন।

হনুমানের মুখে সীতার নিধনের সংবাদে, রাম ভূলুণ্ঠিত হয়ে শিশুর মতো রোদন করলেন। সেই বিয়োগান্তক দৃশ্যে হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতি কেউই স্থির থাকতে পারলেন না।

কেবলমাত্র লক্ষ্মণই নিজেকে সংযত রেখে রামের উদ্দেশে বললেন, 'আপনার প্রাপ্য রাজ্য আপনি যে কেন পরের হাতে তুলে দিয়ে এত দুঃখ কষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ করে নিলেন, তা জানি না। যাই হোক, গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন উঠুন, পুরুষকারকে আশ্রয় করে রাবণকে তার কৃতকর্মের জন্য সমুচিত শাস্তি দিন।'

বিভীষণ সেই স্থানে উপস্থিত হতে লক্ষ্মণ বললেন, 'রাক্ষসপ্রবর, হনুমান জ্যেষ্ঠ রামকে বলেছেন যে ইন্দ্রজিৎ জানকীকে তাঁর চোখের সামনে বধ করেছে।'

ইন্দ্রজিতের সীতাকে হননের বারতা শুনে বিভীষণ উত্তেজিতভাবে মস্তক আন্দোলন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিলাপরত রামের উদ্দেশে বললেন, 'ইন্দ্রজিৎ বানরদের মায়ায় বশীভূত করেছে। সে যাকে বধ করেছে তা মায়াময়ী সীতা। রাবণ কখনই সীতাকে বধ করবেন না। তোমার সঙ্গে যে চরম শত্রুতা রাবণ করেছেন, তার পরিণতিতে এক চূড়ান্ত সংগ্রাম রাবণ ও তোমার মধ্যে হবেই। সেই সংগ্রামে, বন্ধু রাম, তোমাকে জয়ী হতেই হবে। না হলে, কারোরই উদ্ধার হবে না।'

বিভীষণের বাক্যে উৎসাহিত হয়ে লক্ষ্মণ বললেন, 'বিভীষণ, তোমার উক্তি কিছু পরিমাণে রহস্যাবৃত হলেও, মূল কথাটি আমার নিকট সরল ও স্বচ্ছ। এখন বলো, কেমনভাবে আমরা সেই শেষ সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হবো। কেমনভাবে আগে ইন্দ্রজিতকে বধ করে সেই পথ প্রশস্ত করবো।'

লক্ষ্মণের বীরোচিত বাক্যে তৃপ্ত হয়ে বিভীষণ ধীরভাবে বললেন, 'আমি সেই কথাই বলছি। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাম, তুমি বৃথা শোক ত্যাগ করো। আমি জানি আজ ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করে হবি প্রদান করবে। সমস্ত দেবতারা সেখানে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ সমাপ্তিতে তাকে আশীর্বাদ করবেন। তাহলে, তোমরা সকলেই তার হাতে মৃত্যুমুখে পতিত হবে।'

বিভীষণের বর্ণনায় বিষাদগ্রস্ত রাম আরও নৈরাশ্যযুক্ত হলেন। কিন্তু লক্ষ্মণের দুটি আঁখি উজ্জ্বল হলো।

লক্ষ্মণ বিভীষণের দুটি হাত ধরে অস্থিরভাবে বললেন, 'বন্ধু বিভীষণ, এখন বলো কি ভাবে আমরা এই আসন্ন বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হবো? বন্ধু, এখন তোমার সক্রিয় সাহায্য ভীষণভাবে আবশ্যক। ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ শেষ হলেই সমূহ বিপদ।'

বিভীষণ লক্ষ্মণের যুগপৎ দৃঢ়তায় এবং ব্যাকুলতায় প্রীত হয়ে বললেন, 'হে

বীরশ্রেষ্ঠ, রামানুজ লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিতকে যজ্ঞ শেষ করতে দেওয়া চলবে না। তোমাকেই তার যজ্ঞ পণ্ড করতে হবে, তাকে বধ করতে হবে। আমি পথ দেখিয়ে তোমাকে সসৈন্যে সেই যজ্ঞাগারে নিয়ে যাবো। ব্রহ্মার বিধান অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানের আগে যে শত্রু ইন্দ্রজিতকে আক্রমণ করবে, তার হাতেই ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হবে। অন্যভাবে ইন্দ্রজিতকে বধ করা সকলেরই অসাধ্য।'

রাম বললেন দৃঢ়তার সঙ্গে, 'তবে তাইই হবে, বন্ধু বিভীষণ। তুমি লক্ষ্মণকে সর্বতোভাবে সহায়তা করো। রাবণের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য আমি এখন থেকেই মনে মনে প্রস্তুত হই।'

* * * *

রাক্ষসপক্ষ রামের অভিপ্রায় সম্বন্ধে ক্ষীণতম ধারণা করতেও সক্ষম হয় নি। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ শেষ করে অনায়াসেই শত্রুকে পরাজিত করবে, রাম ও লক্ষ্মণকে নিহত অথবা বন্দী করবে, এই কল্পনার বিলাসে মগ্ন হয়ে তারা হৃদয়ে সাহস সঞ্চয় করছে। লংকাপুরীর মধ্যে রাক্ষসসৈন্যের কোন প্রবল প্রস্তুতি নেই।

বানর সেনানায়কদের আদেশে বানরসেনাও নীরব, শিবিরগুলি নিস্তব্ধ। বিভীষণ রণসাজে সজ্জিত হয়ে, গদা হস্তে লক্ষ্মণকে পথ প্রদর্শন করে লংকাপুরীর পশ্চিমের দ্বারে নিয়ে উপস্থিত হলেন। কনকলংকার সৌন্দর্য ও আড়ম্বরের সম্মিলিত প্রভাবে লক্ষ্মণ বিস্মিত, বিমূঢ়।

রাজপথের দু'পাশে হর্ম্যরাজী দীর্ঘকায় ও রত্নখচিত। অট্টালিকার গবাক্ষগুলি মণি ও মাণিক্যভূষিত, গৃহচূড়াগুলি সুবর্ণমণ্ডিত। রাজপথের দু'ধারে বিশাল ও সুসন্নিবিষ্ট বৃক্ষগুলি নানাবিধ ফুল ও ফলে সমৃদ্ধ। অল্প দূরত্বের ব্যবধানে শ্বেত-প্রস্তরের সোপান সমন্বিত মনোরম দীর্ঘিকাগুলি পথের স্বাভাবিক শোভাকে বর্ধিত করেছে।

বিভীষণ ও লক্ষ্মণের পশ্চাতে বিশাল বানর-ভল্লুক সেনাবাহিনী লংকাপুরীতে প্রবেশ করলো। এই আকস্মিক আক্রমণে রাক্ষসসৈন্য সচকিত এবং ভীত। অবশেষে দুই প্রতিপক্ষ তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হলো। যজ্ঞে নিযুক্ত ইন্দ্রজিৎ চমকিত ও দ্বিধাগ্রস্ত। রাক্ষসদের ব্যাপক নিধনে বিচলিত হয়ে ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ ত্যাগ করে বানরসেনাকে প্রতিহত করতে প্রবৃত্ত হলেন।

এই অবসরে বিভীষণ লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞাগারের নিকটস্থ এক কাননে নিয়ে এসে একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষকে নির্দেশ করে বললেন, 'যজ্ঞ শেষ করে, ইন্দ্রজিৎ এই বটপাদপের নিকটে এসে ভূতগণকে উপহার প্রদান করার পরে শত্রুকে আক্রমণ করে। ইন্দ্রজিতকে সেই সুযোগ আর দিও না। দিলে, সে শত্রুকে অক্লেশে বধ করবে অথবা বন্ধন করবে। তোমাদের যুদ্ধে জয়লাভ সুদূরপরাহত হবে। সে এলেই তুমি এখনই তাকে বধ করো।'

ইন্দ্রজিৎ বানর সেনাকে বিধ্বস্ত করার পরে প্রধান শত্রুদের অনুসরণ করে দ্রুতবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। লক্ষ্মণকে বিভীষণের সঙ্গে দেখে ইন্দ্রজিতের মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিস্ফুরিত হলো। এই নির্জন ও গোপন স্থানে তা হলে বিশ্বাসহন্তা কনিষ্ঠতাতই এই শত্রুকে নিয়ে তস্করের মতো প্রবেশ করেছে।

উদ্ধত ক্রোধকে দমন করতে ব্যর্থ হয়ে ইন্দ্রজিৎ কর্কশ স্বরে চিৎকার করে বললেন, 'ওরে নীচ ও লোভী লক্ষ্মণ, তুই পথের ভিখারী হয়ে এক বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে

রাক্ষসরাজ রাবণের ভুবনবিজয়ী পুত্রকে নিধন করার স্বপ্ন দেখছিস? তোর যুদ্ধের সখ আমি চিরকালের জন্য মিটিয়ে দেব। ধিক, তোর এই তস্করের মতো হীন প্রবৃত্তিকে!'

ইন্দ্রজিতের দাম্ভিক উক্তিতে লক্ষ্মণের বিদ্বিষ্ট অন্তঃকরণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হলো। গভীর ঘৃণায় ও ক্ষোভে মুখ বিকৃত করে লক্ষ্মণ বললেন, 'রে দুর্বিনীত রাক্ষস, তস্কর যে তোর হীন পাপিষ্ঠ পিতা, সে কথা তো তুই ভালোভাবেই জানিস্। সেই পিতার পুত্র হয়ে তুইও যে পশুর অধম হ'বি, তাতে আর আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তোকে আমি পশুর মতোই বধ করে মনের জ্বালা মেটাবো, পৃথিবীকে পাপমুক্ত করবো। তুই কামাসক্ত ও উদ্ধত; তোর পরামর্শেই তোর পিতা এই অধার্মিক আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছে। এবার তোরা সবংশে ধ্বংস হ'বি।'

ইন্দ্রজিত আরও নিকটে এসে বিভীষণের আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। বিভীষণের হৃদয়ে দুঃখ থাকলেও, সংকোচ নেই। ইন্দ্রজিতের দু আঁখির রক্তবর্ণে এবং নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় যেন লক্ষ্মণ দগ্ধ হলেন। কিন্তু বিভীষণ নির্বিকার। বিভীষণের শান্ত মুখমণ্ডলের উপর কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ইন্দ্রজিৎ। লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও ইন্দ্রজিতের আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হলেন।

অকস্মাৎ নিজের হস্তের অসিটিকে বিভীষণের পদে নিক্ষেপ করে ইন্দ্রজিৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ কনিষ্ঠতাত, আপনি এত নীচ, এত স্বার্থপর! আপনার রাজ্য ও সিংহাসনের প্রতি লোভ এতই প্রবল, যে আপনি খাল কেটে কুমীর আনার মতো শত্রুকে পথ দেখিয়ে গৃহের অন্দরমহলে নিয়ে এলেন? রাক্ষসরাজ রাবণের সুযোগ্য ভ্রাতা হয়ে, আমার খুল্লতাত হয়ে, আপনি আমার ও লংকার প্রতি শত্রুতা করছেন, লংকেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন! হায়, হায়, আপনি পরের ক্রীতদাসত্ব করে কি সুখ ভোগ করছেন? আপনার রাজ্যলোভ আপনাকে কোথায় নামিয়ে এনেছে, আমি চিন্তাও করতে পারছি না। ছিঃ ছিঃ, আপনাক শত ধিক!'

এইবার বিভীষণ তাঁর মৌনতা ভঙ্গ করলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের তীব্র ভর্ৎসনার প্রতিক্রিয়ায় তাঁর কর্ণমূল রক্তিম হয়েছে। বিভীষণ বিশ্বাসঘাতকত্বের অভিযোগের পরে আর অবিচলিত থাকতে সক্ষম হলেন না। তিনি প্রথমে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করলেন এবং লক্ষ্মণের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ইন্দ্রজিতের অবজ্ঞাপূর্ণ বদনের প্রতি নয়ন নিবদ্ধ করলেন।

বিভীষণের কণ্ঠে ব্যঙ্গ ও দুঃখের সংমিশ্রণ। ইন্দ্রজিতের কর্ণে প্রবেশ করলো খুল্লতাত বিভীষণের তীব্র বাক্যবাণ, 'ইন্দ্রজিৎ, তুমি নিতান্ত অর্বাচীনের মতো কথা বলছো। লংকার কে শত্রু আর কে মিত্র, রাক্ষসরাজ নিজে হয়তো এতদিনে ঠিকই বুঝেছেন। কিন্তু তুমি কোনদিনও বুঝবে না। তোমাদের কয়েকজনের মতো মূর্খকে বিশ্বাসের পাত্র মনে করে, তোমার পিতা সোনার লংকাকে ছারে খারে দিয়েছেন। তুমি তোমার প্রিয় খুল্লতাত কুম্ভকর্ণের কথা স্মরণ করো। তিনিও তোমার পিতাকে এই অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের বিরুদ্ধে সতর্ক করে বৈদেহীকে প্রত্যর্পণ করতে বলেছিলেন। কিন্তু দর্পিত ও পাপমতি রাবণ নিজের ক্রূর ও নিষ্ঠুর রাক্ষসপ্রবৃত্তিকে খর্ব করতে সক্ষম না হয়ে, নিজেও সর্বনাশের পথে গেছে, দেশকেও পাপের পংকে নিমজ্জিত করেছে। ইন্দ্রজিৎ, আর তোমার রক্ষা নেই। কেউ তোমার উপর কণামাত্র করুণাও প্রকাশ করবে না। এখন অবধারিত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।'

ইন্দ্রজিতের বাম চক্ষু কম্পিত হচ্ছিল। আসন্ন বিপর্যয়ের সংকেতে ইন্দ্রজিৎ বিবর্ণ-প্রায়। ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ সমাপ্ত হয় নি, অথচ বৈরী গৃহদ্বারে উপনীত হয়েছে। ব্রহ্মার বচন স্মরণ কোরে ইন্দ্রজিৎ মনে মনে শিহরিত হন। তবে কি ইহজীবনের লীলাখেলা এইখানেই শেষ ?

শেষ চেষ্টা করলেন ইন্দ্রজিৎ আত্মরক্ষার জন্য। মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'কনিষ্ঠতাত, আপনার অভিযোগ সত্য হলেও আপনি যে কাজ করতে এখন সংকল্প করেছেন, তা অত্যন্ত অধার্মিক ও অন্যায়। শাস্ত্রে বলে যে নিজের কর্মবৃত্তের মধ্যে থেকে মৃত্যু বরণ করাও ভালো, তবুও পরের বৃত্তি ও ধর্ম গ্রহণ অভিপ্রেত ও ন্যায়সঙ্গত নয়। কারণ স্বজনই সব সময়ে সহানুভূতিপূর্ণ ও হিতকামী এবং পর সর্বদাই পর। তার কোন মায়া মমতা নেই। অতএব আপনি এখনও রামের দাসত্ব ত্যাগ করুন। দেখুন, আমি যজ্ঞ শেষ করে কেমন অল্প আয়াসেই এই দুর্বৃত্ত লক্ষ্মণকে বধ করে পিতার প্রধান শত্রু রামকেও যমালয়ে প্রেরণ করি।'

ইন্দ্রজিতের স্পর্ধিত বাক্যে উত্তেজিত হয়ে রোষদীপ্ত কণ্ঠে লক্ষ্মণ বললেন, 'রে নীচ রাক্ষস, তোর আসন্ন সময় উপস্থিত। আর কোন সুযোগই তোকে দেওয়া হবে না। তুই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ।'

লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও বানরসৈন্য ইন্দ্রজিতের সারথি, অশ্ব ও রথ বিনষ্ট করলেন।

ইন্দ্রজিৎ মর্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করলেন যে আজ আর তাঁর নিষ্কৃতি নেই। মনে মনে ইষ্টনাম জপ করে, তিনি পিতা ও মাতার মুখদুটি স্মরণ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে হাতের ধনুতে শর সংযোজন করে হনুমানের পৃষ্ঠে আরূঢ় লক্ষ্মণের প্রতি আক্রমণে উদ্যত হলেন। কিন্তু বিভীষণের নির্দেশ মতো লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের প্রতি ঐন্দ্রবাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই জীবন্ত শর যেন বিদ্যুৎ শিখার মতো আকাশে প্রসারিত হয়ে অদূরে ইন্দ্রজিতের শিরস্ত্রাণ-আবৃত এবং কুণ্ডলশোভিত মস্তকটিকে দেহচ্যুত করলো।

ইন্দ্রজিতের এই ভয়াবহ পরিণামে ভীত ও নৈরাশ্যযুক্ত রাক্ষসসৈন্য করুণ আর্তনাদের মধ্যে চারদিকে বিক্ষিপ্ত হলো। বানরসৈন্যসহ লক্ষ্মণ এই অবসরে অরক্ষিত পশ্চিমদ্বার দিয়ে নিঃসৃত হয়ে নিজের শিবিরে প্রস্থান করতে উদ্যত হলেন। সপ্তম দিবসের যুদ্ধাবসানে লংকার শেষ আশা চিরতরে বিলুপ্ত হলো।

বিভীষণকে অনুসন্ধান করতে লক্ষ্মণ লক্ষ্য করলেন যে বিভীষণ রণক্ষেত্রে লুণ্ঠিত হয়ে বিলাপ করছেন। অজস্র ধারায় অশ্রু নির্গত হচ্ছে বিভীষণের দুটি শোকার্ত নয়ন থেকে।

বিভীষণ তীব্রভাবে রোদন করছেন। মুখে বলছেন তিনি, 'হে বাসববিজয়ী, হে পুত্রতুল্য ইন্দ্রজিৎ, তুমি অভিমানভরে কেন ভূতলে পতিত হয়ে আছ আজ ? এই শোণিতরঞ্জিত যুদ্ধস্থল কি তোমার বিশ্রামের কুঞ্জ ? রাবণ ও মন্দোদরীর নয়নের মণি তুমি, তোমার কি এখানে নিদ্রিত থাকা শোভা পায় ? ওঠ বীর, চল আমরা রাক্ষস-রাজের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন করি।'

বিভীষণের বিলাপে লক্ষ্মণ ভীষণভাবে বিচলিত হন। বিভীষণের আকুল ক্রন্দনে উপস্থিত সকলের চক্ষুই আর্দ্র হয়েছে।

বিভীষণ আপন মনে খেদ করছেন, 'হায় বৎস, ত্রিভুবনজয়ী ও রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণের জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি! শত্রু এখন লংকাপুরী আক্রমণ করেছে। তোমার কি সুখনিদ্রার

সময় এখন? রাক্ষসসৈন্য সম্পূর্ণভাবে ভগ্নমনোরথ এবং ভীতিগ্রস্ত, সুতরাং তুমি তাদের উৎসাহিত না করলে, তারা কেমনভাবে সঞ্জীবিত হবে! রাক্ষসরাজ ও রাণী মন্দোদরী যে তোমার অদর্শনে বিহ্বল হয়েছেন। বৎস, সমস্ত দেশ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তোমার এইভাবে ধূলায় লুণ্ঠিত থাকা উচিত নয়। পুত্র, তুমি ওঠ, আমাদের প্রাণে আনন্দ দাও। নিজের কর্তব্য পালন করো। তুমি না উঠলে তোমার পিতা ও মাতাকে কি বলে সান্ত্বনা দেব, বধূমাতা প্রমীলাকে কি বলে প্রবোধ দেব? ছিঃ বৎস, ওঠো, কথা শোনো, চোখ খোলো। হায়, হায়, তবে রাক্ষসদের বংশে বাতি দিতে কেউই থাকবে না! হায় মন্দভাগ্য বিভীষণ!'

বিভীষণ তরণীসেনের নিধনে যে শোক প্রকাশ করার অবকাশ পান নি, তাঁর সেই শোক ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর শোকের সঙ্গে দ্বিগুণ বেগে বর্ধিত হলো। বিভীষণের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে। লক্ষ্মণ বিভীষণের বিশাল দেহটিকে দুই বাহুতে আকর্ষণ করে, অঙ্গদের সহযোগিতায় তাঁকে বানর সেনার মধ্যভাগে নিয়ে এসে লংকাপুরীর তোরণের অভিমুখে অগ্রসর হলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার এসে ধীরে ধীরে লংকাপুরীর আকাশকে আচ্ছন্ন করলো।

* * * *

'হা পুত্র ইন্দ্রজিৎ, এ যে বিনামেঘে বজ্রপাত তুল্য হলো! কেমনভাবে দুরাত্মা লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে তস্করের মতো প্রবেশ করে যজ্ঞ পণ্ড করলো! অন্যায় যুদ্ধে তোমার অমূল্য প্রাণটি হরণ করে নিয়ে গেল! হা পুত্র, নিশ্চয় আমারও শমনভবনে যাবার সময় হয়ে এসেছে। হায়, হায়, আমার একটি পুত্রও আর অবশিষ্ট থাকলো না! রাণী মন্দোদরী কেমনভাবে এই শোক সহ্য করবেন! বধূমাতা প্রমীলা এই অকাল বৈধব্যের অভিশাপ কেমনভাবে বহন করবে? হায়, আমার পাপেই এই সর্বনাশ ঘটলো।'

বার বার শিরে করাঘাত করে রাবণ এইভাবে বিলাপ করলেন। ইন্দ্রজিতের অপ্রত্যাশিত নিধন রাবণের বক্ষে বজ্রাঘাতের যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছে। রাজসভায় সিংহাসন থেকে পতিত হয়ে রাক্ষসেন্দ্র মূর্ছিত হয়েছিলেন। সংজ্ঞা লাভ করে তিনি বিলাপে মগ্ন হলেন। হায়, আজ লংকাধীশকে সান্ত্বনা দেবারও কেউ নেই!

ক্ষণকালের বিরতিতে রাবণ আত্মস্থ হলেন। অবনত মস্তকে তিনি সভাগৃহ ত্যাগ করলেন। আপন বিশ্রামকক্ষে এসে রাণী মন্দোদরীর দুটি কোমল হাত একবার স্পর্শ করেই, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ত্যাগ করলেন। মুখে বিষাদের কালিমা। রাবণ গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

রাবণের আত্মচিন্তা মন্দোদরীর আকুল ক্রন্দনে বিঘ্নিত হলো। শোকগ্রস্ত রাণী বিলাপ করছেন, 'রাক্ষসরাজ, আমার কথা যদি একটুও শুনতেন, তবে আজ আমাদের এবং লংকার এই শোচনীয় অবস্থা হোতো না। হায় স্বামিন, আপনি নিজেও গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে সোনার লংকাও মজলো। হায় পুত্র ইন্দ্রজিৎ, না জানি কত কষ্ট পেয়েই শত্রুর হাতে তোমার মৃত্যু হয়েছে! বধূমাতা এই তরুণ বয়সে তোমাকে হারিয়ে কি করে বাকী জীবন কাটাবে? হায়, আমার হৃদয় কি পাষাণে পরিণত হয়েছে, যে আমি এখনও বেঁচে আছি!'

মন্দোদরীর বিলাপে রাবণের শোকও উদ্বেলিত হলো। মস্তক আন্দোলিত করে করুণ কণ্ঠে রাবণ বললেন, 'হায় হায় রাণী, আমার এমন সাজানো রাজ্য, পাট, সংসার

শ্মশানে পরিণত হলো! মন্দোদরী, হতভাগ্য, বিশ্বাসঘাতক বিভীষণের চক্রান্তে ও প্ররোচনায় আমার ইন্দ্রজিতের মৃত্যু ঘটেছে। অকালে এক সৌরভময় কুসুম ম্লান হয়ে ঝরে পড়েছে। রাণী, আমার কথা বাদ দাও। দেশ কি কোনদিনও বিভীষণকে ক্ষমা করবে ভেবেছ?'

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুজনিত শোক মন্দোদরীর মাতৃহৃদয়কে বিধ্বস্ত করেছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু সীতাকে লংকায় নিয়ে আসার পর থেকেই মন্দোদরীর মনে এক অনাগত বিপর্যয়ের পূর্ববোধ জেগেছিল। সেই সময়ে বিভীষণের বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতার কথা স্মরণ কোরে এখনও মনে মনে তাঁর প্রশংসা না করে পারেন না মন্দোদরী।

সেই কারণে রাক্ষসরাজের শেষ মন্তব্যকে সমর্থন করতে অক্ষম হয়ে মন্দোদরী অভিযোগের সুরে বললেন, 'রক্ষপতি, আপনি আজ বৃথাই বিভীষণের দোষ দিচ্ছেন। আপনার কি উচিত হয়েছে দেবর বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণ, আপনার মাতামহ মাল্যবান, এবং আমার সতর্কবাণী উপেক্ষা করে সীতাকে বন্দিনী করে রাখা? হনুমান লংকায় এসে বিপর্যয় ঘটিয়ে গেলেও, আপনি তাতে কোন গুরুত্ব আরোপ না করে বৃথাই রামের সঙ্গে শত্রুতা করতে বদ্ধপরিকর হলেন। আপনার রাক্ষসসুলভ দম্ভে, আপনি বিপদের সকল সংকেত, সকল আশংকাকেই অবজ্ঞা করলেন। হায়, তার ফলেই আজ আমাদের এই দুরবস্থা!'

রাবণ এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রধানা মহিষীর অভিযোগগুলি শুনছিলেন। রাবণ কোন মন্তব্য না করে, নিজেকে আত্মবিশ্লেষণে নিযুক্ত করেছিলেন।

এখন শান্ত কণ্ঠে রাবণ বললেন, 'রাণী মন্দোদরী, রাক্ষসরাজ রাবণের রামের শত্রুতা করা ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না। বিভীষণ যে দেশদ্রোহিতার পরিচয় দিয়েছে, শত্রুকে পথ চিনিয়ে ঘরের কাছে এনেছে, এসব কি তুমি অস্বীকার করতে পারবে? অবশ্য, বিভীষণ আমাকে অনেক বলেছে, রামের সঙ্গে সন্ধি করতে এবং আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রোতকে লংকায় প্রবাহিত করতে। কিন্তু রাক্ষস আমি, নিজের আত্মম্ভরিতায় এবং পরের প্রতি বিদ্বেষে এবং ঘৃণায়, আমি সে প্রস্তাব গ্রহণ করি নি।'

মন্দোদরী বিস্মিতভাবে পতির মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, 'মহারাজ, সব জেনে, সব বুঝেও আপনি দেবর বিভীষণের প্রস্তাব মতো কাজ করেন নি! তবে আজ বিভীষণকে অনর্থক দেশদ্রোহী বলে ছোট করছেন কেন?'

রাবণ মন্দোদরীর কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করে বললেন, 'না রাণী, তাকে অকারণে ছোট করতে চাই না। তবে, রাক্ষসদের শেষ স্বাধীন নৃপতি হিসেবে আমি আর্যক্ষাত্রিয় রামের সঙ্গে শেষ সংগ্রাম করতে চাই। যদি পরাজিত হই, তবে নিহত হয়েই পরাজিত হবো, তার আগে নয়। আমি জানি, সেইই আমার নিয়তি। কিন্তু, রাক্ষস রাবণের কোন উপায় নেই রামকে ক্ষমা করবার। রাম রাক্ষসদের মহাশত্রু, তাইতো তার প্রিয় ভার্যাকে হরণ করে লংকায় রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু রাম নিয়তির বেশে আমাকে অনুসরণ করে সুদূর লংকায় উপস্থিত হয়েছে। নিয়তিকে আমি হয়তো বাধা দিতে পারবো না। কিন্তু দেহে রক্তের শেষ বিন্দু অবশিষ্ট থাকতে আমি তাকে লংকা জয় করতে দেবো না। যতদিন রাবণ জীবিত থাকবে, ততদিন লংকা রাক্ষসদের সুদৃঢ় দুর্গরূপেই বর্তমান থাকবে।'

মন্দোদরী রাবণের সংগ্রামী মনোভাবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন, 'তাই হোক মহারাজ। আপনি পৃথিবীজয়ী বীর, আপনি চরম ক্ষতি অথবা চরম লাভ ছাড়া

কিছুতেই শান্ত হবেন না, আমি জানি। আপনি পরম জ্ঞানী, পরম ধার্মিক। আপনার মনের কথা আমি সামান্যা নারী কতটুকুই বা জানি। আপনি শত্রুকে নিশ্চয়ই জয় করবেন। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

মন্দোদরী রাবণের পদতলে পতিত হয়ে আকুলভাবে রোদন করলেন। রাবণের হৃদয় মন্দোদরীর দুঃখে বিগলিত হলো। কিন্তু এখন শোকের সময় নয়। এখনও শেষ সংগ্রাম বাকী। রাবণ মন্দোদরীকে উত্তোলন করে আলিঙ্গন করলেন।

রাবণ নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে বললেন, 'মহারাণী, তুমি ঠিকই বলেছ যে আমি চরম ক্ষতি অথবা চরম লাভ ছাড়া কিছুতেই শান্ত হবো না। হ্যাঁ, প্রিয়তমে, সত্যই তা হবো না। রামই আমার নিয়তি। রামকে সামান্য মানব বলে আমারও আর মনে হয় না। বিভীষণ তাকে ঘরের খবর সব জানিয়ে দিলেও, না। বিভীষণ তো রামের কাছে জেনে শুনেই আত্মসমর্পণ করেছে। বিভীষণ তো কিছু অন্যায় করে নি। বিভীষণ তার বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই হয়তো ইষ্টের দেখা পেয়েছে। আমি রাবণ, এক হতভাগ্য রাক্ষস যদি সেই একই ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমার আকাঙ্ক্ষিত দেবতা বিষ্ণুর দেখা পাই, তবে তার হাতে মৃত্যু হলে রাক্ষস রাবণের যেমন একদিকে চরম ক্ষতি, তেমনই অন্যদিকে পরম লাভ !'

*   *   *   *

ইন্দ্রজিতের পতনে বানরশিবিরে অভুতপূর্ব আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হলো। বানরদের উল্লাসধ্বনি সমুদ্রের তরঙ্গে প্রতিহত হয়ে সমরাঙ্গন থেকে দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হলো। সঙ্গে সঙ্গে রামের, লক্ষ্মণের ও বিভীষণের জয়ধ্বনিতে সমুদ্রসৈকতের পবন ও আকাশ মুখরিত। রাম গভীর স্নেহে লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে, অনুজের ললাটে চুম্বন অংকিত করলেন।

লক্ষ্মণ আঁখি দুটি মুদ্রিত করে রামের পবিত্র অঙ্গের স্পর্শটি উপভোগ করছিলেন। লক্ষ্মণের মনে হলো যে রামের এই ভ্রাতৃস্নেহের উদার ও স্বর্গীয় অভিব্যক্তি তাঁর জীবনকে সার্থক করছে। জ্যেষ্ঠ রামকে নিঃস্বার্থভাবে ভক্তি ও সেবা করার প্রবণতা বাল্যকাল থেকেই লক্ষ্মণের মধ্যে জাগরিত হয়েছিল। আজ রামের অন্তরের ঔদার্য ও প্রীতির এই অকৃপণ প্রকাশে, লক্ষ্মণের হৃদয় আবেগে প্লাবিত হলো।

লক্ষ্মণের অধরে মধুর হাসি। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের পদে প্রণাম করে বললেন, 'হে রাঘব, মিত্র বিভীষণের সক্রিয় সহায়তা ব্যতীত, আমি কোন মতেই আপনার জন্য এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে পারতাম না। যাই হোক, দুরাত্মা মেঘনাদকে বধ করে আমি এক কঠিন কর্তব্য পালন করেছি, এবং নিজেকে ধন্য মনে করছি। এখন আপনি পাপিষ্ঠ রাবণকে বধ করে বৈদেহীকে উদ্ধার করুন। বনবাসের চৌদ্দ বৎসর উত্তীর্ণ হবার আর অধিক বিলম্ব নেই। আপনি লংকা জয় করে, জানকীকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যার রাজা হবেন কবে, আমি সেই আশাতেই দিন গুণছি। ইক্ষ্বাকু কুলে এবং রঘুর বংশে আপনার তুল্য শক্তিমান ও মহৎ নরপতি আর কেউই ছিলেন না। কোনদিন হবেনও না।'

লক্ষ্মণের প্রশংসাসূচক বাক্যে রামের সৌম্য আকৃতিতে এক সংকোচের ভাব প্রকাশিত হয়। দশরথতনয় রামকে যেন এক অপার্থিব কান্তিতে উদ্ভাসিত মনে হয় সকলের। বিভীষণ রামের এই অপূর্ব মূর্তি দেখে বিস্ময়ে হতবাক। মুগ্ধ নয়নে রামের অপরূপ মুখশোভা লক্ষ্য করতে করতে বিভীষণ চিন্তা করেন যে আর সন্দেহ নেই যে তাঁর

ইষ্টদেবতা আজ এই অভূতপূর্ব রূপ ও লাবণ্যবিশিষ্ট এক অপার্থিব মানবের আকৃতি ধারণ করে ভূভার হরণের কাজেই অবতীর্ণ হয়েছেন।

লক্ষ্মণের ভাবপ্রবণতায় বিচলিত হয়ে রাম স্মিত মুখে বললেন, 'লক্ষ্মণ, তুমি ঠিকই বলেছ। বন্ধু বিভীষণকে লংকার সিংহাসনে স্থাপিত করলেও, তাঁর ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না। লক্ষ্মণ, তোমার ঋণও অপরিশোধ্য। যাই হোক, এখনও আমাদের শেষ ও চরম জয়টিই বাকী আছে। পাপাত্মা রাবণ ও তার অনুচরেরা আর্য ঋষিদের উপর অনেক অত্যাচার করেছে। সেই অত্যাচারের প্রতিশোধও আমি বৈদেহীকে উদ্ধারের মধ্য দিয়েই নিতে চাই। তোমরা কিছুমাত্র চিন্তা কোরো না। মহাশত্রু রাবণ, সে যত বড় বীরই হোক, আমার হাতে নিষ্কৃতি পাবে না।'

লংকার অধিপতি হবার বাসনা রাবণের নিপাতের মধ্যেই পরিপূর্ণ হবে, এই চিন্তা বিভীষণের মনে উদয় হয়। রাবণের মুক্তির দিন, লংকার শুদ্ধির দিন সমাগতপ্রায়। এই রঘুকুলসূর্য, আর্যক্ষাত্রিয়দের গৌরব রাম, অনার্যদের রাজ্যে আর্যপ্রভাব বিস্তারের জন্যই চিহ্নিত। রামের আবির্ভাবে অনার্য জগতে ভাগবত ধর্মের প্রচলনও সংঘটিত হবে। শিবের সঙ্গে বিষ্ণুও ভক্তের হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করবেন। ধর্ম, সংস্কৃতি ও মৈত্রীর দৃঢ় বন্ধনে আর্য, বানর, রাক্ষস সকলেই এক সূত্রে আবদ্ধ হবে।

বিভীষণ নিজের প্রশস্তিতে লজ্জা অনুভব করে মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'রাম, তুমি মহানুভব ও মহাবীর। আমার চোখে তোমার মহিমা অন্য প্রকৃতির। আমি জানি না, তোমার স্বরূপ তুমি নিজে জান কি না। কিন্তু রাবণকে তুমি নিশ্চয়ই পরাজিত করবে। হে নরশ্রেষ্ঠ দেবকল্প বীর, তুমি জেনো যে রাবণ জ্ঞানবান ও ধার্মিক। সে তোমার হাতে মৃত্যুবরণ করে মুক্তির কামনা করে। তুমি দেখবে, রাক্ষসরাজ কালই প্রত্যূষে তোমার সঙ্গে দ্বৈত সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। রাম, তোমার মাহাত্ম্যে আমি বিশ্বাস করি। তোমার জ্ঞান, গরিমা, বীর্য ও পরাক্রম সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু বন্ধু, অত্যন্ত একাগ্রচিত্তে তোমাকে রাবণের নিধনে অগ্রণী হতে হবে। রাবণের মতো বীরও পৃথিবীতে বিরল।'

বিভীষণের বাক্যে রামের সুন্দর আননে এক অদ্ভুত স্বর্গীয় আভা বিকশিত হয়। এইবার রামের আত্মোপলব্ধির পালা। এই রাবণ বধই বোধহয় সেই নির্দিষ্ট কাজ, যা রামকে করতেই হবে। তবে, তাই হোক। রাবণ বিশ্ববিজয়ী বীর, সে যদি রামের হাতে মৃত্যু কামনা করে, তবে তাই হবে। বিধির বিধান কে লংঘন করতে পারে! না হলে, রাবণই বা তস্করের মতো সীতাকে হরণ করবে কেন।

মনের চিন্তা অপসৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে, রামের বদনমণ্ডল এক উজ্জ্বল কান্তিতে উদ্ভাসিত হলো। হনুমান এসে রামের পদতলে প্রণত হলেন। সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্ববান প্রভৃতি জোড় করে রামের সম্মুখে অপেক্ষা করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ ও বিভীষণ এসে রামের দুপাশে দাঁড়ালেন।

সকলের প্রতি দয়ার্দ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রাম দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'আগামীকাল সূর্যাস্তের আগেই রাবণকে বধ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি। সে আমাদের মহাশত্রু। সে তার রাক্ষস প্রবৃত্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে পৃথিবীতে অনেক পাপ কাজ করেছে। সে জানকীকে হরণ করে আমাদের দুঃখের সাগরে নিক্ষেপ করেছে। বিভীষণকে অন্যায়-ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছে। কোন দয়া অথবা ক্ষমা সে পেতে পারে না। অতএব, তার জীবননাশের আর বিলম্ব নেই। তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তীব্রভাবে

শত্রুকে আক্রমণ করবে এবং রাক্ষসসৈন্যকে নিধন করবে। আমি একাকী রাবণের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হবো। সেই সংগ্রামে হয় রাবণ জয়ী হবে, না হয় আমি জয়ী হবো।'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

—'আজ চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তোমরা সকলে রাবণের বিক্রম লক্ষ্য করবে। আমি, রাম ও লক্ষ্মণকে নির্মমভাবে আক্রমণ করবো। শুনেছি রাম ভীষণ দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। জনস্থানে চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে সে একাই শেষ করেছে। সে যাই হোক, আমিও ত্রিভুবনজয়ী রাবণ, আমিও জানি কিভাবে শত্রুকে নিধন করতে হয়। আমিও স্বজন বধের প্রতিশোধ নিতে জীবন পণ করে যুদ্ধ করবো। আজ যুদ্ধের শেষে হয় রাম নয় রাবণ ধরা থেকে বিদায় নেবে।' রাবণ রাক্ষসনায়কদের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করলেন।

রাবণ এই সংকল্প নিয়ে যুদ্ধে চলেছেন, সঙ্গে অগণিত সৈন্য। রাক্ষস চতুরঙ্গ বাহিনী উন্মত্ত হুংকারে রণক্ষেত্রে ধাবিত হয়েছে। উচ্চগ্রামে রণবাদ্য বাজছে। কামরূপী রাক্ষসেরা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে জাগরিত করে আগের বিপর্যয়ের শোধ নেবার চেষ্টা করছে।

দুই সৈন্যদল উন্মাদ কোলাহলে পরস্পরকে আক্রমণ করছে, আঘাত করছে তীক্ষ্ণ অস্ত্র, হত্যা করছে নির্দয়ভাবে। বানরেরা বৃক্ষ ও শিলা নিয়েই আক্রমণ করছে। রণক্ষেত্রে নিহতদের দেহ থেকে নির্গত রুধিরস্রোত তীব্রভাবে বেলাভূমির অভিমুখে প্রবাহিত হচ্ছে। রাক্ষসাধিপতি রাবণ বানরদের আক্রমণে বিচলিত না হয়ে, আপন বিক্রমে শত্রুসৈন্য নিধন করছেন।

বানরেরা এই দুর্জয় বীরত্বের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এই অবিশ্বাস্য ক্ষমতার অধিকারী রাবণের যে তীব্র ও দ্রুত আক্রমণ-পদ্ধতি, তার সঙ্গে সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতি বানরনায়কেরা পরিচিত ছিলেন না। রাবণ শত্রুর শিবিরে ত্রাসের সঞ্চার করে, অত্যন্ত দুর্ধর্ষভাবে তাঁর রণনৈপুণ্যের স্বাক্ষর স্থাপন করলেন।

রাম এতক্ষণ রাক্ষসসৈন্য বধেই নিযুক্ত ছিলেন। লক্ষ্মণ ও বিভীষণ রামের পৃষ্ঠ রক্ষা করে শত্রুকে আক্রমণ করছিলেন। রাবণের ধ্বংস-তাণ্ডবকে প্রতিরোধ করতে লক্ষ্মণ রাবণের সম্মুখীন হলেন।

রাবণ লক্ষ্মণকে তাচ্ছিল্যসহকারে বললেন, 'আমি তোমার জ্যেষ্ঠ রামের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে আগ্রহী। তুমি তো আমার কাছে শিশুমাত্র। তোমাকে এখনই শমন-ভবনে পাঠিয়ে, তারপরে রামকে শেষ করবো। আমাদের স্বর্ণলংকায় অসভ্য বানরদের সঙ্গে এসে যুদ্ধ করার সাধ তোমাদের চিরতরে মিটিয়ে দেবো।'

লক্ষ্মণ উত্তর প্রদান করার আগেই রাবণ তাঁর সারথিকে রামের সম্মুখে রথ নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। রাম দূর থেকে রাবণকে লক্ষ্য করে হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। রাবণ রামকে দেখেই প্রথমে এক বিদ্রূপ-বাণ ত্যাগ করলেন।

—'রাম, তুমি রাজপুত্র হলেও, পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত এক পথের ভিখারী। তোমার দুঃসাহস ও দুর্বুদ্ধিকে খর্ব করতেই আমি তোমার পত্নীকে লংকায় নিয়ে এসেছিলাম।

তুমিও আমার সঙ্গে চরম শত্রুতা করবার জন্য বানর সেনা নিয়ে সমুদ্র লংঘন কোরে লংকাপুরী অবরোধ করেছ। অসভ্য ও বর্বর বানরদের বলে বলীয়ান হয়ে, আমার ভ্রাতা, পুত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি এবং অসংখ্য সৈন্য বধ করেছ। আজ তার প্রতিশোধ আমি নেবোই। দেখবো, কত বড় যোদ্ধা তুমি।'

রাবণের অবজ্ঞাপূর্ণ বাক্যে কৌতূহল অনুভব কোরে রাম ঈষৎ হাস্য সহকারে বললেন, 'দুবৃত্ত রাবণ, তুমি শুধু আমার পত্নীকেই হরণ করো নি, তুমি আর্যদের সঙ্গে ভীষণ শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছ। তোমার আদেশেই ধর্মহীন কামাসক্ত রাক্ষসেরা ব্রাহ্মণদের যাগ-যজ্ঞ পণ্ড করেছে, আর্য উপনিবেশগুলিকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। তোমরা অসভ্য, বর্বর, অধার্মিক ও নীতিজ্ঞানহীন। বানরেরা তোমাদের রাক্ষসদের অপেক্ষা অনেক মার্জিত, অনেক হৃদয়বান। তারা আর্যদেরই সাথী হয়েছে। তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ মৈত্রীর বন্ধন। তোমরা দুরাচার ও দুর্বিনীত। তোমাদের ধ্বংস করে আমি লংকায় নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবর্তন করবো, যাতে এখানকার অধিবাসীদের হৃদয়ের পরিবর্তন হয় এবং তারা মানবিক ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়। আমি বিভীষণকে লংকার অধীশ্বর করে দেশে ফিরে যাবো।'

—'সেই বিশ্বাসহন্তা বিভীষণই এখন তোমার প্রধান সহায়, মনে হচ্ছে! রাম, লংকাকে গ্রাস করা যত সহজ ভাবছো, ততো সহজ কিন্তু নয়। শীঘ্রই সেটা ভালো করেই বুঝতে পারবে। আগে আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করো, তবে সেই দেশদ্রোহী বিভীষণকে রাজা করার স্বপ্ন দেখবে, লংকায় আর্যবিজয়ের দিবাস্বপ্ন দেখবে। রাম, তোমার স্বপ্ন শীঘ্রই দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে। তুমি রাবণের বিক্রমের পরিচয় এখনও পাও নি, তাই তুমি সামান্য মানুষ হয়েও স্বর্গ, মর্ত, পাতালবিজয়ী রাক্ষসেশ্বর লংকাপতি রাবণের ঘরে আগুণ জ্বালাতে এসেছ। আর নয়, অনেক ক্ষতি করেছ তুমি আমার। এখন এসো, যুদ্ধ করো। পরিচয় দাও তোমার বীরত্বের। রাম, আমি তোমাকে বলছি যে যদি প্রাণ নিয়ে শেষ পর্যন্ত পালাতে পারো তুমি, তবে তুমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে জানবে।'

রাবণ এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শর ত্যাগ করলেন। রাম লক্ষ্য করলেন যে অসামান্য লঘুহস্ততার সঙ্গে ধনুকে বাণ সংযোজন করে জ্যা আকর্ষণ করছেন রাবণ। শত্রুর অমানুষিক শক্তি রামকে মুগ্ধ করে। এই সিংহহৃদয় বীর যোদ্ধা স্বজন-বিয়োগের অপরিসীম বেদনা হৃদয়ে অনুভব করেও, কেমনভাবে স্থির চিত্তে এবং অসীম আত্মপ্রত্যয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে শত্রু নিধন করছে! এই বিরাট ব্যক্তির নিকট সুখ ও দুঃখ কি সমান! রাক্ষসরাজ রাবণ সত্যই জ্ঞানী। রাম কেবল রাবণের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও বিস্ময়কর প্রতিভার কথা চিন্তা করেন।

রাবণের আস্ফালনকে রামও অবিচলিত চিত্তেই গ্রহণ করলেন। রথোপবিষ্ট রাবণ রথহীন রামকে শরাঘাতে জর্জরিত করলেন। ইতিমধ্যে রণক্ষেত্রে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে সারথিযুক্ত এক রথ রামের সম্মুখে উপস্থাপিত হলো। সকলেই রাবণের রাক্ষস মায়াকেই এই রথের জন্য দায়ী করলেন।

সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতি অনেকেই রামকে এই রথটি বিধির দান বলেই গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। এই রথের সাহায্যে রামের পক্ষে রাবণের আক্রমণ প্রতিহত করা অনেক সহজসাধ্য হবে। রাবণ এই অলৌকিক দৃশ্যে বিস্মিত হয়ে মনে মনে রামের মাহাত্ম্য কীর্তন করলেন।

রাম এবং রাবণের দ্বৈত যুদ্ধের মধ্যে দুজনের অস্ত্র-নৈপুণ্য, আক্রমণ-বৈচিত্র্য এবং প্রতিরোধ-ক্ষমতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হলো। রাক্ষস ও বানর দু' পক্ষের সৈন্যেরা এই দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অদ্বিতীয় বীরের যুদ্ধ দেখে স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রস্তরমূর্তির মতো নিশ্চল। সেই বিস্ময় ও নিস্তব্ধতা যেন সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে এক ভয়ংকর সংগ্রামের অনিবার্যতাকে সূচনা করছে।

ইত্যবসরে রাবণ অতর্কিতে লক্ষ্মণের উপর এক শক্তি নিক্ষেপ করলেন। লক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে ভূতলশায়ী হলেন। রাম তখন সুগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদ, বিভীষণ প্রভৃতিকে লক্ষ্মণের সেবা ও রক্ষণে নিযুক্ত করে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

রামের সেই অমিত তেজ এবং সংহারশক্তি রাবণের পক্ষেও অত্যধিক। রাবণ রামের একটি বাণে বিদ্ধ হয়ে হতচৈতন্য হলেন। রাবণের সারথী দ্রুতবেগে রথকে স্থানান্তরে চালিত করলো। বানর সেনার জয়ধ্বনিতে যুদ্ধক্ষেত্র শব্দমুখর। নায়কের পরাজয়ে রাক্ষসসৈন্য নৈরাশ্যগ্রস্ত ও ভীত।

বীর জাম্ববান পুনরায় হনুমানকে হিমালয়পর্বত থেকে মহৌষধি আনবার জন্য অনুরোধ করলেন। রাম বানরদের সহায়তায় লক্ষ্মণের বক্ষ থেকে শেল উৎপাটিত করলেন। লক্ষ্মণের বক্ষ থেকে নির্গত তপ্ত শোণিতধারায় রণক্ষেত্র সিঞ্চিত হলো।

অশ্রুপূর্ণ নয়নে রাম সকলকে বললেন, 'আমি হয়তো এক পত্নীকে হারিয়ে অন্য পত্নীও পেতে পারি, অন্য বন্ধুও পেতে পারি, কিন্তু লক্ষ্মণের মতো এমন ভাই কোথাও পাবো না। হায়, লক্ষ্মণ যদি জীবিত না থাকে, তবে আমার আর বৈদেহীকে উদ্ধার করেই বা কি হবে! লক্ষ্মণ সঙ্গে না থাকলে, আমি অযোধ্যায় ফিরতে পারবো না। সুমিত্রা মাতাকে আমি কি বলে প্রবোধ দেব? বধূমাতা ঊর্মিলাকেই বা কেমন করে মুখ দেখাবো! হায়, লক্ষ্মণের প্রাণবায়ু নির্গত হবার সময়ে আমার প্রাণও বিনষ্ট হলো না কেন!'

রামকে সান্ত্বনা প্রদান করে বিভীষণ, সুগ্রীব, জাম্ববান সকলেই একবাক্যে বললেন যে লক্ষ্মণের মৃত্যু হয় নি, শেলবিদ্ধ হয়ে তিনি অজ্ঞান হয়েছেন। বিশল্যকরণী আনীত হলেই লক্ষ্মণ আরোগ্য লাভ করবেন।

* * * *

রাক্ষসরাজ রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি শেল নিক্ষেপ করে যেমন শত্রুসংহারের বাসনা করেছিলেন, তেমনই রামের অলৌকিকত্ব পরীক্ষা করতেও উদগ্রীব হয়েছিলেন। লক্ষ্মণকে ভূতলশায়ী দেখেও রাম অবিচলিতচিত্তে রাবণকে বিনাশ করতে সচেষ্ট হলেন এবং রামের সেই আক্রমণ রাবণের নিকট প্রায় অসহ্য হলো। রাক্ষস রাবণ এক সামান্য মানুষের অসাধারণ মনোবল, তেজ এবং প্রিয়তম ভ্রাতার মর্মান্তিক আঘাত সত্ত্বেও, রণোন্মাদনা লক্ষ্য করে স্তম্ভিত হলেন।

সারথিকে তিরস্কার করলেন রাবণ, তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসৃত করার জন্য। হয়তো রাবণ প্রথমে ভেবেছিলেন যে রাম যখন আহত শত্রুর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ যুদ্ধে শৈথিল্য প্রকাশ করবেন, রাবণ সেই অবসরে শত্রুকে চরম আঘাত করবেন। রাক্ষসনায়ক রাবণের উগ্র ও স্বার্থসর্বস্ব মানসিকতায় এই চিন্তা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু এই মুহূর্তে রাবণ করুণাপ্রবণ ও মহানুভব রামের প্রতি এতই ক্রূর ও হীন আচরণ কল্পনাই করতে পারেন না। রাবণ তখনও আপন রণক্লান্ত এবং স্বজন-বিয়োগে

দুর্বল হৃদয়ে এই অভিনব শত্রু এবং তার সঙ্গে এই স্বেচ্ছাকৃত শত্রুতার কথাই চিন্তা করছিলেন। সেই চিন্তাস্রোতে প্রবাহিত হয়ে তপঃসিদ্ধ রাবণের হৃদয় যুদ্ধের অন্তিম লগ্নে এক আকাঙ্ক্ষিত পরিণতির কল্পনায় চমৎকৃত হয়েছিল। সেই কারণে রাবণের বাহ্যজ্ঞান সাময়িকভাবে লুপ্ত হয়েছিল।

তাই রাবণ তাঁর সারথির উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট। ইতিমধ্যে বানরসৈন্যের হুঙ্কার ও জয়ধ্বনি রাবণের কর্ণে প্রবেশ করেছে। রাবণের হৃদয়ে আর সন্দেহের অবশিষ্ট নেই যে রাম ও লক্ষ্মণ অপরাজেয় ও অবধ্য। যদি তাইই না হয়, তবে কোন সাধারণ মানুষ, সে যত বড় ক্ষত্রিয় বীরই হোক না কেন, এই রাম অথবা লক্ষ্মণের মতো বার বার মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছেও পুনরায় জৈব জগতে ফিরে আসতো না। তবে কি— তবে কি রাম সেই অনির্বচনীয় ও অমোঘ নিয়তি যাকে রাবণ অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্তুতি জানিয়েছেন, যার দেখা চেয়েছেন, যার সঙ্গে যুদ্ধ করে মরণ কামনা করেছেন!

রাবণের হৃদয়ে মুক্তির এক তীব্র উন্মাদনা। এতদিন পরে রাক্ষসপতি রাবণের কর্ণে মোক্ষের আহ্বান পৌঁছে গেছে। ত্রিভুবনজয়ী রাবণের ভোগের চূড়ান্ত হয়েছে। আর নূতন করে পাবারও কিছু নেই। রাবণের তপস্যা এবং সাধনা রাবণের হৃদয়ে সময়ে সময়ে যে আত্মসমীক্ষার তীব্র বাসনার উদ্রেক করেছে, রাবণের রাক্ষসসত্তা এতদিন সেই বাসনাটিকে হৃদয়ের সচেতন স্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করতে দেয় নি।

কিন্তু রাবণের রাক্ষসত্ব, কামনার ব্যর্থ অনুভূতিতে এবং প্রবৃত্তির শূন্যতার উপলব্ধির মধ্যে, তার কঠিন নির্মোকটি চিরতরে পরিত্যাগ করেছে। রাবণের হৃদয়ে আজ ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করার জন্য অপূর্ব ব্যাকুলতা। ভ্রাতা বিভীষণই সেই গোপন সূত্রটির সন্ধান প্রদান করেছে তার নিজের হৃদয়ের বিষ্ণুভক্তির ফল্গুধারার আবিষ্কারের মধ্যে। বিভীষণ তো রাবণের মধ্যেও সেই পূতধারাকে প্রবাহিত করার কম চেষ্টা করে নি! বিভীষণ তো আর্যদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের কথা বার বার বলেছে। বিভীষণ লঙ্কার উপকারক, রাবণের উপকারক। বিভীষণকে বিশ্বাসঘাতক, স্বজনদ্রোহী বললে অন্যায় হবে, অধর্ম হবে!

লক্ষ্মণের আরোগ্যলাভের সংবাদে বিচলিত না হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণ সারথিকে যুদ্ধক্ষেত্রে রথ চালনা করতে আদেশ করেন। এদিকে বিভীষণের সঙ্গে পরামর্শ শেষ করে রাম যোগ্য বৈরী রাবণের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। বানরসৈন্য যথা রীতি দুর্বার গতিতে রাক্ষসদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। ক্ষণিক বিশ্রামের পরে যুদ্ধের গতি এবং তীব্রতা ভীষণভাবে বর্ধিত হয়েছে।

দূর থেকে রথোপবিষ্ট রামকে দেখে রাবণের মনে এক রাজর্ষির কল্পনা জাগে। যে ব্যক্তি অক্লেশে বিশাল কোশলরাজ্যের ভূপতি হয়ে অশন, ব্যসন ও ভোগে কাল অতিবাহিত করতে সক্ষম হতো, সে বিমাতার গর্হিত ও অসঙ্গত আচরণকে স্বীকার করে নিয়ে পিতৃসত্য পালনের জন্য এত ক্লেশ, এত দুঃখ, এত মর্মযন্ত্রণা সহ্য করলো! এই ব্যক্তি তো কর্মবিমুখও নয়। অনেক রাক্ষস বধ করে আর্যদের প্রতিপত্তি ও অধিকার বিস্তারে কৈশোর থেকে তৎপর। তবে, এতো এক কর্মযোগী, ত্যাগ ও ধর্মের এক মহান প্রতিমূর্তি!

ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয় রাম ও রাবণের মধ্যে। এই দুই শ্রেষ্ঠ বীরের এ যে চূড়ান্ত যুদ্ধ এবং জয় ও পরাজয়ের চরম মীমাংসা যে এইবার হবে, সেই কথা বিভীষণ, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান সকলেই উপলব্ধি করেন।

রাম যে বাণই ত্যাগ করেন, রাবণ সবই প্রতিহত করেন। গদা, মুষল, পরিঘ ও শরের শব্দে সমুদ্র, আকাশ, বাতাস ক্ষুব্ধ হলো। অদূরে পর্বত ও উপবন কম্পিত হতে লাগলো। সমরাঙ্গনে দুই প্রতিপক্ষ সেনার. চক্ষে ও মুখে বিস্ময় ও উত্তেজনার অভিব্যক্তি—রাম হত হয় কি রাবণ হত হয়। কেউই বীরত্বে কারও অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নয়।

সেই মুহূর্তে রাবণ ইষ্টদেবীকে স্মরণ করেন। মা জগদম্বে, মহামায়া, আমার চোখের ও মনের মায়ার আবরণ ভেদ করো। আমরা রাক্ষস-মায়ায় বাস্তবকে আবৃত করি, তাই বাস্তব ও সত্য আমাদের কাছে চিরদিন মিথ্যা থেকে গেছে। পরকে বঞ্চনা করেছি, নিজেরা বঞ্চিত হয়েছি। মা, এই প্রপঞ্চ থেকে আমার হৃদয়কে অনাবৃত করো, আমাকে মুক্ত করো। যে মায়া আমার সামনে থেকে ব্রহ্মকে অন্তরালে রেখে দিয়েছে, সেই মায়া যদি রামের ভার্যা সীতা হয়, তবে তাকে অপসৃত করে রামের প্রকৃত স্বরূপটিকে উপলব্ধি করার সুযোগ দাও।

মহাশক্তির উপাসক রাবণ অসামান্য পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। রাম নির্বিকার-ভাবে রাবণের সকল কৌশল ও সকল নৈপুণ্যকে ব্যর্থ করছেন। রাম চিন্তা করেন, কি অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী এই শত্রু! কি বিরাট মূল্য সে ইতিমধ্যেই প্রদান করেছে এই শত্রুত্ব অক্ষুন্ন রাখার জন্য। তথাপি রাবণের ভ্রূক্ষেপ নেই, সমান তেজে যুদ্ধ করছে, যা পুরুষকার ও ক্ষাত্রতেজের চরম নিদর্শন। কিন্তু রাবণ তো অসভ্য রাক্ষস, ক্ষত্রিয় নয়। না, বিভীষণের জ্যেষ্ঠ রাবণ কখনও অসভ্য রাক্ষস নয়, রাক্ষসের নির্মোকের মধ্যে রাবণ এক মহাবীর, মহাসাধক! রাবণ ব্রহ্মনিষ্ঠ না হলে এই গভীর আত্মপ্রত্যয় ও অসীম ধৈর্যের অধিকারী হতে পারে না। রামের ক্ষত্রিয়ত্ব সার্থক, রামের অস্তিত্ব সার্থক, রামের আত্মোপলব্ধি সার্থক যে রাবণের মতো বৈরীর সঙ্গে তাকে শক্তি পরীক্ষা করতে হয়েছে।

বিভীষণ রামের নিকটবর্তী হয়ে কণ্ঠে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করে বললেন, 'ক্ষত্রিয়-প্রবর, তুমি তো অক্ষয় শক্তির আধার। তবে তুমি কেন রাবণকে বধ করতে সক্ষম হচ্ছ না!'

রাবণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করতে করতে রাম সপ্রতিভভাবে উত্তর দিলেন, 'রাবণানুজ বিভীষণ, আমি যাইই হই, তুমি তো তোমার জ্যেষ্ঠকে ভালোভাবেই জানো। সে কি সাধারণ শত্রু? দেখছো তো, আমি শত চেষ্টাতেও তাকে নিধন করতে পারছি না। রাবণ আমাকে নিধন করতে পারবে না, আমি জানি। কিন্তু, বলো আমি তাকে কেমনভাবে বধ করতে পারি?'

অদূরে রাবণ বিভীষণকে রামের সন্নিধানে লক্ষ্য করে অন্যমনস্ক হলেন। রাবণের চিত্ত বিগলিত হলো, বিভীষণের প্রতি নিজের অন্যায় আচরণের কথা চিন্তা করে। রামানুরাগী বিষ্ণুভক্ত বিভীষণ কি রাবণকে কোনদিন ক্ষমা করবে! কিশোর তরণীসেনকে যুদ্ধে অনিবার্য মৃত্যুর মুখে প্রেরণ করার অপরাধ কি কখনও বিভীষণ মার্জনা করবে!

এদিকে রাবণ রথের উপর প্রতিজ্ঞা ও সংকল্পের প্রতিমূর্তির মতো অবস্থান করছেন। বিভীষণের চিত্তে অভিমান উদ্বেলিত হয়। যদিও দুই ভ্রাতা আজ দুই মেরুর প্রান্তে রয়েছেন, তবুও বিভীষণ জ্যেষ্ঠের মুখের গম্ভীর ভাব দেখে তাঁর মনের শোক ও দুঃখের পরিমাপ গ্রহণ করতে পারেন। রাবণের মুখমণ্ডলের দম্ভের অভিব্যক্তি

আজ অন্তর্হিত হয়েছে। বিভীষণ লক্ষ্য করেন রাবণের বদনে এক দার্শনিক দীপ্তি ও স্বর্গীয় দ্যুতি।

জ্যেষ্ঠের প্রতি হৃদয়ের এই দুর্নিবার আকর্ষণকে অতি কষ্টে অতিক্রম করে বিভীষণ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'রাম, এইবার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে রাবণের মর্মস্থল বিদ্ধ করো। তবেই রাক্ষসাধিপতির মৃত্যু হবে।'

এ'কথা রাবণের কর্ণে প্রবেশ করলো না। রাবণ এখন ভিন্ন জগতে প্রবেশ করেছেন। রাবণের হাত ধনুকের জ্যা আকর্ষণ করছে। কিন্তু রাবণের নয়ন দুটি অন্তরের ভাবাবেগে মুদ্রিত হয়েছে। মানসচক্ষে রাবণ দেখছেন রামের মুখের স্নিগ্ধ হাসি ও স্বর্গীয় জ্যোতি। সেই রামের মুখচ্ছবিই হৃদয়মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়ে এখন রাবণের জ্ঞানী সত্তাটিকে অতিক্রম করে যোগী সত্তাকে গ্রাস করছে। ভক্তি না হলে কি মুক্তি হয়?

রাবণ চক্ষু উন্মীলিত করে এক ভীষণ-দর্শন তীক্ষ্ণ অস্ত্র রামের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। রাম অনায়াসেই সেই অস্ত্র খণ্ডন করলেন। তারপরে সেই অভীপ্সিত শরটি অভিমন্ত্রিত করে এবং রাবণের বিনাশ কামনা কোরে ধনুকে সংযোজন করলেন। রাবণ এখন নির্নিমেষ নয়নে রামকে নিরীক্ষণ করছেন। রাবণের এই নিষ্ক্রিয় ভাবটি লক্ষ্য করে রথের সারথি বিস্মিত। কিন্তু রাবণের আগের তিরস্কারের কথা স্মরণ কোরে, সারথি রথকে অপসৃত করলেন না।

রামের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শর অপরাহ্নশেষের আকাশকে আলোকিত করে নিম্নগামী হলো এবং সম্মুখে রথের উপর উপবিষ্ট রাবণের বুকে এসে বিদ্ধ হলো। রাবণ নিজের জীবনের অন্তিম লগ্ন উপস্থিত হয়েছে উপলব্ধি করে করযোড়ে ইষ্টকে স্মরণ করলেন। চার দিকে রাক্ষসসৈন্যের হায় হায় রব ক্ষীণভাবে রাবণের শ্রবণে প্রবেশ করলো। বক্ষে অসহ্য যন্ত্রণা রাবণের, কিন্তু হৃদয় মধুরতম অনুভূতির স্পর্শে শান্ত, সমাহিত। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন রাবণ, 'বিভীষণ, ভাই, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'

আর কিছু উচ্চারণ করার শক্তি রাক্ষসরাজের নেই। সেই বিরাট এবং অবশ দেহ বিমূঢ় সারথীর যত্ন সত্ত্বেও রথচ্যুত হয়ে যুদ্ধভূমিতে পতিত হলো। মুমূর্ষু রাবণ একবার প্রায়-অন্ধকার আকাশের দিকে অক্ষম দৃষ্টি প্রসার করলেন। বক্ষের ক্ষত থেকে প্রবলবেগে শোণিতস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে।

রাবণের জীবনীশক্তি নিঃশেষিতপ্রায়। জ্যোতিহীন চক্ষু দুটি ধীরে ধীরে মুদ্রিত হয়ে আসছে। সেই শেষ দৃষ্টিতে মহামায়া নয়, শুধু রামের নয়নাভিরাম মুখচ্ছবি। তা হলে রামই সত্য, অন্য সবই মিথ্যা! রাবণের প্রাণবায়ু নির্গত হলো। চক্ষু দুটি চিরতরে মুদ্রিত হলো।

রাবণের পরাজয়ে ও মৃত্যুতে রামকে যেন আশীর্বাদ জানিয়ে অস্তপ্রায় দিনমণি একবার উজ্জ্বল আভায় বিকশিত হলেন। আগতপ্রায় সন্ধ্যার ঘনায়মান আঁধার ক্ষণিকের জন্য আলোর স্পর্শে চঞ্চল হলো! সমগ্র প্রকৃতি যেন রামের মহিমা ঘোষণায় বাঙ্ময় হলো। অদূরে লংকাপুরীর শীর্ষে রাবণের রক্ত পতাকা যেন সূর্যের শেষ রশ্মিকে ব্যঙ্গ করতে প্রবৃত্ত হলো।

* * * *

রাবণের পতনের পরে রাক্ষসদের বিকট আর্তনাদে লংকাপুরী কম্পিত হলো। রাবণের পরাজয় ও মৃত্যু রাক্ষসদের নিকট অবিশ্বাস্য ছিল। কিন্তু আজ এই বিরাট মহীরুহের উৎপাটনে রাক্ষসদের মনে বিস্ময়, ভয় ও দুঃখ।

বানরদের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস ও জয়ধ্বনির কোলাহল সমুদ্রের নীল জলে যেন এক সংকেতময় হিল্লোলের সৃষ্টি করলো। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল রাবণের মৃত্যুতে সচকিত, স্তম্ভিত।

রাম রাবণকে বধ করে হর্ষ ও বিষাদের দোলায় দোলায়িত। এইবার জানকীর উদ্ধার সম্ভব হবে। লক্ষ্মণ রামের পদতলে পতিত হয়ে জ্যেষ্ঠের প্রতি সপ্রশংস সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতি বানর নায়কগণ এবং জাম্ববান রামের পদ বন্দনা করেন। রাবণের মতো দুর্ধর্ষ বৈরী যে ব্যক্তি পরাজিত করতে সক্ষম, না জানি সে কত শক্তিশালী, কত মহৎ, কত বিরাট! একি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব!

রাম সকলের সঙ্গে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে লংকা বিজয়ের আনন্দোৎসবের সূচনা করেন। কিন্তু বিভীষণকে এই মুহূর্তে নিকটে না পেয়ে রাম বিস্মিত বোধ করলেন। রাম লক্ষ্য করলেন যে শোকে মুহ্যমান বিভীষণ রাবণের মৃতদেহের নিকট ভূতলে পতিত হয়ে তীব্রভাবে রোদন করছেন।

বিভীষণের মুখে বিলাপধ্বনি অবারিত গতিতে নির্গত হয়, 'হে আমার প্রণম্য জ্যেষ্ঠ, তোমার মৃত্যু আমার বক্ষে শেলের মতো আঘাত করেছে। তুমি তোমার অভীপ্সিত মুক্তি নিশ্চয়ই লাভ করেছ। কিন্তু, রামের সঙ্গে সন্ধি করলে, তোমার মুক্তি বিলম্বিত হলেও, বিঘ্নিত হতো না। তুমি অকাল মৃত্যু থেকে রক্ষা পেতে। এখন আমি রাণী মন্দোদরীকে কি বলে সান্ত্বনা দেব! রামের মিত্র হয়ে থাকলে, তুমি লংকেশ্বরই থাকতে। তুমি রাক্ষসদের সুসংস্কৃত করতে, ধর্মাশ্রয়ী করতে, বেদানুগামী করতে। হায়, হয়তো এই কঠিন কর্তব্য আমাকেই পালন করতে হবে। কিন্তু আমি তা কোনদিনই চাই নি। তমি আমার কোন হিতকথাতেই কর্ণপাত করো নি। হায়, কেন তোমার সুমতি হলো না! যাই হোক, তুমি মুক্তি পেয়েছ, তুমি ব্রহ্মভূত হয়েছ। কিন্তু হতভাগ্য আমি, ব্রহ্মার বরে চিরজীবি। আমার কোন মুক্তি নেই!'

রাম ও লক্ষ্মণ, হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতির সমভিব্যাহারে রাবণের মৃতদেহের পাশে এসে উপস্থিত হয়ে নির্বাক বিস্ময়ে বিভীষণের বিলাপ শুনছিলেন। রাবণের মৃত্যুতে সব শত্রুতার অবসান হয়েছে।

বিভীষণকে পুনরায় আলিঙ্গন করে রাম মধুর কণ্ঠে বললেন, 'লংকাপতি, তুমি চিরজীবি হলেও, চিরকাল তুমি মানুষের সম্মান ও সম্ভ্রমের মধ্যেই অবস্থান করবে। তুমিই রাবণের যোগ্য ভ্রাতা এবং লংকার সিংহাসনের একমাত্র উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। তুমি শোক ত্যাগ করো। এসো, আমরা তোমার অভিষেক সম্পন্ন করি। নৃপতিহীন লঙ্কায়, তোমার শিরে নৃপতির মুকুট স্থাপন করি।'

বিভীষণ রামের কথায় লজ্জিত বোধ করে অবনত মস্তকে অপেক্ষা করলেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ সমুদ্রের বারি বিভীষণের শিরে সিঞ্চন করলেন। সুগ্রীব রাবণের মস্তকচ্যুত মুকুটটি সযত্নে এনে বিভীষণের শিরে স্থাপন করলেন।

বিভীষণের অভিষেকের সংবাদে রাক্ষসেরা লংকাপুরী থেকে সমুদ্রসৈকতে এসে রামের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। সমবেত বানর ও রাক্ষস এক স্বরে বিভীষণের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। রাবণের শূন্যস্থান রামের নির্দেশে বিভীষণ পূর্ণ করলেন। দেখে

বিভীষণের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হলে রাম বিভীষণের হাত দুটি ধরে হর্ষশিনত, সেহ

কণ্ঠে বললেন, 'রাবণের সুযোগ্যা প্রধানা মহিষী মন্দোদরী পতি পুত্র সবই হারিয়েছেন। তিনি যেমন রূপবতী তেমনই গুণবতী। এ সবই বন্ধু বিভীষণ; তোমার কাছেই শোনা। আমার অনুরোধ যে সরমার মতো প্রেমময়ী পত্নী থাকা সত্ত্বেও, তুমি মন্দোদরীকে প্রধানা মহিষী রূপেই গ্রহণ করো।'

রামের অনুরোধ আদেশেরই তুল্য। বিভীষণ মনে মনে পুলকিত হন। লংকায় নূতন দায়িত্ব পালনে মন্দোদরীর মতো বুদ্ধিমতী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীর সাহচর্য ও পরামর্শ একান্তভাবে আবশ্যক। সরমা ভক্তিমতী ও বাধ্য, কিন্তু অত্যন্ত সরল ও শান্ত।

বিভীষণ এই নূতন পরিস্থিতির জন্য মনে মনে প্রস্তুত হন। স্মিত মুখে রামকে বলেন, 'রাম, লংকার এ সিংহাসন তোমার। তুমি যতদিন ইচ্ছা, ভোগ করো। বৈদেহীকে গ্রহণ করো, কিছুদিন বিশ্রাম করো, পরে দেশে ফিরে যেও। কিন্তু, তুমি তো এখনও তোমার প্রিয়তমা ভার্যার খোঁজ করলে না?'

বিভীষণের বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তরিক বচনে তৃপ্ত হয়ে রাম হাস্য সহকারে বললেন, 'মিত্র বিভীষণ, আমার প্রথম কর্তব্য রাবণের সৎকারের আয়োজন করা। সেই কারণে আমি তোমার অভিষেক সম্পন্ন করতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করি নি। এখন তুমি দেশের রাজা। তুমি দেশের প্রথা মতো সাড়ম্বরে এবং সসম্মানে তোমার জ্যেষ্ঠের দেহের সৎকার করো। এ যেমন জয়ী হিসেবে আমার বিজিতের প্রতি প্রধান কর্তব্য, তেমনই লংকার বর্তমান অধিপতি হিসেবে শেষ অধিপতির প্রতি তোমারও প্রধান কর্তব্য। এখন হনুমান তোমার অনুমতি নিয়ে লংকায় প্রবেশ করে বৈদেহীকে এই যুদ্ধ জয়ের সংবাদ দেবে এবং তিনি কি বলেন এসে আমাকে জানাবে।'

সীতার প্রতি রামের এই আপাতঃ ঔদাসীন্যের ভাবে কেউ কেউ দুঃখিত হলেও, রামের যুক্তিপূর্ণ উক্তির তাৎপর্য সকলেই উপলব্ধি করে রামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। রামের বাক্যের নৈতিকতা এবং বিচক্ষণতা বিভীষণকে অভিভূত করে। বিভীষণ পুত্র-শোক বিস্মৃত হয়ে, তাঁর বিরাট কর্তব্যের কথা চিন্তা করেন। রাবণ রাক্ষসদের শাসন করেছিলেন কিন্তু উন্নত করতে সক্ষম হন নি। বিভীষণকে রাক্ষদের রাক্ষসত্ব বর্জন করাবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। রামপ্রদত্ত আর্য ধর্ম, সংস্কৃতি লংকায় প্রবর্তিত করতে হবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

হনুমান রামের আদেশে বিভীষণের অনুমতি নিয়ে লংকাপুরীতে প্রবেশ করলেন। সেই সময় বিভীষণ সসংকোচে রামকে বললেন, 'হে লংকাবিজয়ী, এইবার আমাকে অনুমতি দাও, আমি লংকায় প্রবেশ করি। আমি আমার ধর্মপত্নী সরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। হায়, না জানি পুত্রহারা সরমা কেমনভাবে দিন যাপন করছে! রাম, রাবণের মহিষীদের এবং বিশেষভাবে প্রধানা মহিষী মন্দোদরীকে সান্ত্বনা দেওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন।'

উদারচরিত্র রাম বিভীষণের কুণ্ঠিত ভাব লক্ষ্য করলেন। বিভীষণের হাতদুটি ধরে অপরাধীর মতো বললেন, 'লংকেশ্বর, আমাকে ক্ষমা করো। তুমি নিজের কর্তব্যের

কথা মনে করে আমার কর্তব্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছ। তুমি এখনই তোমার পুরীতে যাও, গিয়ে তোমার সুযোগ্যা সহধর্মিনীকে পুত্রশোক ত্যাগ করে নূতন কর্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত হতে বলো। রাণী মন্দোদরী ও দেবী সরমাকে আমাদের সহানুভূতি ও সম্মান জানাও। লংকার পুরানো আত্মা আজ মুক্তির আনন্দে অন্তরীক্ষে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। সেই আত্মাই সুসংস্কৃত হয়ে লংকার নূতন দেহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে। রাবণের গৌরবোজ্জ্বল বিলাসনগরী তোমার শুদ্ধ অন্তঃকরণের সংস্পর্শে জ্ঞান, ধর্ম, শিল্প, কলা, স্থাপত্যের নব পীঠস্থান বলে পরিচিত হবে। তুমি এখনই যাও, বন্ধু। আর বিলম্ব কোরো না।'

রামের মধুর বচনে উল্লসিত হয়ে বানর ও রাক্ষস সম্মিলিত কণ্ঠে 'জয়, মহারাজ বিভীষণের জয়', 'জয় রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের জয়', বলে চিৎকার করলো। সমুদ্রের অনিলস্রোত, সৈকত ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সেই জয়ধ্বনিকে লংকাপুরীর মধ্যে নিক্ষেপ করে, দূরে পর্বতশীর্ষে প্রতিহত হলো।

রাবণের প্রাসাদে রাণী মন্দোদরী এবং অশোক বনে সীতা উভয়েই সেই ধ্বনির প্রভাবে শিহরিত হলেন। সরমা সীতার পদতলে মূর্ছিত হলেন।

বিভীষণ প্রথমেই প্রিয় পত্নী সরমার অন্বেষণে এসে অশোকবনে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে এই আনন্দঘন মুহূর্তে সরমা তার সখী সীতার নিকটে অবস্থান করবেন। বিভীষণ লক্ষ্য করলেন, হনুমান সীতার পদতলে প্রণত হয়ে করযোড়ে তাঁর বন্দনা করছেন। সরমা সংজ্ঞাহীনা।

বিভীষণ ধীর পদে সীতার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। বিভীষণের মাথায় রাজমুকুট শোভা পাচ্ছিল। রাক্ষসরাজ রাবণের রাজমুকুট বিভীষণের শিরে থাকায়, লংকার সকলেই বিভীষণের প্রতি সম্মানে ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত।

সীতা ইতিমধ্যে রাক্ষসীদের সহায়তায় সখী সরমার সংজ্ঞাহীন দেহটি সযত্নে ক্রোড়ে স্থাপন কোরে, তাঁর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিভীষণকে বিনয় ও সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ দেখে সীতা স্মিত মুখে বললেন, 'লংকাধিপতি, বীর হনুমানের মুখে রাবণের পরাজয়ের বার্তা আমি পেয়েছি। সেইসঙ্গে আপনার অভিষেকের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। সখী সরমা অদূরে জয়ধ্বনি শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পরমুহূর্তেই মূর্চ্ছিত হয়েছে। আহা, সখী তাঁর একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে যে গভীর বেদনা হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন, তার সাক্ষী এক আমি আছি। তথাপি তিনি নিজের সুখ ও শান্তির প্রতি লক্ষ্য না রেখেই, আমার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন, সব সময়ে আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। মহারাজ, আমার স্বামী যেমন লংকাবিজয়ের জন্য আপনার নিকট ঋণী, তেমনই আমিও আমার জীবনের অর্থ ভুলে না যাওয়ার জন্য সখী সরমার নিকট ঋণী।'

বিভীষণ সীতাকে বাধা দিয়ে তৎক্ষণাৎ বললেন, 'এসব কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না, দেবী। আমি রামের অনুরাগী ও ভক্ত। আপনার পতির অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় লাভ করে আমার জীবন সার্থক হয়েছে। লংকাজয়ের পরে তিনি আমার শিরে রাজমুকুট স্থাপন করেছেন। সুতরাং এই রাজ্য, ধন, সম্পদ সবই আপনাদের। আমি লংকার অধিবাসীদের অভিভাবক ও সেবক মাত্র।'

এই কথপোকথনের মধ্যে সরমা চক্ষু উন্মীলন করে, সম্মুখে বিভীষণকে দেখে ব্রীড়াবনত হয়ে বিভীষণের নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। সরমার শির অবনত, দেহ

কম্পিত, চক্ষু দুটি অশ্রুপূর্ণ। বিভীষণও দীর্ঘদিন পরে প্রিয় ভার্যাকে দর্শন করে আবেগে আচ্ছন্ন।

উভয়ের এই সঙ্কুচিত ভাব লক্ষ্য করে সীতা পরিস্থিতিকে লঘু করার প্রয়াসে মধুর হাস্য সহকারে বললেন, 'সখী সরমা, দেখ তোমার ধর্মপ্রাণ ও মহান পতিদেবতা আজ লঙ্কেশ্বরের বেশ ধরে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। এর অপেক্ষা আনন্দের ক্ষণ আর কি হতে পারে! সখী, হনুমান এসে আমাকে আমার পতিদেবতার লংকাবিজয়ের কথা জানিয়েছেন। আরও জানিয়েছেন যে তিনি আমাকে স্মরণ করেছেন। আমারও এর অপেক্ষা আনন্দের ও সুখের কি হতে পারে! এখন তুমি পতিকে সঙ্গে নিয়ে গৃহে যাও, পতিপ্রাণা মন্দোদরীকে সান্ত্বনা দাও, রাবণের অন্য মহিষীদের দুঃখ লাঘব করতে চেষ্টা করো।'

বিভীষণ এই মহীয়সী নারীর মহানুভবতার কথা চিন্তা করে চমৎকৃত হন। নিজের দুঃখকে বিস্মৃত হয়েও এবং এখনও পতির সাক্ষাৎ লাভ না করেও এই পতিব্রতা রমণী পতিবিয়োগবিধুরা অন্য নারীদের দুঃখে সংবেদনশীল ও দয়ার্দ্রচিত্ত। সেই নারীরা তাঁর অপহরণকারী দুরাত্মা রাবণের মহিষী! সীতার প্রতি শ্রদ্ধায় বিভীষণের হৃদয় অভিভূত হয়।

সীতাকে পুনরায় সম্মান জানিয়ে, বিভীষণ সরমাকে উষ্ণভাবে সম্ভাষণ করলেন, 'সরমা, তুমি এবং আমি চরম মূল্য দিয়েই আজ লংকাকে রাহুমুক্ত করেছি। চলো, জনকনন্দিনীর আদেশ পালন করি আমরা।'

বিভীষণ ও সরমা প্রাসাদের অভিমুখে প্রস্থান করলেন। হনুমান ব্যাকুল নয়নে সীতাকে লক্ষ্য করছিলেন। হনুমানের চক্ষে এবং মুখে আনন্দের উদ্ভাস। মাতা জানকী এইবার রামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হবেন। রাম সীতার মিলনের দৃশ্যটি দেখবার জন্য সকলের মতো হনুমানও উদগ্রীব হয়ে আছেন। ভক্ত হনুমান রাম ও সীতার অযোধ্যায় অভিষেকের পুণ্য দিনটির প্রতীক্ষায় আকুলিত প্রাণে অপেক্ষা করছেন।

হনুমানের মুগ্ধ দৃষ্টি সীতাকে বিস্মিত করে। সীতার হৃদয়ের করুণা এবং কৃতজ্ঞতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে হনুমানের প্রতি ধাবিত হয়।

চারুহাসিনী জনকনন্দিনী তাঁর দয়ার্দ্র দৃষ্টিতে হনুমানের প্রতি অন্তরের সকল স্নেহ ও মমতা উজাড় করে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'পবননন্দন, তুমি আমার হৃদয়ের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। তোমার ঋণ আমি এ জীবনে শোধ করতে পারবো না! তুমি আমার সন্তানতুল্য। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। অযোধ্যায় গিয়ে আমি তোমাকে সাধ্য মতো পুরস্কৃত করবো।'

সীতার আন্তরিকতাপূর্ণ প্রশস্তিতে বিগলিত হয়ে হনুমান ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'মাতা জানকী, পাপিষ্ঠ রাবণকে বধ করে যে তোমার উদ্ধার সাধিত হয়েছে, এইই আমার জীবনের চরম পুরস্কার। এখন বলো, দেবপ্রতিম প্রভু রামচন্দ্রকে আমি গিয়ে কি বলবো?'

হনুমানের বচনে তৃপ্ত হয়ে সজল নেত্রে সীতা বললেন, 'হনুমান, তুমি এখনই তোমার প্রভুকে বলো যে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। আর কাল-বিলম্ব না করে আমি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হতে আকাঙ্ক্ষা করি।'

অকস্মাৎ সীতার আননে বিষাদের ছায়া। সীতার বিষণ্ণ ভাবটি বিচক্ষণ হনুমানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না।

কিছুক্ষণ নির্বাক থাকার পরে হনুমান বললেন, 'মাতা জানকী, আমি একাই গিয়ে প্রভুকে তোমার মনোবাসনা নিবেদন করছি। আর একটু ধৈর্য ধারণ করো, অচিরেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।'

এই কথা উচ্চারণ কোরে, হনুমান এক লম্ফে প্রাচীরের উপর আরোহণ করলেন। তারপরে লংকার তোরণের পথে অদৃশ্য হলেন। সীতা পলকহীন নেত্রে হনুমানের গতিপথটি অনুসরণ করছিলেন। আকস্মিকভাবে সীতার বক্ষ থেকে এক দীর্ঘশ্বাস মুক্ত হলো।

* * * * *

সীতা কি তাঁর আসন্ন পরীক্ষার কথা মানস চক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন? অথবা সীতার মনে এক অনাগত লাঞ্ছনার পূর্ববোধ জাগরিত হয়েছিল!

রামের আজ্ঞায় বিভীষণ অত্যন্ত বিনীতভাবে সীতাকে বললেন, 'দেবী, আপনার পতি যেমন আদেশ করেছেন, তেমনভাবেই আপনার পতির সম্মুখে উপস্থিত হওয়া কর্তব্য। স্নানান্তে নতুন বসন পরিধান করুন, তারপরে শিবিকায় আরোহণ করে সমুদ্র-সৈকতে চলুন।'

বিভীষণ এতক্ষণে উপলব্ধি করলেন যে কেন সীতা তাঁকে আগে বলেছিলেন, 'রাক্ষসরাজ, আমি স্নান না করেই পতির দর্শন চাই।'

সীতা ম্লান মুখে আদেশ পালন করলেন। তাঁর বক্ষে হর্ষ ও বিষাদের সংমিশ্রণ। তাঁর অধীর চিত্ত স্বামীর মুখটি দেখার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু রামের এই নির্দেশ কেন! রাম কি তাঁর দেহকে কলুষিত কল্পনা করে এই বিধান দিয়েছেন? আশ্চর্য! সীতার পতিপ্রেমের কি কঠিন প্রতিদান! তবে রাম এত কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে লঙ্কা-অভিযান পরিচালনা করলেন কেন! রাবণকে তবে বধ করলেন কেন?

শিবিকায় আরোহণে সীতা গলিত শব সমাকীর্ণ ও রুধিরাক্ত রণক্ষেত্র অতিক্রম কোরে সমুদ্রবেলায় রাবণের প্রজ্জ্বলিত চিতার পাশে এসে উপনীত হলেন। হৃদয়ে এক অপূর্ব বিস্ময়, ভীতি ও চাঞ্চল্যের সমাবেশ।

কিন্তু রাক্ষস ও বানরদের কোলাহল, নায়কদের ঔৎসুক্য, লক্ষ্মণের প্রতীক্ষা কিছুতেই যেন রাম বিচলিত নন। রামের আননে উত্তেজনার চিহ্নমাত্রও নেই।

হনুমান রামের সম্মুখে অগ্রসর হয়ে করযোড়ে বললেন, 'প্রভু, মাতা জানকী গভীর উৎকণ্ঠায় আপনার জন্য শিবিকায় অপেক্ষা করছেন। আপনি সত্বর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।'

রাম হনুমানকে এক মধুর হাস্যে আপ্যায়িত করলেন। তিনি অদূরে স্থাপিত শিবিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

রামকে নির্বাক এবং অচঞ্চল লক্ষ্য করে বিভীষণ বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহজ সুরে বললেন, 'রাম, তোমার বৈদেহীর সঙ্গে নিভৃতেই মিলিত হওয়া উচিত। মিত্রবর, তুমি আর বিলম্ব কোরো না। আমি বৈদেহীর চক্ষে এবং মুখে যে করুণ প্রত্যাশার ভাব প্রত্যক্ষ করেছি, তার থেকে আমার মনে হয়েছে যে তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য তাঁর হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল। তুমি কেন লংকাপুরীতে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করলে না, আমি বুঝতে পারছি না!'

রাম স্মিত মুখে বললেন, 'রাক্ষসরাজ, আমি ক্ষত্রিয় হিসেবে আমার কর্তব্য পালন করেছি। আমি তোমাদের সকলের সহায়তায় আমার বংশের কলঙ্ক মোচন করেছি।

আমি রাবণকে তার পাপকাজের জন্য সমুচিত দণ্ড দিয়েছি। শুধু বৈদেহীকে উদ্ধার করাই আমার মুখ্য কর্তব্য ছিল না। তাই, আমি এখন চিন্তা করছি যে তাঁকে ঠিক কি ভাবে গ্রহণ করবো।'

হনুমান, সুগ্রীব অঙ্গদ প্রভৃতি বানর বীরগণ এবং লংকাধিপতি বিভীষণ, রামের এই ঋজু মনোভাবে এবং সীতার প্রতি অবহেলায় বিস্মিত বোধ করেন। এক তীব্র দুঃখ এবং সীতার প্রতি সহানুভূতি তাঁদের হৃদয়কে অধিকার করে। সীতার প্রতি সহমর্মিতায় হনুমান ও বিভীষণের চিত্ত বিগলিত হয়।

রামের এই আচরণ লক্ষ্মণের হৃদয়েও বিস্ময়ের সঞ্চার করে। এই মুহূর্তে রামকে অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় বলে মনে হয়, লক্ষ্মণের। কিন্তু তথাপি লক্ষ্মণ জানকীর অনুকূলে একটি কথাও উচ্চারণ করতে সক্ষম হন না।

উপস্থিত সকলের বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য কোরে, রাম শান্ত কণ্ঠে বিভীষণের উদ্দেশে বললেন, 'লংকেশ্বর বিভীষণ, তুমি সীতাকে শিবিকা থেকে পদব্রজে এইখানে নিয়ে এসো। তিনি সর্বসমক্ষে উপস্থিত হয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। তাঁর সতীত্বের প্রমাণ দিন। তিনি অনেকদিন রাবণের আশ্রয়ে ছিলেন, সুতরাং সাধারণ মানুষ তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হতেই পারে।'

রামের কঠোর মন্তব্য উপস্থিত সকলের মনেই আঘাত করে। কেমন করে বিভীষণ সীতাকে এমন কথা জানাবেন। অথচ এর কোন বিকল্প নেই। রামের মনোভাব অনমনীয় বলেই প্রতীয়মান হয়।

সীতা নত মুখে এবং বিষণ্ণভাবে রামের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। রাম লক্ষ্য করলেন সীতার মুখমণ্ডলে বিক্ষোভ ও অপমানবোধের চিহ্ন।

রাম সীতাকে সম্ভাষণ করার আগেই সীতা উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'আপনার আদেশ আমি শুনেছি। কোন রুচিজ্ঞানসম্পন্ন ও সভ্য ব্যক্তি তার পতিব্রতা স্ত্রীকে এমন লাঞ্ছনা করে না। আপনি আগে কেন আমাকে জানান নি যে আমাকে আপনি বর্জন করবেন? আমি বিনা দোষে শত্রুর কবলিত হয়েছিলাম। সে আমার গাত্র স্পর্শ করেছিল, কিন্তু আমার দেহ কলুষিত হয় নি। রাবণ আমার মনকেও অধিকার করতে পারে নি। আপনাকেই আমি মন ও প্রাণ সবই সমর্পণ করেছিলাম। এতদিন পরেও যখন আপনি আমার মনের কথা বুঝলেন না, তখন সেটা আমার দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি ভাবতে পারি! হায়, কেন আমার জন্ম হয়েছিল, আর কেনই বা আমি আপনার পত্নী হয়েছিলাম!'

রাম ক্রন্দনরতা সীতার মনের অবস্থা উপলব্ধি করেও নিজ সংকল্পে অনড় ও অটল। হনুমান এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মিনতির ভঙ্গীতে রামের মুখের প্রতি করুণভাবে দৃষ্টিপাত করলেন। লক্ষ্মণের মুখে ক্ষোভের স্বাক্ষর। পূজনীয় জ্যেষ্ঠের এই কঠিন দৃষ্টিভঙ্গীকে মনে মনে সমর্থন করতে সক্ষম হলেন না লক্ষ্মণ।

রাম স্পষ্টই সীতাকে বললেন, 'এই যুদ্ধের উদ্যম আমি শুধু তোমার জন্যই করি নি। আমি এই কাজ করেছি নিজের বিবেককে মুক্ত রাখতে, অপবাদ খণ্ডন করতে এবং আমার বিখ্যাত বংশের কলংক দূর করতে। তোমাকে গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, তোমার দেহ রাবণের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছে। তোমার প্রতি আমার আসক্তিও নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো। বিভীষণ, কি ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন যাকে হোক, পতিরূপে গ্রহণ করতে পারো।'

—'থামুন, থামুন, আর নিজেকে অত্যন্ত হীন বলে প্রতিপন্ন করবেন না। আপনি মহাবীর, মহাধার্মিক। কিন্তু, আপনি আপনার প্রিয়তমা ভার্যাকে দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। তাই নিতান্ত অক্ষম ও মূঢ়ের মতো অপহরণের সমস্ত গ্লানি তার স্কন্ধে চাপিয়ে দিচ্ছেন।'

রাম নির্বাক বিস্ময়ে সীতার অভিমান ও রোষে উদ্দীপ্ত আননটি নিরীক্ষণ করে প্রস্তরবৎ অবস্থান করছেন। সকলে গভীর উৎকণ্ঠায় একবার রাম ও একবার সীতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন।

সকলকেই নিস্তব্ধ ও বিমূঢ় করে সীতা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আমার নারীত্বের প্রতি এই অপমান কখনই সহ্য করবো না। দেবর লক্ষ্মণ, তুমি চিতা প্রজ্বলিত করো। আমি অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দেবো।'

সমুদ্রতীরের বায়ুস্রোত যেন ক্ষণকালের জন্য স্তিমিত হলো। চিতা প্রস্তুত হলে, সীতা দেবতা ও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে এবং রামকে প্রদক্ষিণ করে যুক্ত করে বললেন, 'যদি আমার হৃদয় চিরকাল পতির অনুগামী থাকে, যদি আমি স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ হই, তবে হে অগ্নিদেব, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।'

সীতার তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, মহার্ঘ বস্ত্র ও ভূষণে সজ্জিত দেহ ক্ষণকালের জন্য প্রজ্বলিত হুতাশনের গহ্বরে বিলীন হলো। রাক্ষস, বানর সমস্বরে হাহাকার করে আকাশ ও বাতাস বিদীর্ণ করলো। লংকাপুরীর রমণীগণ, যার মধ্যে রাণী মন্দোদরী এবং সরমাও উপস্থিত ছিলেন, ভয়ে এবং আর্ত স্বরে চিৎকার করে রোদন করতে লাগলেন। রাম, হয়তো মনে মনে অনুতপ্ত হয়ে এক দৃষ্টিতে সীতাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে চিতা থেকে ধূম নির্গত হয়ে লংকার আকাশকে আচ্ছন্ন করলো।

সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলেন যে জ্বলন্ত হুতাশনকে বিদীর্ণ করে বালার্কের মতো উজ্জ্বল মূর্তিমান এক পুরুষ অম্লান ও অক্ষতদেহ সীতাকে রামের হাতে সমর্পণ করে বললেন, 'রাম, এই তোমার ধর্মপত্নী বৈদেহী। রাবণের গৃহে বহু প্রলোভন জয় করেও তিনি তাঁর হৃদয় তোমাতেই নিবিষ্ট রেখেছিলেন। সীতা বাক্য, মন, বুদ্ধি বা চক্ষুর দ্বারা কখনও সৎ পথ থেকে ভ্রষ্ট হন নি। সুতরাং অপাপবিদ্ধা এবং শুদ্ধ-স্বভাবা মৈথিলীকে তুমি বিনা সংকোচে গ্রহণ করো।'

রাম দু'হাতে সীতাকে ধারণ করে গভীর আসক্তিতে তাঁর নিষ্পাপ মুখের প্রতি লক্ষ্য করলেন। সীতা দেখলেন রামের নয়নে অশ্রুধারা। সীতাও সর্বসমক্ষে রামকে আলিঙ্গন করে, আবেগ দমন করতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু অচিরেই সীতার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হলো। সীতা মূর্ছিতা হয়ে রামের পদতলে পতিত হলেন।

রাম গভীর প্রীতি এবং সহানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে সীতার সুকুমার দেহলতাটিকে যত্ন সহকারে উত্তোলন করলেন। সরমা এবং মন্দোদরী উভয়েই অগ্রসর হয়ে সীতার দেহটি ধারণ করে তাঁর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হলেন।

অতঃপর রাম উপস্থিত সকলের প্রতি আনন্দিত চিত্তে ও শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমি জানি সীতা রাবণের গৃহে বাস করলেও, তাঁর হৃদয় আমাতেই নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু লোকের মনে সন্দেহ নিরসনের জন্য আমাকে সীতার বিশুদ্ধতার উপর জোর দিতে হয়েছিল। তা না হলে লোকে আমাকে মূর্খ অথবা কামুক বলে মনে করতো। রাবণ, না দেহে না মনে, কোন ভাবেই সীতাকে আয়ত্ত ও কলুষিত করতে পারে নি। সুতরাং

মানুষ যেমন নিজের কীর্তিকে ত্যাগ করতে পারে না, তেমনই আমিও মৈথিলীকে ত্যাগ করতে পারি না।'

রামের উদার ও অকপট স্বীকারোক্তিতে সমবেত জনতা মুগ্ধ ও বিগলিতচিত্ত। সকলের নেত্রেই অশ্রুর বন্যা। বিভীষণ অগ্রসর হয়ে রামের কণ্ঠে এক সুগন্ধি পুষ্পমাল্য অর্পণ করলেন। অতঃপর নতজানু হয়ে করযোড়ে রামের প্রতি হৃদয়ের সকল ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা উজাড় করে দিলেন।

রাম বিভীষণকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। বিভীষণ রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আজ মৈথিলীর অগ্নিশুদ্ধি হলো এবং তার থেকে প্রমাণিত হলো যে তিনি রামের সুযোগ্যা সহধর্মিনী এবং রামের মতোই অপার্থিব শক্তির অধিকারিণী। এই অগ্নি লংকার সকল অধিবাসীর চিত্তের মালিন্য ও গ্লানিকে দগ্ধ করেছে এবং সমস্ত লংকাপুরীকে রাম ও সীতার অনুগামী করেছে। আজ আমাদের রাক্ষসদের হৃদয়ের কাম, ক্রোধ, দম্ভ চিরতরে অগ্নিতে বিসর্জিত হয়েছে। আজ জানকীর অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে নূতন লংকার জন্ম হয়েছে।'

বানর ও রাক্ষস সমবেত কণ্ঠে 'জয় রামসীতার জয়' বলে জয়ধ্বনি প্রদান করলো। সীতা সংজ্ঞা লাভ করে ধীর পদে রামের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে রামকে ভক্তিনম্র চিত্তে প্রণাম করলেন। রাম ও সীতা উভয়েরই বদনে এক স্বর্গীয় হাস্যের দীপ্তি। এই মহামিলনের দৃশ্যে কারোর চক্ষুই শুষ্ক নয়।

*   *   *   *

এই বারে চৌদ্দ বৎসর বনবাস অন্তে রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পালা। রাম সমুদ্রতীরের শিবিরেই রাত্রি যাপন করেন। লংকাধিপতি বিভীষণের মনের বাসনা পূর্ণ হয় না। রাম আর একদিনও লংকায় অবস্থান করতে ইচ্ছুক নন।

কারণ স্বরূপ রাম বলেন, 'রাক্ষসরাজ, অযোধ্যায় আমার বৃদ্ধা মাতা কৌশল্যা, মাতা কৈকেয়ী ও সুমিত্রা, ভরত, শত্রুঘ্ন ও পুরবাসীরা আমাদের ফিরে পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। তাদের প্রতীক্ষাকে, তাদের প্রত্যাশাকে আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না। আমি যাতে সত্বর দেশে ফিরতে পারি, তুমি তার ব্যবস্থা করে দাও।'

রাক্ষসরাজ বিভীষণ ক্ষুণ্ণ মনে বললেন, 'হে কোশলরাজ, অযোধ্যায় পৌঁছাতে তোমার একদিনও বিলম্ব হবে না। রাবণের পুষ্পক রথ তোমাকে অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে নিয়ে যাবে। কিন্তু, আমি আশা করেছিলাম যে আমাদের স্বর্ণলংকায় তুমি কিছুদিন বাস করবে। আমরা রাক্ষসেরা প্রাণভরে তোমাদের সেবা ও যত্ন করে, আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো এবং তোমার কাছ থেকে অমূল্য উপদেশসমূহ সংগ্রহ করবো। কিন্তু, তুমি তো লংকায় প্রবেশ না করেই দেশে ফিরে যেতে চাইছো! এ আমাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি মনে করবো।'

বিভীষণ এক দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন। তাঁর ভক্ত হৃদয়ের দুঃখ এবং ক্ষোভ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। তাঁর দু' নয়নে অশ্রুধারা। বিভীষণের সঙ্গে রাণী মন্দোদরী এবং সরমাও অশ্রুপাত করলেন।

রাম বিভীষণকে পুনরায় আলিঙ্গন কোরে বন্ধুত্বপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'সখা বিভীষণ, তোমাদের এই কনকলংকায় যেতে আমার মন চাইছে না। জননী এবং জন্মভূমি, স্বর্গ থেকেও মহান। তারাই এখন আমাকে আকর্ষণ করছে। ভ্রাতঃ, এখন বিদায় দাও।

তোমার মতো বন্ধু ও হিতকামী খুবে অল্পই আছে। বিভীষণ, তুমি জ্ঞানবান, ধর্মপরায়ণ এবং বিচক্ষণ। তুমি লঙ্কার যোগ্য অধিপতি।'

বিভীষণ রামের পদতলে পতিত হয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'হে বেদরূপ মহাবীর, তোমার সান্নিধ্য লাভ করে শুধু আমিই নয়, সমগ্র রাক্ষসকুল এবং লংকা ধন্য হয়েছে। লংকার মহান অধিপতি রাবণ তোমার হাতে নিহত হয়ে জৈব প্রবৃত্তি থেকে মুক্তির আস্বাদ লাভ করতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। রাবণের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। রাক্ষসদের হৃদয় কামনার হলাহল থেকে মুক্ত হয়েছে। এখন আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবর্তনে লংকা ধন্য হবে। আর শুধু লংকাদ্বীপই নয়, সমস্ত দাক্ষিণাত্য কালক্রমে কৃষিতে সমৃদ্ধ হবে। ধরণীর বুকে নিত্য নূতন ফসলের সম্ভার প্রাণী জগতে এক বিরাট অগ্রগতির সূচনা করবে। ভেবেছিলাম, তোমাদের মতো এক আদর্শ দম্পতীকে এবং বন্ধু লক্ষ্মণের মতো এক আদর্শ ভ্রাতা ও বীরকে কিছুদিন সেবা করার সুযোগ পাবো। কিন্তু, তা আর হলো না! এখন বলো, কি করলে তোমরা সন্তুষ্ট হবে।'

রাম বিভীষণকে পুনরায় বক্ষে ধারণ করে বললেন, 'বন্ধু বিভীষণ, লংকার ঐশ্বর্যের সীমা নেই। তুমি এই বানরদের উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করো। তারা যেভাবে আমাদের কাজ সম্পন্ন করেছে, তাদের কাছে আমরা চিরঋণী থাকবো। দেশে ফেরার আগে তাদের হাস্যোজ্জ্বল মুখগুলি দেখে খুশী মনে তাদের কাছে বিদায় নিতে ইচ্ছা করি।

রামের হৃদ্যতাপূর্ণ উদার বচনে সকলেই অভিভূত ও প্রীত। হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতির আঁখি অশ্রুসিক্ত।

এই সময়ে মধুর স্বরে জানকী বললেন, 'আর্যপুত্র, আপনার বন্ধু সুগ্রীব, কিষ্কিন্ধ্যার যুবরাজ অঙ্গদ, আমার সন্তান তুল্য হনুমান—এঁদের আমাদের সঙ্গে অযোধ্যায় নিয়ে চলুন। আপনার রাজ্যাভিষেক দেখে এঁরা যে যার দেশে ফিরবেন। আর আমি রাক্ষসরাজ বিভীষণ, সখি সরমা ও রাণী মন্দোদরীকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে যাচ্ছি। তাঁরা যেন অচিরেই আমাদের সঙ্গে অযোধ্যায় মিলিত হয়ে অভিষেকের উৎসবে যোগদান করেন।'

রাম সহৃদয়তার সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয়। বৈদেহী, তুমি যা বলেছ তা অবশ্যই হবে। আর লংকেশ্বর বিভীষণ নিশ্চয়ই তোমার এবং আমার অভিলাষ পূর্ণ করতে অযোধ্যায় যাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবেন। তার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতিই আমি কামনা করি।'

সুগ্রীব, হনুমান এবং অঙ্গদ সীতা ও রামের উক্তিতে কৃতার্থ বোধ করে উভয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

বিভীষণ করজোড়ে বললেন, 'হে উদারচরিত্র রামচন্দ্র, আমি তোমার আদেশ মতো এখনই বানরদের পুরস্কৃত করছি। জনকনন্দিনী সীতার অযোধ্যায় যাবার জন্য আন্তরিক অনুরোধ আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। পুষ্পক রথ তোমাদের অযোধ্যায় পৌঁছে লংকায় ফিরে এলে, আমরা অযোধ্যার যাত্রা করবো। অভিষেকের উৎসবে যোগদান করে সেই বিরাট আনন্দযজ্ঞের অংশীদার হবো, এবং গুরুজনদের প্রণাম জানিয়ে আসবো। তোমার মহানুভব ভ্রাতা ভরতের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করবো।'

মন্দোদরী এবং সরমা উভয়েই ইঙ্গিতে বিভীষণকে সমর্থন জানালেন।

তারপরে সেই বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত হলো। বিভীষণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে চিন্তা করেন যে রাবণের সবংশে নিধনে লংকার প্রাচীন নির্মোকটি ছিন্ন ভিন্ন হয়েছিল। রাক্ষসেরা নূতনভাবে নিঃশ্বাস নিতে আরম্ভ করেছিল। এক নূতন জীবনস্রোত থেকে নূতন জীবন আহরণ করার ব্রতে তারা এই একদিনের মধ্যেই দীক্ষিত হয়েছিল।

বিভীষণের হৃদয়ে আক্ষেপের সীমা নেই যে, এই বিপুল পরিবর্তনের যে উৎস, সেই রামই লংকার মৃত্তিকা থেকে বিদায় নিচ্ছেন। রামের মনে এই বিশ্বাস যে লংকার বর্তমান প্রাণপুরুষ বিভীষণ, রামের মন্ত্রেই দীক্ষিত। রামের মনে সন্দেহ নেই যে লংকার সকলেই বিভীষণের আদর্শকেই অনুসরণ করবে।

এই দুই নায়কেরই স্থির ধারণা যে সীতার অগ্নিপরীক্ষা লংকাবাসীর হৃদয়ে এক চিরস্থায়ী দাগ কেটেছে। এদের হৃদয়ের রত্ন-সিংহাসনে রাম ও সীতা চিরদিনই বাস করবেন। রাম নিশ্চিত যে রামভক্ত বিভীষণই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাবণের সুযোগ্য উত্তরসাধক যার মধ্যে শৌর্য, বীর্য, জ্ঞান, ভক্তি ও ত্যাগ নিবিড়ভাবে সমন্বিত হয়েছে।

* * * *

রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান পুষ্পক রথে আরোহণ করলে সকলের মিলিত জয়ধ্বনিতে সমুদ্রসৈকত মুখরিত হলো। সমুদ্রের গর্জন যেন আকস্মিকভাবে বর্ধিত হলো। বায়ুর বেগ তীব্রতর হলো। অশান্ত প্রকৃতি যেন বিভীষণের মতোই রামের লংকা ত্যাগে বিক্ষুব্ধ।

পুষ্পক রথ সমুদ্রের অভিমুখে উত্তরের আকাশে উড্ডীন। বিভীষণ, মন্দোদরী, সরমা অশ্রুসিক্ত নয়নে ঊর্ধ্বে লক্ষ্য করছেন। আরোহীরা আর দৃশ্যমান হচ্ছে না। নিমেষের মধ্যে পুষ্পক রথ দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হলো। যেন পেয়েও হারাবার শোকে বিভীষণের মুখমণ্ডল বিষণ্ন। রাক্ষসেরা চিৎকার করলো, ‘জয় রামসীতার জয়’, ‘জয় লংকেশ্বর বিভীষণের জয়।’

অদূরে ত্রিকূটশীর্ষে কনকলংকা দিনের আলোকে চির-ভাস্বর।

●